

বিশ্ব খ্যাতি আফ্রিকান ঔপন্যাসিক

উইলবার স্মিথ ক্রাই উলফ



অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

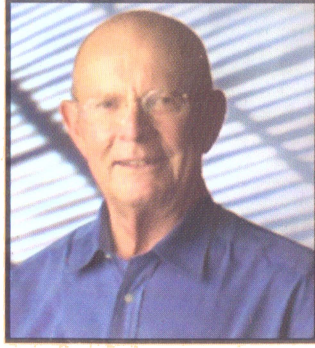
‘যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকার বুকে দারুণ রোমাঞ্চপূর্ণ এক মহাকাব্য যেনো....
অসাধারণ একটি কাহিনীর জন্ম দিলেন স্মিথ।’

উচ্চল তরুণ জেক বারটন পেশায় এঞ্জিনিয়ার, যুদ্ধ শেষে কাজের আশায় ঘুরে ফিরছে তাজানিয়ায়। নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দা চলছে পৃথিবী জুড়ে। অপরদিকে অভিজাত ইংরেজি, মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্-এর রয়েছে তড়িৎ দান মেরে টাকা কামানোর স্পৃহা। বন্ধুত্ব হ'লো দু'জনের। ১৯৩৫ সালের শীত তখন। ইতালির একনায়ক মুসোলিনি, অসহায় ইথিওপিয়ার অধিবাসীদের দেশ-ছাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এগিয়ে চলেছে তার বর্বর সেনাবাহিনী। এমন সময়, ইথিওপিয় গোত্রের এক সর্দারের সঙ্গে ব্যবসায় নামলো গ্যারেথ এবং জেক। ওদের কাজ- সমুদ্র এবং মরু পাড়ি দিয়ে যুদ্ধরত অসহায় আদিবাসীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে চারটি আর্মারড কার। একই সঙ্গে, সুন্দরী তরুণী মার্কিন সাংবাদিক ভিকি কেমবারওয়েল যাবে তাদের অভিযানে। উদ্দেশ্য ভয়াবহ নৃশংস এই অন্যায় যুদ্ধের কথা বিশ্ববাসীকে জানানো।

গুরু হ'লো দুই বন্ধুর অ্যাডভেঞ্চার। শেষ পর্যন্ত কী ইথিওপিয়ায় পৌঁছুতে পারলো তারা? কে পেলো ভিকি'র ভালোবাসা?

টান টান উত্তেজনার ক্রাই উলফ ... একই সঙ্গে মানবতার জয়গান এবং প্রেমের কাহিনী।





আফ্রিকান লেখক উইলবার স্মিথের জন্ম ১৯৩৩ সালে, তৎকালীন উত্তর রোডেশিয়া, বর্তমান জাম্বিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকায়। জীবনের প্রায় সবটুকু সময়ই কাটিয়েছেন আফ্রিকার মাটিতে, এই মহাদেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত গভীর। শিক্ষাজীবন কেটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার মাইকেল হাউস এবং রোডস বিশ্ববিদ্যালয়ে। দারুণ ঘটনাবহুল, রোমাঞ্চকর জীবনে ১৯৬৪ সাল থেকে পেশাদার লেখক হিসেবে লিখে চলেছেন। প্রথম বই, ‘হোয়েন দ্য লায়ন ফিডস্’ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এ পর্যন্ত ৩২টি উপন্যাস লিখেছেন তিনি, যার প্রত্যেকটি বেস্টসেলার। তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠে আফ্রিকার চিরন্তন সৌন্দর্য, তার বন্যতা-হিংস্রতা, রাজনীতি, নিষ্ঠুরতা, হানাহানি, প্রেম, রোমাঞ্চ। সাফারির মনোজ্ঞ বর্ণনা, আফ্রিকান বন্যপ্রাণী এবং প্রকৃতি বিষয়ক অগাধ জ্ঞান তার লেখার সম্পদ। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী অভিযানে বেরিয়ে পড়েন স্মিথ, লেখার রসদ খুঁজে ফেরেন। মানবতার জয়গান তাঁর লেখার আরো একটি বড় দিক।

উইলবার স্মিথ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে, টেবল্ মাউন্টেন-এ বসবাস করেন। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাঠকদের জন্যে নিরলস লিখে চলেছেন তিনি। ২০০৭ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘দ্য কোয়েস্ট’। ২০০৯ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে নতুন রোমাঞ্চ ‘অ্যাসেগাই’।

ক্রাই উলফ

ক্রাই উলফ্

মূল উইলবার স্মিথ
অনুবাদ মখদুম আহমেদ



ফ্রাই উলফ

মূল : উইলবার স্মিথ

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

অনুবাদ স্বত্ব : প্রকাশক

তৃতীয় মুদ্রণ

এপ্রিল ২০১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ

জুলাই ২০১০

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০০৮

রোদেলা ০৬



একুশে

প্রকাশক

রিয়াজ খান

রোদেলা প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)

১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ

মূল বইয়ের অবলম্বনে গোলাম মর্তুজা

মেকআপ

খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ

হেরা প্রিন্টার্স

৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৪০.০০ টাকা মাত্র

CRY WOLF by Wilbur Smith. Translated by Makhdum Ahmed.

First Published Ekushe Boimela 2008

Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani

11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

E-mail rodela.prokashani@gmail.com

Price Tk. 340.00 only US \$ 15.00

ISBN 984 70117 0005 7 Code 06

উৎসর্গ

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত, অকালপ্রয়াত বন্ধু
ডাঃ মোস্তফা মিস্তুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

মৃত্যু, গর্বিত হয়ো না তুমি, যদিও তোমার ক্ষমতা প্রচণ্ড
এবং তুমি পরাক্রমশালী;
মাত্র একটা ছোট্ট ঘুম ভেঙে চিরকালের জন্যে জেগে
উঠবো আমরা,
আর হার হবে তোমার;
মৃত্যু, তোমার মরণ আসন্ন।

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং



শু

ভ

ম

Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

উইলবার স্মিথের জন্যে প্রশংসা—

‘উইলবার-ই সেরা ।’

—সানডে টাইমস্

‘বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চার লেখক ।’

—ডেইলি এক্সপ্রেস

‘উইলবার স্মিথের অপর নাম রোমাঞ্চ, আর এ বিষয়ে তার জুড়ি নেই ।’

—ওয়াশিংটন পোস্ট

‘গতিময়, অসাধারণ কাহিনী ।’

—সানডে টেলিগ্রাফ

‘যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকার বৃকে দারুণ রোমাঞ্চপূর্ণ এক মহাকাব্য যেনো... অসাধারণ একটি কাহিনীর জন্য দিলেন স্মিথ ।’

—ইভনিং স্ট্যাবার্ড

‘তীব্র রোমাঞ্চ, কঠোর বাস্তবতা, ইতিহাস আর প্রেম মিলেমিশে জন্ম দিয়েছে একটি অনন্যসাধারণ কাহিনীর... ক্রাই উলফ আমাদের জীবনের রহস্য আর সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায় ।’

—লাইব্রেরি জার্নাল

‘অত্যন্ত শক্তিশালী একটি কাহিনী, বৃকে কষ্ট জাগায়, কিন্তু পড়ে যেতে বাধ্য আপনি, কর্কশ কিন্তু তীব্র আবেগী... একটি এপিক উপন্যাস ।’

—শী

ক্রাই উলফ

মূলঃ উইলবার স্মিথ

অনুবাদঃ মখদুম আহমেদ

কৃতজ্ঞতা

MUNNA

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.banglapdf.net

FACEBOOK:

[HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET](https://www.fb.com/groups/banglapdf.net)

উইলবার স্মিথের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

রিভার গড (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
দ্য সেভেঙ্জ জেন্স (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
ওয়ার লক (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
দ্য আই অব দ্য টাইগার (প্রকাশিতব্য)
ক্রাই উলফ (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
ওয়াইল্ড জাসটিস্
দ্য এলিফ্যান্ট সঙ

মখদুম আহমেদ অনুবাদিত প্রকাশিত বই

রিভার গড (উইলবার স্মিথ)
ক্যাট অ্যান্ড মাউস (জেমস প্যাটারসন)
নট এ পেনি মোর, নট এ পেনি লেস (জেফরী আর্চার)

অচিরেই আসছে—

ট্রেজার (মূল: ক্লাইভ কাসলার)
মখদুম আহমেদের অনুবাদে একুশে বইমেলা ২০০৮-এ।

জেক বারটনের কাছে মেশিন মাদ্রেই জ্বীলঙ্গ। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, ওগুলো সত্যিই কৌতুকপ্রিয়, ছলনাময়ী এবং কেউ কেউ নষ্ট। কাজেই, বিশাল সবুজ আম গাছতলে সাড়ি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা বাহনগুলো দেখা মাত্র জেক বুঝলো, ওগুলো অঘটন-ঘটনপটিয়সী লৌহমানবী।

তাজানিয়া সরকার শুধু এই গাড়িগুলোই নয়, বাড়তি অথবা বাতিল আরো অনেক জিনিস নিলামে বিক্রি করতে যাচ্ছে। অন্যান্য জিনিসের স্তূপ থেকে দূরে রাখা হয়েছে গাড়ি পাঁচটা। মে মাস এবং সময়টা দুই বর্ষা মরশুমের মধ্যবর্তী শীতল ঋতু হলেও, সকালের মেঘহীন আকাশের নিচে জ্বলন্ত তন্দুর হয়ে আছে দার-এস-সালাম। আমগাছ তলার ছায়ায় পৌঁছে স্বস্তিবোধ করলো জেক, দাঁড়ালো লৌহমানবীদের গা ঘেঁষে, খুঁতখুঁতে এঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিতে জরিপ শুরু করলো।

পাঁচিল ঘেরা বড় উঠানটার চারদিকে একবার চোখ বুলালো ও দেখলো সে শুধু একাই গাড়িগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী। বহুবর্ণ সম্ভাব্য ক্রেতারা ভিড় করেছে ভাঙা কোদাল, শাবল, খালি ড্রাম, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদির সামনে, আর্মারড কারগুলোর দিকে কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। ওগুলোর দিকে আবার ফিরলো ও, জ্যাকেট খুলে ঝুলিয়ে রাখলো আমগাছের নিচু একটা ডালে।

ভালো জাতের জিনিস, তবে কঠিন ধকল গেছে ওগুলোর ওপর দিয়ে। শক্ত ঝকঝকে রেখা আর কিনারাগুলো ভেঁতা হয়ে গেছে, রঙ চটে যাওয়ায় মরচে ধরেছে গায়ে, ওপরের অংশ কাক আর বাদুড়ের বিষ্ঠা দিয়ে লেপা। ক্যানভাস ব্যাগটা একপাশে সরিয়ে রাখলো জেক, ভেতরে টুলস রয়েছে। গাড়িগুলোর ঠিকানা কুলজী সম্পর্কে জানা আছে ওর। কারিগরি নৈপুণ্যের ভারি চমৎকার পাঁচটি নমুনা, তাজানিয়া উপকূলে প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হচ্ছে। ষাট-সত্তর বছর আগে শ্রেইনার বানিয়েছিল ওগুলো, উঁচু গম্বুজে ম্যাক্সিন মেশিনগান বসানোর জন্যে রয়েছে খোলা জায়গা, এই মুহূর্তে শূন্য একটা অক্ষিকোটরের মতো হাঁ করা। এঞ্জিন হাউজিংয়ের ওপর প্র্যাটফর্মটা চৌকোভাবে ঢালু, অত্যন্ত ভারি আমার প্রেট, রিবেটগুলোর সারি নিখুঁতভাবে সাজানো, ছুটে আসা শক্তির বুলেট থেকে রেডিয়েটরকে রক্ষার জন্যে ইস্পাতের শাটার আছে, প্রয়োজনে বন্ধ করা যায়। ধাতব হুইলে নিরেট রাবারের টায়ার লাগানো, কাঠোমোটাকে উঁচু করে রেখেছে। জেকের ভাবতেও খারাপ লাগলো সম্ভবত ওর হাত দিয়েই বড়ির ভেতর থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসবে এঞ্জিনগুলো। দু'একটা বডি-ও বোধহয় বাতিল করতে হবে, রঙের পোঁচ দিয়ে আর যাই হোক বুলেটের ফুটো বন্ধ করা যায় না। আর্মারড

কারগুলোর ওপর দিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধের ধকল গেছে, আরবণের ভেতর মরচে ধরা লোহা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা তাই সন্দেহ। অবশ্য মাঝখানে এক সময় এঞ্জিন বদলে নতুন ৬½ লিটার বেন্টলি লাগানো হয়েছিল, পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেগুলোরই বা কি অবস্থা। নতুন এঞ্জিন লাগানোর পর তাজানিয়া সরকার একটানা কয়েক যুগ সীমান্ত এলাকায় প্রহরার কাজে ব্যবহার করেছে ওগুলো, ড্রাইভাররা বেশিরভাগ সময় দুর্গম পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গরুচোরদের ধাওয়া করে ফিরেছে। ফলশ্রুতিতে, আজ, এই ১৯৩৫ সালের আগুনে মে' মাসে সরকারের বাতিল মালের বিক্রয় আঙ্গিনায় জড়ো করা হয়েছে গাড়িগুলো। তবু জেকের মনে ক্ষীণ আশা, যতোই কিনা দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে আসুক, বেন্টলি এঞ্জিন একেবারে বাতিল হওয়ার জিনিস না। অপারেশন শুরুর মুহূর্তে সার্জেন যেমন আস্তিন গুটায়, জেক তেমনি গুটালো, নড়ে উঠলো ঠোঁট জোড়া, তৈরি হও, সুন্দরীরা; তোমাদের নাড়ী-নক্ষত্র যাচাই করা হবে।'

জেক বারটন প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা, গায়ে অতিরিক্ত চর্বি না থাকলেও হাড়গুলো চওড়া এবং পেশিবহুল শরীর, আর্মারড্ কারের বডির ভেতর ঢোকার পর নড়াচড়ার জায়গা খুব কমই অবশিষ্ট থাকলো। কিন্তু কাজের ভেতর মন ঢেলে দেয়ায় কোথায় কি কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে খেয়ালই থাকলো না ওর। গোল করা জোড়া ঠোঁট থেকে বিরতিহীন শিস দিয়ে বেরিয়ে আসছে 'টাইগার র্যাগ' সুর, ভেতরের আবছা অন্ধকারে কুঁচকে আছে চোখের চারপাশ।

দ্রুত কাজ করছে জেক। প্রথমে কন্ট্রোলের থ্রটল আর ইগনিশন সেটিং চেক করলো। দেখে নিলো পিছনের বসানো ফ্যুয়েল ট্যাংক থেকে লাইনগুলো কোন পথ ধরে এসেছে। ড্রাইভারের সিটের তলায় কক রয়েছে দেখে সম্ভ্রষ্টির আভা ফুটলো মুখে। পাঁচিল বেয়ে ওঠার ভঙ্গিতে টারিট থেকে বেরিয়ে এলো ও, লাফ দিয়ে বাহনের উঁচু পাশটায় নামলো, চুল থেকে গড়িয়ে গায়ে নেমে আসা ঘামের ধারা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মোছার জন্যে থামলো মুহূর্তের জন্যে, তারপর সামনে এগিয়ে খুলে ফেললো আর্মারড্ এঞ্জিন-কাভার।

এঞ্জিনে চোখ পড়তেই খুশিতে নেচে উঠলো মন। বেন্টলির গায়ে ধুলো আর তেল মাখামাখি হয়ে আছে, কিন্তু মরচের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কাঠামোর কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই, প্রতিটি পার্টসের আকৃতি অবিকৃত। হাতের আঙুল আর তালু দিয়ে এঞ্জিনের গায়ে হাত বুলালো জেক, যেনো আদর করছে। এঞ্জিন সাম্প থেকে ডিপস্টিক বের করে এক ফোঁটা তেল নিলো দু'আঙুলের মাঝখানে। করকরে ভাব অনুভব করে গম্ভীর হ'লো চেহারা, গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো কাঠি। টেনে প্লাগ খুললো ও, অলসভঙ্গিতে ঘুরঘুর করতে দেখে এক আফ্রিকানকে কাছে ডেকে এক শিলিংয়ের বিনিময়ে ক্র্যাংকটা ঘোরাতে বললো, হাতের তালু ঠেকিয়ে কমপ্রেশন পরীক্ষা করলো।

দ্রুত হাঁটাচলা করছে জেক, কখনো পিছু হটছে, কখনো সামনে বাড়ছে, দূর থেকে দেখে মনে হ'তে পারে নৃত্যচর্চা মশগুল। এক এক করে পাঁচটা আর্মারড্ কার পরীক্ষা

করলো ও, গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশই চেক করতে বাকি রাখলো না। কাজ শেষ করে বুঝলো, তিনটে অবশ্যই চালানো যাবে, সম্ভবত চারটে।

বাকি একটার কোনো আশা নেই। ওটার এঞ্জিন ব্লকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, জেকের মনে হ'লো পিঠে সওয়ারী নিয়ে একটা ঘোড়া অনায়াসে গ'লে যেতে পারবে। আর পিস্টনগুলো নিজেদের খোপে এমন নিরেটভাবে আটকে গেছে, দু'জন মিলে ক্র্যাংক হাতল ঘুরিয়েও সেগুলোকে নড়ানো গেলো না।

দুটো গাড়ির গোটা কারবুরেটর-ই নেই, তবে চেষ্টা করলে হয়তো বাতিল লোহা-লক্কড়ের গাদা থেকে একটা অন্তত জোগাড় করা যেতে পারে। অর্থাৎ কারবুরেটর পাওয়া গেলে মোট চারটে সচল গাড়ি ভাগ্যে জুটবে। বেশি আশা না করে, অল্পই ধরা উচিত। এই দার-এস-সালামে আরো একটি কারবুরেটর জোগাড় করার আশা বৃথা।

অন্তত তিনটি গাড়ি চলবে, এ ব্যাপারে জেক নিঃসন্দেহ। প্রতিটি যদি একশ' দশ পাউন্ডে বিক্রি করা যায়, সব মিলিয়ে হাতে আসবে তিনশো ত্রিশ পাউন্ড। কেনা এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বাদ দেয়া যাক একশো' পাউন্ড, তার মানে লাভ থাকবে নীট দু শো ত্রিশ পাউন্ড। অর্থাৎ নিলামের সময় প্রতিটির জন্যে বিশ পাউন্ডের বেশি ডাক দেয়া যাবে না। আফ্রিকান ছোকরাকে প্রতিশ্রুত শিলিং ছুঁড়ে দিয়ে আপন মনে হাসতে লাগলো জেক। অভাবের সময়ে দু শো ত্রিশ পাউন্ড কম নয়।

ট্রাউজার থেকে পকেট-ঘড়িটা বের করে চোখ বুলালো জেক। নিলাম শুরু হ'তে এখনো দু'ঘণ্টা দেরি আছে। বেন্টলিগুলোর ওপর কাজ শুরু করার জন্যে অস্থির হয়ে আছ ও। লাভটা বড় কথা নয়, এঞ্জিন নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে ওর, তাছাড়া সময়টাও সুন্দর কাটতো। দেখে শুনে মনে হ'লো মাঝখানে দাঁড়ানো গাড়িটার ওপর হাত দিলে খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যাবে। মাদগার্ডের আর্মারড্ উইং-এ ক্যানভাস ব্যাগটা রেখে একটা ১/২ ইঞ্চি স্প্যানার বেছে নিলো। পরমুহূর্তে কাজের ভেতর বুঁদ হয়ে গেলো ও।

আধ ঘণ্টা পর এঞ্জিনের ভেতর থেকে মাথা বের করলো জেক, ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে গাড়ির সামনে ছুটে এলো।

ফুলে উঠলো ডান হাতের পেশি, ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে। প্রথমবারের চেষ্টায় ভারি এঞ্জিন যান্ত্রিক শব্দহীন তুললো, কিন্তু পরমুহূর্তে থেমে গেলো, স্টার্ট নিলো না। মিনিটখানেক পর হাতল খুলে নিলো জেক, ন্যাকড়া দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। তেল আর কালির দাগ অবশ্য আগেই ভৌতিক করে তুলেছে চেহারাটা। 'দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি রগচটা,' ফিসফিস করে বললো ও। 'কিন্তু ডার্লিং, আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।'

আবার ওর কাঁধ আর মাথা এঞ্জিন কাউলিংয়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো, ভেতর থেকে শক্ত ধাতুর সাথে স্প্যানারের ঠোকাঠুকি আর শিসের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। দশ মিনিট পর আবার ক্র্যাঙ্ক হাতল ঘোরালো ও। সাথে সাথে গর্জে উঠলো এঞ্জিন, ব্যাক ফায়ারের আওয়াজ হ'লো কামান দাগার মতো, হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল-ওটা উল্টো করা মুঠোর ভেতর ধরা থাকলে বুড়ো আঙুলটা ছিঁড়ে নিয়ে যেতো।

‘ওরেঝাপ! কী দেমাগ!’ হতভম্ব জেক টারিটে উঠে কন্ট্রোলের দিকে ঝুঁকলো, রিসেট করলো ইগনিশন।

পরের বার ত্র্যাক্স ঘোরাতে সচল হ’লো এঞ্জিন, নিস্তেজ হ’তে শুরু করে আবার সতেজ হলো, তারপর নিয়মিত শব্দহ্রদ বজায় রাখলো। আড়ষ্ট সাসপেনশনের ওপর কাঠামোটা মৃদু কাঁপছে, তবে জ্যান্ত থাকলো এঞ্জিন।

পিছিয়ে এলো জেক, দরদর করে ঘামছে, চেহারা লালটে একটা আভা, তবে আনন্দে চকচক করছে চোখ জোড়া।

‘কী সুন্দর! সত্যি, তুমি অনেক সুন্দর।’

‘ব্রাভো!’ পিছন থেকে ব’লে উঠলো একটা দরাজ কণ্ঠস্বর। প্রায় চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘাড় ফেরালো জেক। ভুলেই গিয়েছিলো দুনিয়ায় সে-ই একমাত্র প্রাণী নয়। অপ্রতিভ বোধ করলো ও, যেনো একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপন শারীরিক একটা বৈশিষ্ট্য আড়াল থেকে দেখে ফেলেছে কেউ। লোকটার দিকে কটমট করে তাকালো ও, পোজ দেয়ার মার্জিত ভঙ্গিতে আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে।

‘দারুণ দেখালে, বন্ধু।’ ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ জেকের ঘাড়ের পিছনের চুলগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প’রে আছে মাখন রঙা দামী ট্রপিক্যাল লিনেন-এর সুট, পায়ে সাদা আর খয়েরী জুতো। সাদা স্ট্র হ্যাটের চওড়া কার্ণিশ ছায়া ফেলেছে মুখে। তবে চেহারায়ে লেপ্টে থাকা হাসিখুশি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূচক ভাব জেকের চোখ এড়ালো না। প্রচলিত অর্থে সুদর্শন বলা চলে, যদিও সহজ-সরল হাবভাবের মধ্য থেকে সকৌতুক শয়তানীর একটা ভঙ্গি উঁকি-ঝুঁকি মারছে ব’লে সন্দেহ হ’লো জেকের। চেহারায়ে অভিজাত একটা ভাবও আছে, তবে তার কতোটুকু বানোয়াট বা অর্জিত আর কতোটুকু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, বলা কঠিন। তবে সন্দেহ নেই সুন্দরীদের আবেগ উথলে ওঠার একটা কারণ সৃষ্টি করবে এই মুখ, তাতে গতি সঞ্চার করবে দরাজ কণ্ঠস্বর। সরকারি কর্মকর্তা? উহু, সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিলো জেক। কেমন যেনো সন্দেহ হ’তে লাগলো ওর। হাবে-ভাবে, এমনকি পড়নের টাইয়ের কোনাকুনি নকশাও জানান দিচ্ছে এই লোক অভিজাত ইংরেজ।

‘ওটাকে জ্যান্ত করতে মোটেই বেশি সময় নাও নি তুমি।’ গাছে হেলান দিয়েই থাকলো, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বদলে গেলো। জোড়া পা নিচের দিকে ক্রস চিহ্নের আকৃতি পেলো, একটা হাত কোট-পকেটের ভেতর। আবার হাসলো সে, এবার তার হাসিতে ব্যঙ্গ আর চ্যালেঞ্জ পরিষ্কার দেখতে পেলো জেক। লোকটাকে চিনতে ভুল করছে ও। না, সাধারণ কোনো লোক নয়। ভালো মানুষতো নয়ই। ওই চোখ জোড়া একজন সর্বস্বহরণকারী লুটেরার, ব্যঙ্গাত্মক এবং নেকড়েসুলভ, ছায়ার ভেতর ছুরির ধারালো ফলার মতো বিপজ্জনক।

‘বাকিগুলোও যে সহজে মেরামতযোগ্য তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই,’ অনুসন্ধানী সুর, স্রেফ মন্তব্য নয়।

‘ভুল করছো, বন্ধু।’ সব হারানোর একটা আশংকা রীতিমতো ব্যথা হয়ে জাগলো জেকের বুকে। চেহারা-সুর দেখে মনে হয় না সৌখিন ইংরেজ পাঁচটা আর্মারড কার

কিনতে চাইবে, আবার বলাও যায় না-হাজার হোক বেনিয়ার জাত। সাবধানের মার নেই, গাড়িগুলোর অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাইয়ে দিলে মন্দ হয় না। ‘শুধু এই একটাই কোনো রকমে চলবে, এটারও নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শব্দ শুনে বুঝছে না, উন্মাদ কাঠমিস্ত্রি যেনো যেখানে-সেখানে পেরেক ঠুকছে।’ কাউলিংয়ের ভেতর হাত গলিয়ে ম্যাগনিটো অফ করলো ও।

হঠাৎ এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে যাওয়ায় নিস্তব্ধতা নেমে এলো। গলার স্বরে কিছুটা তচ্ছিল্য ফুটিয়ে আবার বললো জেক, ‘বাতিল লোহা!’ সামনের চাকার কাছে মাটিতে থুথু ফেললো ও, কিন্তু চাকায় নয়। চেষ্টা করেও অতোটা নির্দয় হ’তে পারলো না ও। তারপর যন্ত্রপাতি কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরলো, এক কাঁধে ব্যাগ অপর কাঁধে জ্যাকেট ঝুলিয়ে রওনা হ’লো গেট অভিমুখে, লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকালো না।

‘তুমি তাহলে নিলামে অংশগ্রহণ করছো না, ওল্ড চ্যাপ?’ আগন্তুক গাছতলা ছেড়ে জেকের সাথে হাঁটতে শুরু করলো।

‘আরে না!’ গলার সুরে বিপুল হতাশা ফোটাতে চেষ্টা করলো জেক। ‘তুমি?’

‘ধ্যেৎ, ভাঙাচোরা পাঁচটা আর্মারড্ কার নিয়ে আমি কী করবো!’ নিঃশব্দে হাসলো লোকটা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে জেকের দিকে তাকালো। ‘ইয়াকি, তাই না? আমি বলবো, টেক্সান?’

দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়েও দাঁড়ালো না জেক। উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো ও, ‘কেনো মনে হলো?’

‘এঞ্জিনিয়ার?’

‘এই আর কি।’

‘চলো কিছু পান করা যাক?’ ভুরু নাচিয়ে প্রস্তাব করলো লোকটা, ‘জেকের মনে হ’লো ঘুষ দিতে চাইছে।

‘কতো খরচ করতে চাও হিসাব করে টাকাটাই বরং দাও’ বললো ও। ‘আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।’

সৌখিন আগন্তুক আবার হেসে উঠলো, বন্ধুত্বসূচক সকৌতুক শব্দ ঝংকার। ‘তাহলে শুভেচ্ছা জানাই, ওল্ড চ্যাপ,’ বললো সে, তাকে পিছনে ফেলে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো জেক তাপদঙ্ক দার-এস-সালামের খোলা রাস্তায়, পিছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে হাঁটতে লাগলো হন হন করে। দৃঢ় পদক্ষেপ, কাঁধ জোড়ার আড়ষ্ট ভাব পরিষ্কার জানিয়ে দিলো এখন্দেই বিদায়পর্ব চূড়ান্ত, পিছু নিয়ে কোনো ফায়দা হবে না।

প্রথম বাকেই ক্ষুদ্রে একটা রেস্তোরাঁ পেয়ে গেলো জেক, সরকারি গুদামের উঠান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, লুকিয়ে থাকার জন্যে পছন্দ হ’লো ওর। বরফ আর বিয়ার নিয়ে বসলো সে, চিন্তায় প’ড়ে গেছে। ব্যাটা ইংরেজ ওকে ভারি অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি দান করেছে, গাড়িগুলো সম্পর্কে তার আগ্রহ স্রেফ নির্মল কৌতূহল

ব'লে মনে হয়নি। নিলামে যদি জাত বেনিয়া কেউ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ওকে হয়তো প্রতিটি গাড়ির জন্যে বিশ পাউন্ডের বেশি প্রস্তাব দিতে হ'তে পারে। জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে ছাগ চর্মের তৈরি মানিব্যাগটা বের করলো জেক, ওর সমস্ত জাগতিক সম্পদের এটাই বর্তমানে একমাত্র ভাণ্ডার। কোলের ওপর সব টাকা বের করে গুণলো ও।

পাঁচশো সতেরো পাউন্ড, তিনশো সাতাশ মার্কিন ডলার, চারশো নব্বই পূর্ব আফ্রিকান শিলিঙ- সব মিলিয়ে অংকটা এতো বড় নয় যে রানী এলিজাবেথের সৌখিন ধান্দাবাজ প্রজার সাথে টক্কর দেয়া যায়। বিয়ার শেষ করলো জেক, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো, শক্ত করলো চোয়াল, আরেকবার চোখ বুলালো পকেট-ঘড়ির ওপর। বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট।

দীর্ঘদেহী জেক বারটনকে ভিজে বেড়ালের মতো গेट পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে সামান্য হতাশ হ'লো মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্, কিন্তু মোটেও বিস্মিত হ'লো না। পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই এমন একটা টি-পার্টিতে শুধু বয়োবৃদ্ধরা রয়েছে, কাঁটাচামচ চুরি করার জন্যে চুপিসারে ঢুকে পড়েছে একজন লোক-জেকের হাঁটা আর হাবভাব দেখে এরকম একটা দৃশ্যের কথা মনে প'ড়ে গেলো তার।

আমগাছ তলায় উল্টো করা একটা ড্রামের ওপর ব'সে রয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্, ড্রামের ওপর একটা রুমাল বিছিয়ে নিয়েছে দামী স্যুটে যাতে কোনো ময়লা না লাগে। স্ট্রি হ্যাটটা তার হাতে রয়েছে, মাথার চুল সুন্দর করে ছাঁটা এবং নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো। চুলের এই রঙ সহজে চোখে প'ড়ে না, সোনালি লালচে, কোমল জ্বলজ্বলে একটা ভাব নিয়ে শোভা পাচ্ছে মাথায়। গৌফ জোড়াও একই রঙের চওড়া এবং খাটো করে ছাঁটা। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, স্নান নীল রঙের চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে জেকের দিকে। উঠান পেরিয়ে জোড়া আমগাছের দিকে এগোচ্ছে জেক, ক্রেতার সবাঁই ভিড় করেছে সেখানে। সরাসরি না তাকিয়েও টের পেয়ে গেছে ও, কেউ একজন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে ওকে। কে হ'তে পারে লোকটা আন্দাজ করে নিয়েছে। পরিবর্তনটুকু সূক্ষ্ম হলেও, গ্যারেথ সোয়েলসের দৃষ্টি এড়ালো না। শক্ত হয়ে উঠলো জেকের কাঁধের পেশি, দৃঢ় হ'লো হাঁটার ভঙ্গি, উঁচু করা মাথা আর ফুলে থাকা বুক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চোখ ফিরিয়ে নিলো গ্যারেথ সোয়েলস্, পকেট থেকে এনভেলাপ বের করে নিজের আর্থিক সঙ্গতির হিসাব পাবার চেষ্টা করলো।

তার আর্থিক অবস্থা জেকের চেয়ে কোনো অংশে সুবিধের নয়, গত আঠেরো মাস ভাগ্য তাকে কোনো রকম সহায়তা করেনি। মুকদেন-এ, চাইনিজ নেতার উদ্দেশ্যে তার কার্গোর চালানটা লিয়াও নদীতে জাপানী গানবোটের হাতে ধরা পড়েছে। আর অল্প কয়েক ঘণ্টা পেলেই ওটা ডেলিভারে করে রওনা হয়ে যেতো সে; কিন্তু বিধি বাম-দশ বছরের মূলধন এক নিমিষেই শেষ। তবে হাল ছেড়ে দেয় নি সে, আবার প্রথম থেকে শুরু করার জন্যে যথেষ্ট খাটাখাটনি করছে। ব্যবসায়িক বৃদ্ধি, কূটকৌশল, মোক্ষম

জায়গায় উপটোকন বিতরণ ইত্যাদির সাহায্যে অস্ত্রের আরেকটা চালান ডেলিভারি দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে গ্যারেথ। অস্ত্রগুলো এই মুহূর্তে দার-এস-সলাম বন্দরের চার নম্বর ওয়্যার হাউসে রয়েছে, তার বের করে নিয়ে আসার অপেক্ষায়। ক্রেতাও ঠিক করা আছে, বারো দিনের মধ্যে ডেলিভারি নিতে আসবে সে। চালানটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা চেহারা পেতে পারে যদি অস্ত্রের সাথে আর্মারড কারগুলোও থাকে।

আর্মারড কার? হ্যাঁ, চেষ্টা করলে যে কোনো দাম হাঁকতে পারে সে। একমাত্র পাইলট সহ এয়ারক্রাফট পেলে এরচেয়ে বেশি খুশি হবে তার ক্রেতা।

আজ সকালে প্রথম যখন ওগুলো দেখলো গ্যারেথ, সাথে সাথে কেনার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিল। অত্যন্ত পুরনো, অবহেলার সাথে রাখা হয়েছে, চেহারাই ব'লে দেয় মেরামতের যোগ্য নয়। ফিরে যাচ্ছিলো সে, হঠাৎ দেখতে পেলো একটা আর্মারড কারের তলায় পেশিবহুল একজোড়া পা। তারপর তার কানে ঢুকলো, গাড়ির তলা থেকে শিসের আওয়াজ আসছে।

এখন সে জানে অস্ত্র একটা গাড়ি মেরামত করে চালানো যাবে। কিভাবে কী করতে হবে সব ঠিক করে ফেলছে সে। কয়েক গ্যালন রঙ দরকার হবে। প্রতিটি আর্মারড কারের মাউন্টিংয়ে একটা করে ভিকাস মেশিনগান থাকবে। দেখে কী মনে হবে? মনে হবে সদ্য তৈরি ঝকঝকে পাঁচটা আর্মারড কার কারখানা থেকে এইমাত্র বের করা হয়েছে। ক্রেতাকে কিভাবে মোহিত করবে গ্যারেথ সোয়েলস? কেনো, তার প্রসিদ্ধ বিক্রয় কৌশল রয়েছে না! একটা, মাত্র একটা আর্মারড কার স্টার্ট দেবে সে, এলোপাথাড়ি পাঁচশো গুলি ছুঁরে মেশিনগানের কেরামতি প্রদর্শন করবে-ব্যস, গ'লে ছাত্ত হয়ে যাবে রাস্টাফারিয়ান গোত্রের রাজপুত্র, উল্লাসে উদ্ভ্রান্ত হয়ে সবগুলো আর্মারড কার আর মেশিনগানের দাম চুকিয়ে দেবে।

তার রঙিন স্বপ্নে কালি ছিটাচ্ছে শুধু একজন। ইয়াংকি ব্যাটাই তার উদ্বোধনের কারণ। হয়তো ভয় পাবার কিছু নেই, দু'দশ শিলিং বেশি দর হাঁকলেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, পাল্লা দিতে না পেরে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে লোকটা। না, আসলেও ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। হাবভাব, চেহারা-সুরং দেখে তো মনে হ'লো কোনো একমে দিন কাটাচ্ছে, বুঁকি নেওয়া বা বাজে খরজ করার পয়সা পকেটে নেই। দেখা যাক।

কোটের আস্তিনে আঙুলের টোকা দিলো গ্যারেথ, হয়তো ধুলোর খানিকটা ভাব জমেছিলো ওখানে। সোনালি লালচে মাথায় পানামা-টা তুললো, সতর্কতার সাথে অ্যাডজাস্ট করলো চওড়া কার্শিশ, ছাই পরীক্ষা করার জন্যে লম্বা সরু চুরটটা নামালো ঠোঁট থেকে, তারপর ড্রাম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে, ধীর-শান্ত পায়ে এগুলো ভিড় লক্ষ্য করে। নিলামদার একজন শিখ বামন, কালো স্যুট পরা, লম্বা দাড়ি বাঁক নিয়ে গলায় মাফলারের মতো জড়িয়ে আছে, মাথায় মস্ত একটা সাদা পাগড়ি।

সবচেয়ে কাছের আর্মারড কারের টারিটে উঠে পড়েছে সে, দাঁড়ে বসা কালো কাকের মতো লাগছে তাকে। তার কণ্ঠস্বর সস্রুণ বিলাপের মতো, শোকাবুল। প্রস্তাব

পাবার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে সে। উপস্থিত লোকজন ভাবলেশহীন পাথুরে চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, চোখে শাণিত দৃষ্টি।

‘আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ, কেউ একজন দশ পাউন্ড ব’লে চিৎকার করে উঠে আমার কানে মধুবর্ষণ করুন! আমি কি “দশ পাউন্ড” শুনলাম?’

মাথা একদিকে কাত করে ভালো করে শোনার ভঙ্গি করলো সে, গাছের ডালে বাতাসের শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। কেউ নড়লো না, কেউ মুখ খুললো না।

‘পাঁচ পাউন্ড, প্লিজ? বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সুচতুর কোনে ব্যবসায়ী আছেন কি যিনি এই চমৎকার বাহনগুলোর প্রতিটির জন্যে পাঁচ পাউন্ড দিতে চান? ওগুলো আর্মারড কার, মহোদয়গণ! নামটাই যে শুধু গাল ভরা তাই নয়, কাজেও এক একটা অক্লান্ত ঘোড়া! যেমন তেজি তেমন সুন্দর, যেমন রূপ তেমনি তার গুণ! ঠিক আছে, ভাইসব, দুই পাউন্ড দশ পেন্স-আসুন, জমজমাট দর হাঁকাহাঁকির প্রতিযোগিতা পঞ্চাশ শিলিং দিয়েই শুরু করি আমরা।’ চোখে নগ্ন প্রত্যাশা নিয়ে ভিড়ের উপর চোখ বুলালো বামন শিখ, কেউ নড়ছে না দেখে কৌচকানো ভুরু থেকে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কল্লিত ঘাম মুছল সে। ‘প্রস্তাব, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাকে একটা প্রস্তাব দিন, প্লিজ!’ চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে।

‘এক পাউন্ড!’ ভিড় থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। শিখ নিলামদার এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো, তারপর ধীর নাটকীয় মন্থরতার সাথে মাথা তুলে জেকের দিকে তাকালো সে। ভিড়ের মধ্যে টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে আছে জেকের মাথা।

‘এক পাউন্ড?’ খসখসে কাঁদো কাঁদো গলায় ফিসফিস করে বললো শিখ নিলামদার। ‘এতো সুন্দর, এমন তেজি আর্মারড কারের জন্যে মাত্র এক পাউন্ড,’ কথা শেষ না করে দুঃখ এবং হতাশার সাথে ঘন ঘন মাথা নাড়ালো সে। তারপর অকস্মাৎ তার আচরণ বদলে গেলো, চোখের পলকে ব্যবসায়ীসুলভ চটপটে ভাব ফুটলো চেহারা। ‘আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে প্রতিটি এক পাউন্ড। আমি কি দুই পাউন্ড শুনলাম? এক পাউন্ডের ওপর কেউ প্রস্তাব দিচ্ছেন না?’ হাতে ধরা হাতুড়িটা শূন্যে তুললো সে। ‘প্রথমবার বলছি, এক পাউন্ড। দ্বিতীয়বার বলছি...।’

সামনে বাড়ালো গ্যারেথ সোয়েলস্, জাদুমন্ত্রের মতো ফাঁক হয়ে গেলো ভিড়টা, লোকজন দু’পাশে সরে গেলো সসম্মানে।

‘দুই পাউন্ড,’ মৃদুকণ্ঠে বললো সে, নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা গেলো কথাটা। দীর্ঘদেহী জেকের আপাদমস্তক আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, লালচে আভা ফুটলো নগ্ন ঘাড়। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পাশে তাকালো সে, ইতিমধ্যে ভিড়ের কিনারায় পৌঁছে গেছে ইংরেজ যুবক।

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হ’লো গ্যারেথের চেহারা, জেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে অভিজাত ভঙ্গিতে সে তার পানামা হ্যাটের কার্ণিশ দু’আঙুলে আলগোছে একবার স্পর্শ করলো। শিখ নিলামদারের পাকা ব্যবসা-বুদ্ধি সাথে সাথে টের পেয়ে গেছে ওদের

দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব রয়েছে। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে উঠলো তার হাসি।

‘আমি শুনলাম দুই পাউন্ড...।’ নিরীহ ভঙ্গিতে শুরু করলো সে।

‘পাঁচ,’ ধমকের সুরে বললো জেক।

‘দশ,’ বিড়বিড় করে উঠলো গ্যারেথ, জেক অনুভব করলো ক্রোধের অদম্য একটা ঢেউ ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুভূতিটার সাথে পরিচয় আছে, চেষ্টা করলো দমন করতে, কিন্তু কোনো লাভ হ'লো না। উপস্থিত লোকজন লম্বা লোকটার দিকেই তাকিয়ে আছে, সবাই উত্তেজিত। উপভোগ্য নিলাম দেখার লোভেই ভিড় জমিয়েছে তারা।

‘পনেরো,’ বললো জেক, পরমুহূর্তে প্রতিটি মাথা ঘুরে গেলো ইংরেজ লোকটার দিকে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে জেকের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। ‘বিশ?’

‘বিশ এবং আরো পাঁচ।’ জেকের চোখে পলক পড়লো না।

‘ত্রিশ?’

‘আরো পাঁচ।’

‘আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে পঁয়ত্রিশ পাউন্ড...’ নিলামদারের গলা কেঁপে গেলো।

‘চল্লিশ।’ বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই রাগ দমন করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেক, কিন্তু মনে মনে জানে বেনিয়া লোকটাকে গাড়িগুলো কোনোভাবেই নিতে দেবে না ও। শেষ পর্যন্ত যদি কিনতে না-ই পারে, ওগুলো পুড়িয়ে দেবে সে।

খুঁতখুঁতে চোখে গ্যারেথের দিকে তাকালো নিলামদার। ‘চল্লিশ, স্যার?’ জিজ্ঞেস করলো সে, উত্তরে মৃদু হাসির সাথে হাতের চুরটটা শুধু দোলালো গ্যারেথ। মনে মনে বিস্ময়ের সীমা নেই, তার হিসাব অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক আগেই আর্থিক সঙ্গতির সীমা পেরিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে হিসাবে ভুল হয়েছে তার।

জেক মনে মনে নিজের সাথে কথা বলছে—ওগুলো আমার, মানিব্যাগ খালি করে হলেও কিনবো আমি।

‘চল্লিশ।’ গ্যারেথ সোয়েলসের হাসিতে আড়ষ্ট ভাব, সে-ও এবার তার নিজের আর্থিক সঙ্গতির কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে। নিলামে জিতলে সাথে সাথে নগদ টাকা অথবা স্থানীয় অনুমোদিত ব্যাংকের চেক জমা দিতে হবে। নগদ টাকা যেখানে যা পাওয়ার ছিলো অনেক আগেই সব চেষ্টে তুলে এনেছে সে। আর স্থানীয় কোনো ব্যাংকের ম্যানেজার যদি গ্যারেথ সোয়েলসের চেক পেয়ে টাকা দেয় তাহলে তার চাকরি থাকবে না।

‘পঁয়তাল্লিশ।’ জেকেল কণ্ঠস্বর কঠিন, আপসহীন। যদিও তিরস্কার করছে নিজেকে, লাভের মধ্যে ইংরেজ ব্যাটাকে এক হাত দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা-ও শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বলা যায় না।

‘পঞ্চাশ...’ গ্যারেথ সোয়েলস্ শেষ করতে পারলো না।

তার আগেই জেক বললো, ‘পঞ্চাশ।’

‘ষাট?’

‘পঁয়ষট্টি,’ দম না নিয়ে বললো জেক। ক্ষীণ আশা রয়েছে, এই দামে কিনে লাভে বিক্রি করার।

গ্যারেথ বললো, ‘সত্তর।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করলো জেক। এর চেয়ে বেশি দাম পড়লে নির্ঘাৎ লোকসান দিতে হবে ওকে।

‘আমাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো নিলামদার, ‘সত্তর পাউন্ড’ হাঁ করে জেকের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে।

‘পঁচাত্তর।’

মনে মনে হিসাব রাখছে জেক, দুশো শিলিং করে লোকসান হবে। এবং এটাই গ্যারেথ সোয়েলসের শেষ সীমা। দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, বুঝতে পেরেছে গাড়িগুলো তার কপালে এভাবে জুটবে না। তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ড-ই তার পকেটের সম্মল, জবাই করে ফেললেও তার বেশি বের করতে পারবে না। অবশ্য আরো হাজারটা উপায় আছে, তার যেকোনো একটার সাহায্যে গাড়িগুলোর মালিক হ’তে পারবে সে। হ’তে পারবে, এবং হবেও। প্রিন্স লিজ মিথয়েল হারারিকে পটিয়ে বেশি দাম আদায় করতে হবে, এই যা।

‘পঁচাত্তর,’ বললো জেক, ভিড়ের ভেতর থেকে চাপা গুঞ্জন উঠলো, প্রতিটা মাথা ঘুরে গেলো গ্যারেথ সোয়েলসের দিকে।

‘সম্মানিত মহাশয়,’ নিলামদার সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কি আশি বলেছেন, স্যার?’ পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন পাবে সে।

সগর্বে, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মাথা নাড়লো গ্যারেথ সোয়েলস, গভীর মনোযোগের সাথে সে তার চুরুটের ছাই পরীক্ষা করছে। তারপর মুখ তুললো সে, ঠোঁটে একটুকরো কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বললো, ‘না, ভুলে যান, আমি কিছুই বলি নি।’ জেকের দিকে তাকালো সে। ‘ওগুলো তোমাকে আনন্দ দান করুক, এই কামনা করি।’ ভিড় ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে, গেটের দিকে হাঁটা ধরলো। এখুনি কোনো প্রস্তাব দিয়ে লাভ নেই, ইয়াংকি যুবক ভালো একটা প্রস্তাবও প্রত্যাখান করে বসতে পারে। এই লোক রাগের মাথায় হাত চালাতে কার্পণ্য করার মানুষ নয়।

বহু কাল আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছেছে মেজর গ্যারেথ সোয়েলস, যুদ্ধ করে শুধু বোকারা, জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে যুদ্ধের উপকরণ যোগান দেয়-লাভের বিনিময়ে, অবশ্যই।

ঠিক তিন দিন পর আবার ইংরেজ লোকটার সাথে দেখা হ’লো জেকের। ইতিমধ্যে সে তার পাঁচটা লৌহমানবীকে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে এনেছে ছোট ঝর্ণার কিনারায় নিজের সদ্য তৈরি ক্যাম্পে। জায়গাটা শহরের বাইরে, পাহাড়ের

কাছাকাছি, চারপাশে আফ্রিকান মেহগনি গাছের ছড়াছড়ি, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা শিস দেয় পাখিরা।

মেহগনি ডালে কপিকল ঝুলিয়ে এঞ্জিনগুলো বের করে নিয়েছে জেক, পেট্রল ল্যাম্পের আলোয় গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেছে ওগুলো ওপর। পুরো একটা দিন কেটেছে বাতিলযোগ্য পার্টস সনাক্ত করতে। পুরনো লোহা-লকড়ের দোকানে গিয়ে তালিকা মিলিয়ে খুঁজতে হয়েছে সেগুলো। দিনে আঠারো ঘণ্টা খেটেছে ও, দিনের বেলা ওর সাথে তাল মিলিয়ে পাখিরা শিস দেয়ায় পরিশ্রমটুকু গায়ে লাগে নি। তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে ঘরোয়া কলেবর জেক বারটন তিনটে বেন্টলি এঞ্জিন চালু করতে পারলো। খুঁটির ওপর তৈরি বাঁশের নিচু মাচায় এঞ্জিনগুলোকে একেবারে নতুন বলে মনে না হলেও, ঝকঝক করছে। সন্দেহ নেই মেকানিকের হাতের ছোঁয়ায় জাদু আছে।

সেদিনই বিকেলে, চারদিক যখন নির্মম রোদে পুড়ছে, জেকের ক্যাম্পে হাজির হ'লো গ্যারেথ সোয়েলস্। রিক্সায় চেপে এলো সে, সেটা টেনে নিয়ে এলো অর্ধনগ্ন ঘরোয়া একজন কালো আফ্রিকান। গদি লাগানো সিটের ওপর বিশ্রামরত চিতার মতো লাগলো তাকে, পরে আছে দুধ-সাদা লিনেনের স্যুট, ভাঁজগুলো তীক্ষ্ণ। একটা এঞ্জিন চালু করে আওয়াজে কোনো ত্রুটি আছে কিনা পরীক্ষা করছিল জেক, কোমর পর্যন্ত উদোম, খিঁজ লেগে কালো হয়ে আছে হাত দুটো, বুক আর পিঠে ঘাম চকচক করছে, যেনো তেল মেখেছে সারা গায়ে।

‘এমনটি দাঁড়িয়ে না, বন্ধু,’ মৃদুকণ্ঠে বললো জেক। ‘সোজা হেঁটে চোখের সামনে থেকে দূর হও।’

নিঃশব্দে হাসলো গ্যারেথ, যেনো পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রসিকতা গায়ে মাখছে না। সিটের এক পাশ থেকে সিলভারের একটা বালতি উঁচু করে জেককে দেখালো সে, গায়ে শিশিরের মতো পানি জ'মে আছে, ভেতরে টুকরো বরফ পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ করছে। বালতির কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে এক ডজন বিয়ারের বোতল।

‘যুদ্ধ নয়, শান্তির প্রস্তাব, ওল্ড চ্যাপ,’ বললো গ্যারেথ, ‘শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অঙ্গীকার।’ তৃষ্ণার্ত জেকের গলার ভেতরটা হঠাৎ করে এমন শুকিয়ে গেলো যে, এক মুহূর্ত কোনো কথাই বলতে পারলো না ও।

‘শর্তহীন উপহার-ঘুম বা টোপ নয়?’ এই প্রচণ্ড গরমের ভেতরও কাজের মধ্যে এমনই মগ্ন হয়ে ছিলো জেক যে যতোটুকু প্রয়োজন তার সিকিভাগ তরলপদার্থও গলাধঃকরণ করে নি, যা-ও বা করেছে তার মধ্যে এ-ধরনের স্নান সোনালি, বুদবুদ ওঠা, বরফ মেশানো কিছু ছিলো না। বিয়ারের বোতলগুলো দেখে শুধু যে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার অবস্থা হ'লো তাই নয়, ওগুলো পাবার প্রচণ্ড ইচ্ছায় কেমন যেনো ঝাপসা হয়ে গেলো চোখের দৃষ্টি।

রিক্সা থেকে নামলো গ্যারেথ, বগলের তলায় বালতি নিয়ে এগিয়ে এলো। ‘গ্যারেথ,’ বললো সে। ‘মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্।’ খালি ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো জেকের দিকে।

‘জেক বারটন।’ তাই তো বলি! ভাবলো জেক। হাতটা ধরলো ও, তবে চোখ এখনো আটকে আছে বালতির ওপর।

বিশ মিনিট পর। ঝর্ণার পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে জেকের, বগলের তলায় সাবান ঘষছে, বিয়ারের বোতল নাগালের মধ্যে।

‘বিপদটা দেখা দেয়, কারণ পরস্পরকে আমরা চিনতে ভুল করেছিলাম,’ ব্যাখ্যা করলো গ্যারেথ, বোতল থেকে সরাসরি বিয়ার ঢাললো গলায়। তাঁবুর বাইরে, শেড ফ্ল্যাপের নিচে ছায়ায় ফেলা জেকের একমাত্র ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ারটায় প্রায় শুয়ে আছে সে। ‘স্বীকার করছি, কোথায় পা ফেলছি দেখি নি।’

‘লাখিটা প্রায় নিজের বুকেই খেয়েছো,’ একমত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো জেক, তবে গলায় ঝাঁঝ নেই, ঠাণ্ডা বিয়ার মেজাজের ওপর ওষুধের কাজ করছে।

‘তোমার যে কেমন লেগেছিল বুঝতে পারি,’ বললো গ্যারেথ। ‘কিন্তু ভেবে দেখো, বলেছিলে নিলামে তুমি থাকবে না। যদি সত্যি কথা বলতে, আমরা হয়তো একটা চুক্তিতে আসতে পারতাম।’

সাবানের ফেনা ঢাকা হাত বাড়িয়ে বিয়ারের একটা বোতল তুলে নিলো জেক। ঢক ঢক করে দু’টোক গিললো। একজোড়া ঢেকুর তুললো। তারপর একটা ঢেকুর ত্যাগ করলো।

‘ব্লেস ইউ! যখনই বুঝতে পারলাম তুমি সিরিয়াসলি ডাক দিচ্ছো, পিছিয়ে গেলাম আমি। জানতাম, দু’জনের জন্যে লাভজনক একটা সমঝোতায় পরে আমরা ঠিকই আসতে পারবো। আর দেখো, বান্দা হাজির, তোমার সাথে ব’সে বিয়ার খাচ্ছি, একটা চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা চলছে।’

‘কথা বলছো একা তুমি, আমি শুধু শুনছি,’ বললো জেক।

‘ঠিক তাই।’ চুরুট কেস বের করলো গ্যারেথ, সাবধানে বেছে নিলো একটা, সামনের দিকে ঝুঁকে কায়দা করে গুঁজে দিলো জেকের দুই ঠোঁটের মাঝখানে। বুটের সোলে ঘষা দিয়ে দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালালো, জোড়া করপুটের ভেতর নিয়ে জেকের দিকে বাড়িয়ে ধরলো আগুনটা। ‘আমার ধারণা তোমার সন্ধানে ভালো একজন ক্রেতা আছে, নয়?’ ভুরু জোড়া একবার নাচালো সে।

‘এখনো আমি শুনছি,’ আয়েশ করে চুরুটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো জেক।

‘তুমি নিশ্চয়ই গাড়িগুলোর একটা দাম ঠিক করেছো। তারচেয়েও বেশি দাম দিতে আমি ইতস্তত করবো না।’

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে এই প্রথমবার স্থিরদৃষ্টিতে গ্যারেথকে খুঁটিয়ে দেখলো জেক। ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে, আমার নির্ধারিত দামে, গাড়ি পাঁচটা কিনতে চাও তুমি?’

‘চাই,’ বললো গ্যারেথ।

‘যদি বলি শুধুমাত্র তিনটে চালানো যাবে, বাকি দুটোর কোনো আশা নেই?’

‘তাতেও আমার প্রস্তাব বদলাবে না।’

হাত বাড়িয়ে বিয়ারের বোতলটা তুলে নিলো জেক, কয়েক ঢোকে নিঃশেষ করে ফেললো। আরেকটা বোতল খুললো গ্যারেথ, ধরিয়ে দিলো জেকের হাতে।

প্রস্তাবটা নিয়ে দ্রুত চিন্তা করলো জেক। তাজানিয়ার মাঝারি গোছের একটা সুগার কোম্পানির সাথে কথা হয়েছে ওর, ওদেরকে নির্ধারিত একশো দশ পাউন্ডে গ্যাসোলিন চালিত সুগারকেইন ক্র্যাশার সরবরাহ করবে ও। তিনটে গাড়ি থেকে সব মিলিয়ে তিন শো ত্রিশ পাউন্ড আসার কথা। কিন্তু ইংরেজ লোকটা কিনতে চাইছে পাঁচটাই, ওর চাওয়া দামে। ‘বুঝতেই পারছো, ওগুলোর পিছনে সময় নষ্ট করেছে আমি।’ দাম হাঁকার আগে গ্যারেথকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে চাইছে।

‘জানি, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।’

‘প্রতিটি একশো পঞ্চাশ পাউন্ড, সব মিলিয়ে সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড হ’লো।’

‘এঞ্জিনগুলো তুমি আবার জোড়া লাগিয়ে জাহাজে তোলায় উপযোগী করে দেবে।’

‘অবশ্যই।’

‘রাজি,’ বললো গ্যারেথ, দু’জনেই পরস্পরকে স্মিতহাস্য উপহার দিলো। ‘বেচাবিক্রির একটা চুক্তিপত্র এখন আমি তৈরি করে ফেলতে চাই।’ একটা চেক বই বের করলো গ্যারেথ। ‘আমি আবার বাকিতে কাজ করতে পছন্দ করি না। তোমার পাওনা পুরো টাকার চেক এখন লিখে দিচ্ছি।’

‘টাকার কি?’ জেকের মৃদুহাস্য ম্লান হ’তে শুরু করলো।

‘চেক। যে সে ব্যাংক নয়, লন্ডনের কাউন্টস্-এ অ্যাকাউন্ট রয়েছে আমার, পিকাডেলি স্কয়ারে...।’

কথাটা মিথ্যে নয়। কাউন্টস্ ব্যাংকে সত্যিই একটা অ্যাকাউন্ট আছে বটে গ্যারেথ সোয়েলসের। তবে অ্যাকাউন্টটার সর্বশেষ হিসাবে জানা যায়, আঠেরো পাউন্ড সতেরো এবং ছয় পেন্স ও.ডি. নিয়েছে গ্যারেথ, এবং বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও টাকাটা শোধ দিতে গড়িমসি করেছে সে। মাত্র ক’দিন আগেও লাল কালিতে লেখা ম্যানেজারের একটা রিমাইন্ডার পেয়েছে সে।

‘নগদ টাকা নিজের সাথে রাখা নিরাপদ নয়, বিশেষ করে বিদেশ বিভূঁইয়ে,’ বললো গ্যারেথ, চেক বইটা খুলে লেখার জন্যে তৈরি হ’লো সে। চেকটা লন্ডনে পৌঁছতে অন্তত হপ্তাখানেক লাগবে-এবং টাকার আকৃতি নিয়ে কখনোই ওটা ফিরে আসবে না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার আগেই পালিয়ে মাদ্রিদে চলে যাবে গ্যারেথ, শুনেছে ওখানে নাকি ধনকুবেরদের বোকা বানিয়ে সহজেই দু’পয়সা কামানো যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশও নাকি ভালো। হাতে কিছু পুঁজি থাকলে সিঁড়ি বেয়ে আবার ওর তর করে উঠে যাব সে।

‘চেক ভালো জিনিস, তোমার সাথে আমি একমত। কিন্তু মুশকিল হ’লো আমার ঠিক সয় না, অ্যালাজি আছে।’ চুরটটা নামিয়ে হাতে নিলো জেক। ‘নগদ আর চেক দুটোই যদি তোমার কাছে সমান হয়, আমি বরং সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড নগদই নেবো।’

জিভের ডগা দিয়ে ঠোট ভেজালো গ্যারেথ। উঁহু, ব্যাপারটা এতো সহজে সারা যাচ্ছে না। ‘দেখো দিকি, কি বিপদে না পড়া গেলো—চেক ক্লিয়ার হয়ে আসতে খানিকটা সময় তো লাগবেই।’

‘কোনো তাড়া নেই,’ নিঃশব্দে হেসে তাকে আশ্বস্ত করলো জেক। ‘কাল দুপুরের মধ্যে যেকোনো সময় টাকাটা পেলেই চলবে আমার। আমার প্রথম ক্রেতাকে ওই সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দেয়ার কথা হয়ে আছে। সময় মতো তুমি যদি টাকা নিয়ে পৌঁছুতে পারো, গাড়িগুলো তোমার হয়ে যাবে।’ নিচু স্বর্য থেকে উঠে এলো ও, ওর আফ্রিকান ভৃত্য হাতে একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিলো।

‘আজ তোমার ডিনার প্ল্যানটা কী রকম?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

‘আবু’র ইচ্ছে আজ আমাকে হরিণের মাংস রঁধে খাওয়াবে।’ আফ্রিকান কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলো জেক।

‘তারচেয়ে রয়াল-এ তুমি আমার অতিথি হও না কেনো?’

‘যার বিয়ার খেতে পারি, তার ডিনার খেতে আপত্তি করবো কেনো?’ সহাস্যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো জেক।

রয়াল হোটেলের ছাদ বেশ উঁচুতে, জানালাগুলোতে পোকামাকড় ঠেকানোর জন্যে জালি দেয়া পর্দা। ডাইনিং রুমটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, তবে মেজবান গ্যারেথের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করলো জেক। ওকে আলিঙ্গন করলো সে, সবিনয় ভদ্রতার সাথে পথ দেখিয়ে এক কোণে একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো, সারাক্ষণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা, একের পর এক দামী খাবারের অর্ডার দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো ওয়েটারদের। তার হাসি সংক্রামক, এক সময় জেকও আক্রান্ত হয়ে পড়লো। আলাপ শুরু হ’তে না হ’তে দু’জনেই ওরা আবিষ্কার করলো তাদের কাজ-কর্ম এবং ভ্রমণের ইতিহাসও প্রায় একই। ভেনিজুয়েলার মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্যারেথ যখন সম্মুখসমরে লড়াই, জেক তখন একই দেশে রেলরোড তৈরির কাজে নিয়োজিত। চীনে, ব্লাক লাইন কোস্টারে চিফ এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বে ছিলো জেক, ঠিক একই সময়ে ইয়েলো রিভার-এ চাইনিজ কম্যুনিষ্টদের সাথে ব্যবসা করছিলো গ্যারেথ।

একই সময়ে ফ্রান্সেও ছিলো দু’জন। ছয়ষষ্ঠীর মধ্যেই, অ্যামিয়েনস্-এর সেই ভয়াল দিনে, যখন জার্মান বাহিনীর মেশিনগানের বিরুদ্ধে বীরত্বের জন্যে মেজর পদে পদোন্নতি পেয়েছিলো গ্যারেথ সোয়েলস; সেই সময় মাত্র চার মাইল পিছনে রয়াল ট্যাংক বহরের সার্জেন্ট ড্রাইভারের ভূমিকায় ছিলো জেক।

দু’জনের বয়সও কাছাকাছি, ত্রিশের কোঠায়, অথচ এই স্বল্প সময়েই বহু স্থান ঘুরে অভিজ্ঞতার ঝুলি দারুণ সমৃদ্ধ করে ফেলেছে।

পরস্পরকে ক্রিষ্ণু চিনতে পারার পর, একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলো। ডিনার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দু’জনের মধ্যকার অমিল সম্পর্কে

সহনশীল একটা মনোভাব তৈরি হ'লো ওদের মধ্যে। জেক গ্যারেথকে জাত বেনিয়াদের একজন বা গ্যারেথ জেককে ইয়াংকি ব'লে ভাবছে না—কিন্তু তার মানে অবশ্য এই নয় যে, জেক গ্যারেথের কাছ থেকে কোনো চেক গ্রহণ করতে যাচ্ছে বা গ্যারেথ গাড়ি পাঁচটা হাত করার প্ল্যান ত্যাগ করেছে। অবশেষে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিঃশেষে খালি করে হাতঘড়ি দেখলো গ্যারেথ।

বললো, 'আরে, মাত্র নটা বাজে। রাত সবে শুরু হলো, তাই না? কোথায় যাবো আমরা, কী করবো?'

জেক পরামর্শ দেয়, 'শুনেছি মাদাম সিসিলি'র ওখানে আজই নাকি দুটো মেয়ে এসেছে, ভারি সুন্দরী।'

প্রস্তাবটা তাড়াতাড়ি বাতিল করে দিলো গ্যারেথ সোয়েলস্। 'পরে দেখা যাবে—ডিনারের পরপরই ঠিক ভাল্লাগবে না। কয়েক হাত তাস খেললে কেমন হয়? দার-এস-সালাম ক্লাবে মার্জিত ভদ্রলোকেরা খেলেন।'

'কিন্তু যাবো কীভাবে। আমরা তো মেম্বার নই।'

'কিন্তু আমি লন্ডন ক্লাবের মেম্বার, অর্থাৎ আমরা দু' জনেই মেম্বার, কী বলো ওল্ড বয়?' ভুরু নাচিয়ে একগাল হাসলো গ্যারেথ।

দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে খেলতে বসেছে ওরা। সময়টা উপভোগ করছে জেক। সুন্দর, মার্জিত পরিবেশ; উপস্থিত সবাই গণ্যমান্য ব্যক্তি। জানালা দরজায় ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে, দেয়ালে ঝুলছে হান্টিং ট্রফি এবং গাঢ় রঙের তৈলচিত্র। তিনটে বিলিয়ার্ড টেবিল থেকে আইভরি বলের আওয়াজ ভেসে আসছে, কালো টাই আর কালো ট্রাউজার পরা ধনীরা দুলালরা খেলছে ওদিকে, সবাই যে-যার সাক্ষ্যকালীন জ্যাকেট খুলে রেখেছে।

কন্ট্রাস্ট ব্রিজ খেলা হচ্ছে তিনটে টেবিলে, ফিসফিসে আওয়াজ ভেসে আসছে ডাক পাঁটা-ডাকের, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকই শ্বেতাঙ্গ, সবার পড়নে দামী স্যুট।

টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত আসা-যাওয়া করছে ওয়েটাররা, পড়নে আজানুলম্বিত আচকান, মাথায় ফেজ টুপি, হাতের ট্রেতে পানীয় ভর্তি গ্লাস— ঠিক যেনো কোনো প্রাচীন ধর্মাবলম্বী গোত্রের লোক।

পোকার খেলা চলছে মাত্র একটা টেবিলে। টেবিলটা বার্মা টিকের তৈরি, পিতলের ছাইদানি কাঠের সাথে ঝু দিয়ে আটকানো, মদের গ্লাস ও আইভরি চিপস্ রাখার জন্যে অগভীর গর্ত করা রয়েছে টেবিলের ওপর, তা-ও চকচকে পিতল দিয়ে মোড়া। টেবিলে পাঁচজন ব'সে আছে, তাদের মধ্যে একা শুধু জেকের পড়নে আনুষ্ঠানিক সাক্ষ্যকালীন পোশাক নেই। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন পোকার খেলায় এতোটাই কাঁচা যে, জেকের লোভ হ'তে লাগলো—ওদেরকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে হোটেল কামরার আলমারিতে তুলে রাখে। টাকার অভাব হলেই আলমারি খুলে খেলতে বসাবে।

একজন ব্রিটিশ, প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্য, আফ্রিকায় এসেছেন শিকার করতে। গভীর জঙ্গল থেকে সদ্য ফিরেছেন তিনি, ওখানে বন্য পশুদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে আফ্রিকান এক শিকারী হেভি ক্যালিবার রাইফেল হাতে সারাক্ষণ তাঁর কনুইয়ের পাশে উপস্থিত ছিলো, এবং তার উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি বুনো মোষ, সিংহ ও গণ্ডার নিধন করেছেন ভদ্রলোক। তাঁর একটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলো জেক-ডান চোখের নিচে অতি সংবেদনশীল একটা শিরা রয়েছে, হাতে ভালো কার্ড উঠলেই তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে সেটা। এতে যদি প্রমাণও হয় যে, লোকটা নার্সাস প্রকৃতির, বলতেই হবে তার প্রকৃতির সাথে ভাগ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ভদ্রলোক প্রায় প্রতি দানেই ভালো কার্ড পাচ্ছেন, ফলে জেক আর তিনিই শুধু জিতছেন।

দ্বিতীয়জন জেকের সময়বয়সী, কফি বাগানের মালিক। হাতের কার্ড খরাপ হলে বা হেরে গেলে সাপের মতো হিসহিস করে ওঠে।

জেকের ডান দিকে বসেছেন বয়স্ক একজন আমলা, তাঁর মস্ত টাকের মাঝখানে কলংকের মতো কাঁচাপাকা অল্প ক'গাছি চুল। ভদ্রলোক বেশিরভাগ সময় হু হু করে হারছেন, কিন্তু জেতার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিলেই নেয়ে উঠছেন ঘেমে।

সতর্কতার সাথে ঘণ্টাখানেক খেলার পর একশো পাউন্ডের মতো জিতলো জেক, গ্যারেথের ঔদার্য ভক্ষণ করা উপাদেয় ডিনার যেখানে হজম হচ্ছে সেখানে উষ্ণ এবং তৃপ্তিকর একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। এই মুহূর্ত ওর জীবনে অশান্তি এবং অস্বস্তির একমাত্র কারণ যেটা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে দায়ী গ্যারেথ সোয়েলস্, ওর নতুন বন্ধু এবং স্পনসর।

সহজ ভঙ্গিতে, পেশি টিল করে দিয়ে ব'সে আছে গ্যারেথ। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে মোটেও কার্পণ করছে না সে। আমেরিকান শিকারী জিতছেন, কাজেই তাঁকে বাহবা দিচ্ছে। কফি প্লান্টের মালিক আর বয়স্ক আমলা হারছে, ওদেরকে আন্তরিক সহানুভূতির সাথে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে সং পরামর্শ দিতেও ইতস্তত করছে না-যেহেতু হেরেছেন, কাজেই টাকা তুলতে হলে বেশি করে বাজি ধরতে হবে। সে নিজে খুব বেশি হারে নি বা জেতে নি, প্রায় সমান সমান অবস্থায় রয়েছে অথচ তার তাস বাঁটার মনোমুগ্ধকর ধরন অভিজ্ঞ জেকের চোখে সাংঘাতিক সন্দেহজনক ব'লে মনে হ'তে লাগলো। লম্বা দশ আঙুলের ভেতর নিয়ে কার্ডগুলো এতো দ্রুত শাফল করতে পারে যে, দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি কার্ড অনুসরণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য রাখলো জেক, চুপিসারে, প্রতিবার যখনই কার্ড বিলি করার দায়িত্ব পেলো মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্। একজন ডিলার যতো কুশলীই হোক, তার হাতের ছোঁয়ায় যতোই জাদু থাকুক, পছন্দ মতো নির্দিষ্ট কোনো কার্ড অন্যান্য কার্ডের ভেতর সাজিয়ে রাখা সম্ভব নয়, যদি না সে শাফল করার সময় ওগুলো নিজের দিকে সিধে করে রাখে। জেক দেখলো, শাফল করার সময় কার্ডের দিকে তাকাচ্ছেই না গ্যারেথ। প্রতিপক্ষদের মুখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শান্ত দৃষ্টি, হালকা সুরে কথা ব'লে চলেছে। জেকের পেশি একটু একটু করে শিথিল হ'তে শুরু করলো।

কফি প্রান্টের মালিক কার্ড বাঁটলো। চারটে একরঙা কার্ড পেয়ে দানটা জিতলো জেক। আইভরি চিপস নিজের দিকে টেনে গর্তের ভেতর জমা করলো ও।

সেদিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো গ্যারেথ। ‘এসো নতুন একটা প্যাকেট খেলা যাক,’ বললো সে, হাসলো, আঙুল বাঁকা করে কাছে ডাকলো একজন ওয়েটারকে। ‘দেখা যাক, তোমার জেতার ভাগ্যটাকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কিনা।’

নতুন প্যাকেটের সীল পরীক্ষা করার জন্যে সবাইকে দেখালো গ্যারেথ, তারপর প্যাকেট খুলে কার্ডগুলো মেললো, বের করে নিলো জোকার দুটো। তাদের পিছনে বাইসাইকেলের চাকার ছবি ছাপা হয়েছে। শাফল করতে শুরু করলো সে, একই সাথে শুরু হ’লো একজন বিশপের অলীল গল্ল-চারিং ক্রস স্টেশনে ভুল করে মহিলাদের রেস্টরুমে ঢুকে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তারপর সেখানে কী ঘটেছিল। কৌতুকটা বর্ণনা করতে এক কি দেড় মিনিট সময় নিলো সে, সাথে সাথে পুরুষালি হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই, এই সুযোগে কার্ড বিলি করতে শুরু করলো গ্যারেথ—যথেষ্ট দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের সামনে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হ’লো কার্ডগুলো, একটার ওপর নিখুঁতভাবে আরেকটা। একা শুধু জেকই লক্ষ্য করলো, রেস্টরুমে মহিলাদের নির্লজ্জ আচরণে বিশপ যখন আতংকিত এবং দিশেহারা, কার্ডগুলো দু’ভাগে ভাগ করে দু’হাতে নিয়ে শাফল করছে গ্যারেথ, শার্টের আন্তিন আগেই খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছে সে—কার্ডগুলো বাঁকা হয়ে একটার ওপর আরেকটা আগের মুহূর্তে ওপর দিকে মুখ তুলছে, চকিতে সেগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো গ্যারেথ।

ব্যারন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন, হাসতে হাসতেই নিজের কার্ডগুলো তুলে নিয়ে চোখ বুলালেন। দম নিয়ে আবার হাসতে শুরু করবেন, মাঝপথে বিষম খেলেন তিনি। তাঁর ডান চোখের নিচে ঘন ঘন লাফাতে শুরু করলো বেয়াড়া শিরাটা, ওটা যেনো তাঁর নাকটাকে আদর করছে। টেবিলের ওদিক থেকে জোরালো হিসহিস শব্দ ভেসে এলো, হাতে ধরা কার্ডগুলো তাড়াতাড়ি এক করে টেবিলে নামিয়ে রাখলো কফি প্রান্টের শিল্পপতি, তারপর দু’হাত দিয়ে ঢেকে ফেললো। জেকের ডান দিকে আমলা ভদ্রলোকের চেহারা হাতির হলুদ দাঁতের মতো চকচক করছে, মাথার চুল থেকে কপাল বেয়ে নেমে আসছে ঘামের একাধিক ধারা, বিস্ফারিত চোখে হাতে ধরা কার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

নিজের কার্ড তুললো জেক, তিনটে কুইন পেয়েছে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার নিজের গল্ল বলা শুরু করলো ও।

‘আমি একবার পুরোনো মোটর ভেসেল হারভেস্ট মেইড-এর এঞ্জিনরুমে ফাস্ট এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমাদের জাহাজ নোঙর ফেলেছিল কাউলুন-এ। আমাদের ক্যাপটেন একদিন এক সৌখিন শ্বেতাস্রকে অভ্যর্থনা জানালেন জাহাজে, ভদ্রলোকের খুব ইচ্ছে দু’চার দান তাস খেলবেন আমাদের সাথে। খেলা শুরু হলো, প্রথম থেকেই লাফিয়ে বাড়তে লাগলো বাজির অংক। মাঝরাতের দিকে সৌখিন শ্বেতাস্র ভদ্রলোক ভয়ংকর একটা দান বাঁটলেন।’

জেকের গল্প কেউ শুনছে ব'লে মনে হ'লো না, প্রত্যেকে যে যার নিজের কার্ড নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত। শুরু করলো জেক

‘স্কিপার পেলেন চারটে রাজা। আমি পেলাম চারটে গোলাম। আর জাহাজের ডাক্তার পেলো চারটে দশ।’ আবার গল্পের মাঝপথে থামলো জেক, হাতের রানী তিনটে নতুন করে সাজালো। এই সময় আমলা ভদ্রলোকের অনুরোধে সাড়া দিয়ে গ্যারেথ তাঁকে আরো দুটো কার্ড সরবরাহ করলো।

‘সৌখিন ভদ্রলোক নিজেও ড্র থেকে একটা কার্ড নিলেন, আর তারপরই খেলাটা বিদ্যুৎ গতি লাভ করলো। যার যা আছে সব বের করে বাজির অংক বাড়াতে লাগলাম সবাই। ধন্যবাদ, বন্ধু, আমিও দুটো কার্ড নেবো।’

জেকের দিকে দুটো কার্ড ছুঁড়ে দিলো গ্যারেথ, সেগুলো তোলার আগে নিজের হাত থেকে কার্ড ফেলে দিলো জেক। ‘যা বলছিলাম, সবার হাতে ভালো তাস থাকায় উন্মাদের মতো সর্বস্ব বাজি ধরছিলাম আমরা। একা শুধু আমার পকেট থেকেই এক হাজার ডলার বেরিয়ে গেছে...।’

নতুন কার্ড তুলে কোনোরকমে হাসি চাপলো জেক। ওর হাতে এখন চার চারটে সুন্দরী নারী। ‘নগদ টাকা শেষ, সবার পকেট খালি, এখন উপায়? লিখিত বন্ড দিতে শুরু করলাম আমরা। ডাক্তার আর আমি আমাদের আগামী কয়েক মাসের বেতনের টাকা বাজি ধরলাম। খেলা চলছে, কেউ হার মানতে রাজি নয়, সবার ধারণা তার কার্ডই সবার চেয়ে ভালো, সে-ই জিতবে।’

ব্যারনকে একটা কার্ড দিলো গ্যারেথ, নিজেও একটা নিলো। এতোক্ষণে ওরা গল্পটা শুনছে, জেকের ঠোঁট আর নিজেদের কার্ড, দুটোর মাঝখানে ছোটোছুটি করছে ওদের দৃষ্টি।

‘যাই হোক, এক সময় কার্ড শো করার অবস্থা হলো। আমাদের সামনে সিলিং ছোঁয়া নগদ টাকা। সৌখিন শ্বেতাস্ত্র ভদ্রলোক স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ দেখিয়ে কুপোকাৎ করলেন আমাদের। পরিষ্কার মনে আছে আমার-তিন থেকে আট পর্যন্ত ছটা চিড়িতন। আঘাতটা সামলে উঠতে আমার আর স্কিপারের সময় লাগে বারো ঘণ্টা, এবং তারপরই আমরা হিসাব করে বের করলাম কোনো রকম কারচুপি না করে বাঁটা হলে এ-ধরনের তাস পড়ার সম্ভাবনা ছয় কোটি বারের মধ্যে একবার। ব্যাপারটা সৌখিন শ্বেতাস্ত্রের বিরুদ্ধে যায়, কাজেই তাঁকে আমরা খুঁজতে বেরুলাম।’

থামলো জেক, সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে যে যার কার্ডের দিকে, তবে খাড়া কান জেকের দিকে তাক করা।

‘ভদ্রলোককে আমরা পেনিনসুলা হোটেলে পেলাম, আমাদের কষ্টার্জিত টাকা মদ আর মেয়েমানুষের পিছনে দু’হাতে ওড়াচ্ছিলেন। ওই সময় আমরা নোঙর তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, আমাদের বয়লার ঠাণ্ডা ছিলো। ভদ্রলোককে ধ’রে এনে বসানো হ’লো ঠিক বয়লারের ওপর, তারপর আগুনদেয়া হ’লো নিচে। তাঁকে অবশ্য বেঁধে নিতে হয়েছিল। খানিকক্ষণ পরই নিতম্বের ভেতর তাঁর ট্রাউজার আর খুলির ভেতর

তার শয়তানী বুদ্ধি আগুনের আঁচ পেতে শুরু করলো। ট্রাইজার পোড়ার গন্ধের সাথে মাংস পোড়ার গন্ধ পেতে শুরু করলাম আমরা...।’

‘মাই গড,’ ব্যারন আঁতকে উঠলেন। ‘কি ভয়ংকর!’

‘হ্যাঁ,’ বিশেষ করে গন্ধটা,’ তাঁর সাথে একমত হ’লো জেক। ‘আমরা অবশ্য নাকে রুমাল দিয়ে নিয়েছিলাম, তা না হলে কার বাপের সাধি এঞ্জিনরুমে থাকতে পারে।’

টেবিল ঘিরে বিস্ফোরণোন্মুক্ত নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সবাই সচেতন, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বুঝলো গুরুতর একটা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ লোক জানে না অভিযোগটা কী বা কার বিরুদ্ধে উত্থাপিত। রক্ষাকবচের মতো যে-যার কার্ড আঁকড়ে ধ’রে আছে সবাই, চোখে নগ্ন সন্দেহ নিয়ে একজন আরেকজনের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। টেবিলের পরিবেশ এতোটাই উত্তেজনাকর হয়ে উঠলো যে, তা গোটা কামরায় ছড়িয়ে পড়তে দেয়ি হ’লো না, আশপাশের টেবিলের লোকজন নিজেদের খেলা ছেড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকলো ওদের পাঁচজনের দিকে।

‘আমার ধারণা,’ দৃঢ়, মার্জিত কণ্ঠে বললো গ্যারেথ সোয়েলস্, কামরায় উপস্থিত প্রত্যেকে শুনতে পেলো তার কথা, ‘মি: জেক বারটন বলতে চাইছেন কেউ একজন খেলায় চুরি করছে।’

মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়লেও কেউ বোধহয় এতোটা চমকে উঠতো না। দার-এর-সালাম ক্লাবে চুরির অভিযোগ। চিন্তাও করা যায় না। অভিজাত পরিবেশে মার্জিত ভদ্রলোকেরা সুরুচির অনুশীলন করেন এখানে, তাঁদের মাঝখানে চোর থাকে কীভাবে। খুনের অভিযোগ মেনে নেয়া যায়, যৌন-অপরাধের অভিযোগও না হয় সহ্য হয়, কিন্তু চুরির অভিযোগ, হায় ঈশ্বর!

‘আমিও মি: জেক বারটনের সাথে একমত হয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, হ্যাঁ,’ গ্যারেথের ঠাণ্ডা নীল চোখ বিস্ময়ে হতভম্ব প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্যের ওপর স্থির হলো, ‘চুরি সত্যি হচ্ছে বটে।’ শিকারী ভদ্রলোকের দিকে ঝুঁকলো সে। ‘এখন দেখার বিষয়, আপনি, স্যার, যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে, আমাদের টাকা যা আপনি অন্যায়াভাবে জিতেছেন, দয়া করে প্রত্যেককে ফেরত দেবেন কিনা।’ শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর চড়লো, গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকের মতো লাগলো শুনতে।

আমেরিকান ভদ্রলোক তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, যেনো জন্ম থেকেই হাবা এবং বোবা তিনি, গ্যারেথের কোনো কথাই তাঁর বোধগম্য হয় নি। তারপর, ধীরে ধীরে, তাঁর চেহারা রঙ পেতে শুরু করলো। প্রথমে বেগুনি, তারপর লালচে, সবশেষে টকটকে রক্তবর্ণ ধারণ করলো তাঁর অবয়ব। ‘স্যার! আপনার এতো স্পর্ধা। গুড গুড, স্যার!’ সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছেন, ঠকঠক করে কাঁপছেন, গলার ভেতর শব্দ আটকে যাচ্ছে।

‘উনি পালানোর মতলবে আছেন।’ চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিলো গ্যারেথ। ‘ধরো, ধরো!’ দু’হাতে ধ’রে টেবিলটা উল্টে দিলো সে, যেনো প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্যের পালানোর পথ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য। টেবিলটা সশব্দে কাত হ’লো

মেঝেতে, ওটার নিচে চাপা পড়লো শিল্পপতি এবং আমলা ভদ্রলোক-চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আইভরি চিপস আর তাস। এখন আর কারো জানার উপায় নেই গ্যারেথ সোয়েলস্ নিজে বেঁটে কী তাস নিয়েছিল। উঠে দাঁড়াবার সংগ্রামে ব্যস্ত ধরাশায়ী খেলোয়াড়দের দিকে ঝুঁকে মার্কিন শিকারীর বাম কানের নিচে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো সে। ‘চিটিং, অ্যা? চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন, আজ আপনার রক্ষা নেই!’

শিকারী ভদ্রলোক আহত বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, তিনিও মুঠো পাকিয়ে ঘুসি ছুঁড়লেন গ্যারেথকে লক্ষ্য করে। গ্যারেথ তো সহজেই একদিকে কাত হয়ে সেটা এড়ালো, কিন্তু বেচারার ক্লাব সেক্রেটারি এড়াতে পারলো না-হৈচৈ শুনে এইমাত্র দু’জনের মাঝখানে ছুটে এসেছে সে। সরাসরি নাকের ওপর খেলো বেচারার।

সংক্রামক মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়লো মারামারি। ক্লাব সেক্রেটারিকে সাহায্য করার জন্যে আর সব টেবিল থেকে লোকজন ছুটে এলো। হঠাৎ সৃষ্ট ভিড়ের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে গ্যারেথের শার্ট খামচে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলো জেক। ‘উনি নন-ভুমি!’ ত্রুন্ধকর্ষে চেষ্টায়ে বললো ও। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শোরগোলের মধ্যে চাপা প’ড়ে গেলো।

কামরায় চল্লিশজন সদস্য উপস্থিত রয়েছে। মাত্র একজনের পড়নে আনুষ্ঠানিক পোশাক নেই-জ্যাকেট পরে রয়েছে জেক। কাউকে কিছু ব’লে দিতে হ’লো না, এক পাল শিকারী কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়লো খরগোসের ওপর।

‘পিঠ বাঁচাও, ওল্ড বয়।’ পরম বন্ধুর মতো জেককে সাবধান করে দিলো গ্যারেথ, জেকের লম্বা করা হাত তার কোটের কিনারা প্রায় ধ’রে ফেলেছে।

বট্ করে ঘুরলো জেক, রক্ত-মাংসের সচল একটা পাঁচিলের সাথে সংঘর্ষ ঘটলো। সদস্যরা রাগে উন্মাদ, তারস্বরে চিৎকার করছে। গ্যারেথের উদ্দেশ্যে শক্ত করা জেকের মুঠো প্রথম সারির দু’জন সদস্যের ওপর বর্ষিত হলো, প্রথমজন ঘুসি খেলো চোয়ালে, দ্বিতীয়জন নাকের ওপর। তারা প’ড়ে গেলো বটে, কিন্তু বাকিরা হুংকার ছেড়ে আরো দ্রুতগতিতে ছুটে এলো ওর দিকে।

‘চালিয়ে যাও!’ বিপুল উৎসাহে আত্মহান জানালো গ্যারেথ। ‘যে থামতে বলবে তার কপালে জুতোর বাড়ি!’ অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সে এখন সশস্ত্র, তার হাতে একটা বিলিয়ার্ড কিউ দেখা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কালো সান্ধ্যপোশাকের তলায় আক্ষরিক অর্থেই চাপা প’ড়ে গেছে জেক। ওর পিঠে সওয়ার হয়েছে তিনজন, দু’জন ঝুলে আছে উরু আঁকড়ে ধরে, দু’জন দুই বগলের নিচে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

‘আমি নই।’ মিছেই চিৎকার করছে জেক। ‘ভুল করছেন-আমি নই, ও!’ গ্যারেথের দিকে হাত তোলার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু হাত দুটোর কোনোটাই মুক্ত করা গেলো না।

‘ঠিক বলেছো, বৎস!’ সায় দেয়ার সুরে বললো গ্যারেথ। ‘নোংরা চোর কুত্তা।’ আশ্চর্য নৈপুণ্যের সাথে বিলিয়ার্ড কিউটা ব্যবহার করছে সে। উল্টো করে ধরেছে সেটা, মোটা প্রান্তটা সজোরে ঠুঁকে অব্যর্থভাবে একের পর এক খুলি ফাটিয়ে চলেছে জেকের

পিঠে সওয়ার সুবেশী ভদ্রলোকদের। এক এক করে জেকের পিঠ থেকে খসে পড়তে লাগলো তারা। আবার একবার গ্যারেথের মুখোমুখি হ'লো জেক।

'শোনো,' গর্জে উঠলো জেক। ধর্মী কয়েকজন লোক ওর পা জড়িয়ে ধরেছে, তা সত্ত্বেও গ্যারেথের দিকে এগোবার চেষ্টা করলো ও।

'আমিও তো তাই বলছি, শোনো!' মাথা একদিকে কাত করে শোনার ভঙ্গি করলো গ্যারেথ, দু'জনেই হঠাৎ উপলব্ধি করলো পুলিশের হইসেল বাজছে। জোড়া দরজার সামনে ইউনিফর্মও দেখতে পেলো গ্যারেথ। 'এটা সত্যিকার বিপদ, একশো ভাগ খাঁটি। সুবোধ বালকের মতো পিছু নাও।' সুকৌশল অসি চালানোর ভঙ্গিতে বিলিয়ার্ড কিউটা বার কয়েক ব্যবহার করে পাশের জানালার সমস্ত কাচ ভেঙে ফেললো সে, তারপর ধীর শান্ত ভঙ্গিতে বাইরের অন্ধকার বাগানে নেমে পড়লো।

দ্রতপায়ে ফুটপাথ ধ'রে হাঁটছে জেক। মেইন রোড ধ'রে ঝর্ণার কিনারায় নিজের ক্যাম্পে ফিরছে ও। পিছনের অন্ধকারে শোরগোল আর হইসেলের আওয়াজ অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। ওর রাগও প'ড়ে গেছে। প্রাক্তন পার্লামেন্ট সদস্যের রক্তবর্ণ চেহারা আর বিস্ফারিত চোখ দুটো কল্পনা করে আপনমনে হাসলো কিছুক্ষণ। একটু পরই সন্দেহ হ'লো ওর, পিছু নিয়েছে কেউ। টুংটাং ঘণ্টা বাজিয়ে একটা রিক্সা আসছে, রিক্সাওয়ালা খালি পা থপ থপ আওয়াজ তুলছে কংক্রিটের রাস্তা়। পিছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারলো জেক, কার পাল্লায় পড়েছে সে।

'সন্দেহ হচ্ছিলো, তোমাকে বুঝি হারিয়েই ফেললাম,' হালকা সুরে বললো গ্যারেথ, হাস্যরসে ভরপুর তার সুদর্শন চেহারা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা চুরুটের আগুনে উদ্ভাসিত হয়ে আছে, আয়েশী ভঙ্গিতে রিক্সার গদিতে হেলান দিয়ে রয়েছে সে। 'তোমার কেটে পড়ার ভঙ্গিটা দারুন মুগ্ধ করেছে আমাকে, মাইরি বলছি। প্রজননের কাল এলে মন্দা কুকুর, কামার্ত কুকুরীকে যে গতিতে ধাওয়া করতো, ঠিক যেনো সেই গতিতে ছুটতে দেখলাম তোমাকে। সত্যি, তোমার আরেকটা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলো।'

কথা না ব'লে নিজের পথে হাঁটতে থাকলো জেক।

'এ-ও কি সম্ভব যে তুমি শুয়ে পড়ার কথা ভাবছো?' গ্যারেথের রিক্সা জেকের পাশেই থাকছে। 'রাত তো এখনো শিশু হে, তাছাড়া কে বলতে পারে মজার মজার আরো কতো কি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তাই না?' ভুরুর কৌতুককর নাচ কল্পনায় দেখা গেলো।

হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করলো জেক, নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে হাঁটছে।

'মাদাম সিসিলির ওখানে?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

জেক নিরুত্তর।

‘আমি তো ভেবে পাই না, বয়স থাকতে কেনো মানুষ মৌজ-ফুর্তি করবে না—বিশেষ করে পরের খরচায়।’

‘গাড়িগুলো তোমার খুব দরকার, না?’

‘ব্যথা পেলাম,’ ঘোষণা করলো গ্যারেথ। ‘আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাবের সাথে কোনো জাগতিক স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে?’

‘কে পয়সা দিচ্ছে?’ বললো জেক।

‘তুমি আমার অতিথি হে।’

‘ঠিক আছে— তোমার পানীয় পান করেছি, খাবারও খেয়েছি; এটা আর বাকি থাকবে কেনো।’

দু’জন হাস্যমুখর আরোহীকে নিয়ে শহরের দিকে ফিরে চললো রিক্সাওয়ালা, জেকের দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটা চুরুট ঠেসে দিলো গ্যারেথ। জবাব দিলো না।

‘নিজের পাতে ঝোল তো ভালোই ঢেলেছিলে,’ জিজ্ঞেস করলো জেক, ‘কিন্তু কী ঝোল?’ ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে গলগল করে ধোয়া ছাড়ছে ও। ‘চারটে টেকা? নাকি স্ট্রেইট ফ্ল্যাশ?’

‘আমার চরিত্রে কলংক লেপনের অপচেষ্টা হ’তে দেখে আমি স্তম্ভিত এবং মর্মাহত, স্যার। প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যাবো।’

ঝাঁকি খেতে খেতে আরো খানিক সামনে এগুলো রিক্সা, এরপর গ্যারেথের প্রশ্নে নিস্তব্ধতা ভাঙলো। ‘সৌখিন শ্বেতাস্থের পাছাটা সত্যি তোমরা পোড়াও নি, তাই না?’

‘না,’ স্বীকার করলো জেক। ‘তবে এই উপাদানটুকু থাকায় গল্পটা দারুণ উতরে গেছে।’

মাদাম সিসিলির গেটে পৌঁছুলো ওরা, গেটের ভেতর অন্ধকার বাগান, বাগানের শেষ মাথায় কাঠের একটা দরজার পাশে অল্প শক্তির একটা বালব জ্বলছে। বাগান পেরিয়ে এলো ওরা। নক করলো দরজায়।

‘নাহ্, এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, আরো দেরি করে অপরাধের মাত্রা বাড়াতে চাই না, বললো গ্যারেথ, তার কাঁচুমাচু ভঙ্গি দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো জেক। ‘তোমার কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সত্যি, প্রথম থেকেই তোমাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম।’

‘আসল কথা, সময়টা আমরা উপভোগ করেছি।’

‘না, মানে, ভাবছি, তোমার কাছে আমার সৎ থাকতে হবে।’

‘এভাবে বেমক্কা ধাক্কা দিয়ো না তো, আছাড় খেয়ে মারা গেলে চিরকালের জন্যে হারাবে আমাকে। তারচেয়ে যেমন আছো তেমনি থাকো, শুধু খেয়াল রেখো ভুল করেও আমার লেজে পা দিয়ে ফেলো না।’ দু’জনেই ওরা নিঃশব্দে হাসতে লাগলো, জেকের কাঁধে হালকা ঘুসি মারলো গ্যারেথ।

বললো, ‘আগের কথাই ঠিক থাকলো, কেমন? সব খরচা আমার।’

মাদাম সিসিলি এতো বেশি লম্বা আর রোগা যে কোমর, পেট, নিতম্ব বা বুক ব’লে কিছু আছে কিনা সন্দেহ হ’তে লাগলো। এমন একটা ড্রেস পরে আছে যেটা হাড়িসার

দেহকাঠামো ঢাকার চেয়ে বেশিরভাগ উন্মুক্ত করে রেখেছে, তবে পায়ের পিছনে তিন ফুট মেঝে ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয় নি। গলার পিছনে ঘাড়ের ওপর মস্ত একটা খোঁপা, নিঃসন্দেহে পরচুলার অবদান। গ্যারেথের সাথে জেককে দেখে মহিলা বিশেষ খুশি হয়েছে ব'লে মনে হ'লো না, তবে ভদ্রতা বজায় রেখে মৃদু হাসলো সে। সোফায় বসতে বললো। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে কার্পেটের ওপর, জেকের পায়ের কাছে বসলো গ্যারেথ।

‘মেজর সোয়েলস্, আপনার দর্শন লাভ করা একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। এতো দিন কোথায় ছিলেন? ভাবছিলাম শহর ছেড়ে আবার কোথাও চলে গেলেন কিনা।’

‘আরে না। আপনার ব্যক্তিগত লাউঞ্জে বোসে কিছু সময়ের জন্যে আলাপ করে নিতে চাই আমরা দু’জন। তারপর না হয় মেয়েগুলোকে দেখে নেয়া যাবে।’

পথ দেখিয়ে ওদেরকে প্রাইভেট লাউঞ্জে নিয়ে এলো মাদাম সিসিলি। গ্যারেথ তাকে এক রকম ঠেলেই বের করে দিলো প্রাইভেট লাউঞ্জ থেকে, তার পিঠের ওপর বন্ধ করে দিলো দরজা।

ধপাস করে একটা সোফায় ব'সে হেলান দিলো সে, দু’সারি দাঁতের মাঝখানে সদ্য ধরানো লম্বা চুরুট, এক হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস। ‘এল ডুসে এবারে কাজে নামতে যাচ্ছে। জানি না, এ থেকে কী আশা করে সে। ধারণার অতীত দুর্গম মরু আর পর্বত এলাকা ওটা। যা-ই হোক— মুসোলিনির চাই সেটা। সম্ভবত নেপোলিয়নের মতোই সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্নে বিভোর সে।’

‘এতো কিছু তুমি জানো কীভাবে?’ হাতে গ্লাস থাকলেও শ্যাম্পেন খেতে ভালো পাগছে না জেকের।

‘ওটাই আমার কাজ, ওল্ড চ্যাপ। লড়াই শুরু হবার আগেই গন্ধ পাই আমি। শীঘ্রই ঘটেবে এমন কিছু। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অন্তরালে পুরোপুরি সামরিক প্রস্তুতি চলছে এল ডুসে-তে। অন্যান্য বড়ো শক্তি— যেমন ফ্রান্স, তোমার দেশ আর আমার ব্রিটেন—সায় জানিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, লোক দেখানো প্রতিবাদ করবে তারা সবাই— কিন্তু ওই জাত শয়তানটা ইথিওপিয়া হাতিয়ে নেবার সময় কেউ কিচ্ছুটি কোরবে না। সম্রাটদের সম্রাট, হাইলে সেলাসি এটা জানেন; জানেন তার প্রতিটি প্রিন্স, রাস, গোত্র সর্দার এবং সাধারণ জনতা। সবাই চেষ্টা কোরছে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার। আর সেখানেই এসে পড়ে আমার ব্যবসা।’

‘তোমার থেকেই কেনো অস্ত্র কিনতে হবে তাদের? তাও আবার তোমার হাঁকানো দামেই? সরাসরি অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের থেকেই তো পেতে পারে ওরা।’

‘আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, ওল্ড চ্যাপ। সমগ্র ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে লীগ অব নেশনস্। কোনো রকম যুদ্ধাস্ত্র প্রবেশ নিষিদ্ধ সেখানে। কাজটা করা হয়েছে উত্তেজনা নিরসনের অভিপ্রায়ে, কিন্তু এতে করে একেবারেই একপেশে হ'তে যাচ্ছে খেলাটা। মুসোলিনিকে কোনো ধরনের অস্ত্র কিনতে দেবে না; তার সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র, এয়ারক্রাফট, আর্মার— সবকিছু ইতিমধ্যেই ইরিত্রিয়ায় পৌঁছে গেছে। কেবল শুরু হবার অপেক্ষা— ওদিকে আদিবাসী ইথিওপিয়দের হাতে ওল্ড পুরোনো রাইফেল আর প্রাচীন তরবারি। শ্যাম্পেন খাচ্ছ তো?’

‘দাঁড়াও; এরচেয়ে বরঞ্চ টুস্কার-এর একটা বোতল নিয়ে আসি।’ ব’লে, দরোজার উদ্দেশ্যে এগোলো জেক।

দুগ্ধের সাথে মাথা নাড়লো গ্যারেথ। ‘তুমি এখনো বাচ্চাই রয়ে গেলে হে! টুস্কার- ছো!’

বিয়ার নয়, মূলত গ্যারেথের কাছ থেকে দূরে সরে এসে একটু চিন্তাভাবনা করে দেখতে চাইছে জেক। জনাকীর্ণ অভ্যর্থনা কক্ষের কাউন্টারে হেলান দিয়ে গ্যারেথ সোয়েলসের বলা কথাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছে সে। যা শুনলো, তা কতোটুকু সত্যি, কতোটুকু কল্পনা; এতে তার লাভ-ই বা কী-এ সমস্ত ভেবে আকুল হ’লো জেক।

শেষমেষ যখন এই ব্যবসায় নিজেকে না জড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, নিজের আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ’লো জেক। সুগার মিল কোম্পানির কাছে বেঁচে দেবে ও আর্মারড কারগুলো। নিয়তিরই পরিহাস, এ সময় ওর কানে এলো কিছু টুকরো টুকরো কথা।

ওর পাশেই কেরানি গোছের পোশাক পরিহিত দুইজন আলাপ করছে, দুইজনের বাহুপাশেই দুই লাস্যময়ী রমনী; অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আদর করতে করতে কথা বলছে তারা।

‘জানো না কী, অ্যাংলো সুগার কোম্পানি তো লাটে উঠেছে?’ একজন বলছিলো অপর জনকে।

‘তাই নাকি! অবিশ্বাস্য! ব্যাপার!’

‘সত্যি। শুনলাম, অর্ধেক মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়ে গেছে ওটা।’

‘গুড গড! এই নিয়ে এই মাসে তিনটি বড়ো বড়ো কোম্পানি বিক্রি হয়ে গেলো।’

‘সময়টা আসলে কঠিন। কত শতো লোক যে না খেয়ে মরবে এই বাজারে।’

নীরবে সায় দেয় জেক। কাউন্টারে একটা কয়েন ছুঁড়ে দিয়ে নিজের বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে মাদাম সিসিলি’র ব্যক্তিগত লাউঞ্জের দিকে ফিরে চললো।

সত্যিই, কঠিন সময় যাচ্ছে। এই নিয়ে ক’ মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো খারাপ সময়ের মুখোমুখি হ’লো জেক।

যে ফ্রেইটারে করে চিফ এঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব নিয়ে দার-এস-সালাম এসেছিলো ও, সেই কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় শেরিফ আটক করেছেন জাহাজটা। মালিকপক্ষ পালিয়ে লন্ডন চ’লে গেছে।

ছয়মাসের বেতন বকেয়া অবস্থায় কাঁধে একমাত্র সম্বল ব্যাগটা ফেলে গ্যাস্কপ্ল্যাক্স ধ’রে হেঁটে ফিরেছে জেক। অল্প কিছু টাকা ছিলো ওর কাছে।

মাত্রই সুগার কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিতে আসতে চাইছিলো, আবার মন্দা সময়ের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো ওটাকেও। এখন পাঁচটি আর্মারড কারের মালিক জেক বারটনের একমাত্র ক্রেতা গ্যারেথ।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গাঢ় অন্ধকারে বন্দরে ভেড়ানো জাহাজগুলোর আলোর দিকে তাকিয়ে ছিলো গ্যারেথ সোয়েলস, জেক প্রবেশ করতেই ওর দিকে ফিরে চাইলো।

‘আমরা যখন পরস্পরের প্রতি এমন ভীতিকরভাবে সৎ, তোমাকে লাভের পরিমাণ জানাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। ইথিওপিয়রা আমাদেরকে একেকটা গাড়ির জন্যে হাজার পাউন্ড দেবে। অবশ্য ওগুলোর পিছনে আরো কিছু খরচ আছে আমাদের। রঙ লাগাতে হবে, টারিটে থাকবে একটা করে মেশিনগান।’

‘এখনো আমি শুনছি,’ সোফায় হেলান দিলো জেক।

‘ক্রেতা আমি ঠিক করছি, ভিকার্স মেশিনগান আমি যোগান দিচ্ছি, যেগুলো ছাড়া গাড়িগুলোর কোনো মূল্যই নেই। তোমার রয়েছে গাড়িগুলো এবং ওগুলোকে চালানোর জন্যে কারিগরি দক্ষতা।’

গ্যারেথ সোয়েলসের মধ্যে আরেকজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছে জেক। অলস ভঙ্গি, সকৌতুক হাসি, বোকা বোকা ভাব তার চেহারা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। তার ভাষা এখন কাটা কাটা, শব্দগুলো নির্বাচিত, স্নান নীল চোখে দস্যুসুলভ আলো ঝিক ঝিক করে উঠছে। আবার মুখ খুললো সে, ‘এর আগে কখনো কারো সাথে পার্টনারশিপে ব্যবসা করি নি আমি। সব সময় জানতাম, আমি একাই ভালো করবো। তবে এক্ষেত্রে তোমার ভেতরটা উঁকি দিয়ে দেখার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাইছি না। কেনো যেনো মনে হচ্ছে আরো অনেক গভীরে তোমার সাথে আমার মধুর এবং সুস্থ কিছু মিল আছে। সত্যি আছে কিনা জানার একটা কৌতূহল। জীবনে এই হয়তো প্রথম এবং শেষবার। তুমি কী বলো?’

‘গ্যারেথ সোয়েলস্, মনে রেখো, বেঈমানী করলে আমি তোমাকে আগুনে পেড়াবো।’

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উল্লাসে হেসে উঠলো গ্যারেথ। ‘তুমি যে তা পারো আমি বিশ্বাস করি, জেক।’ সোফা থেকে নেমে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলো সে। ‘সমান সমান পার্টনার। তুমি গাড়ি দিচ্ছে, আমি দিচ্ছি মেশিনগান-লভ্যাংশ ভাগ হবে আধাআধি, কি?’ উত্তরে তার হাতটা ধ’রে ঝাঁকালো জেক।

‘ঠিক, আছে,’ বললো ও।

‘আজকের মতো যথেষ্ট ব্যবসা হয়েছে,’ বললো গ্যারেথ। ‘এসো, এবারে মেয়েদের ওপর চোখ বুলানো যাক।’

বডিতে এঞ্জিন আর রঙ লাগানোর কাজে যথেষ্ট খাটাখাটনি আছে, জেক নিজের ধারণা প্রকাশ করলো, সমান অংশীদার হিসেবে কাজটায় নিশ্চয়ই ওকে সাহায্য করবে গ্যারেথ।

গ্যারেথের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, তাড়াতাড়ি একটা চুরুট ধরালো সে। ‘শোন, ওল্ড চ্যাপ। সমান অংশীদারিত্বের ব্যাপারটা টেনে খুব বেশি লম্বা করো না। গায়ে গতরে খাটা আমার পোষাবে না, তাছাড়া এ-ধরনের পরিশ্রম আমার সম্মানের খান্না হানিকর।’

‘তাহলে আমাকে লোকজন ভাড়া করতে হবে।’

‘গায়ে তেল-কালি মেখে সং সেজে থাকো সেটা আমারও পছন্দ নয়। যাকে খুশি যতো খুশি লোক জোগাড় করো।’ উদার ভঙ্গিতে চরুটটা নাড়লো সে। ‘আমাকে বন্দরে একবার যেতে হচ্ছে, ডকের কিছু অফিসারের মুখ চুম্বন করে আসি, অদূর ভবিষ্যতে কাজে আসবে। আজ সন্ধ্যায় ব্রিটিশ দূতাবাসে ডিনারেও উপস্থিত থাকতে হবে। ভেবো না নিজের কাজে যাচ্ছি। ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে খাতির হয়ে গেলে দু’জনের স্বার্থেই কাজে লাগবে।’

রিস্তার চেপে, পাশে বিয়ারের ভর্তি সিলভারের বালতি সহ, পরদিন সকালে মেহগনি গাছের নিচে জেকের ক্যাম্প হাজির হ’লো গ্যারেথ, দেখলো ছয়জন লোক নিয়ে গাড়ি রঙ করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে জেক। রঙটা জেক বেছে নিয়েছে গ্রে, কয়েকটা গাড়িতে প্রথম পোচ লাগানো হয়েছে মাত্র। পরিবর্তনটা অবিশ্বাস্য, বিধ্বস্ত এবং পরিত্যক্ত আর্মারড্ কারগুলো অজেয় ওঅর মেশিনে রূপান্তরিত হয়েছে, আনকোরা নতুন এবং বিপজ্জনক।

‘মাইরি বলছি,’ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো গ্যারেথ, ‘ইথিওপিয়ানরা পাগল হয়ে যাবে।’ গাড়িগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে এলো সে। ‘মাত্র তিনটে রঙ করা হয়েছে। এ-দুটো বাদ পড়লো কেনো?’

‘তোমাকে আগেই বলেছি। শুধু তিনটে চালানো যাবে।’

‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ। স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ইতস্তত করো না তো। সব ক’টার রঙ চড়াও-কীভাবে গছাতে হয় সে আমি দেখবো। আমরা কোনো গ্যারান্টি দিয়ে মাল সাপ্লাই দিচ্ছি না। কি, ঠিক আছে?’

‘না, নেই...,’ গুরু করলো জেক, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলো গ্যারেথ।

‘ভয় পাচ্ছো পরে ওরা আমাদের ধরবে, কি?’ উজ্জ্বল হাসির সাথে একটা চোখ টিপলো গ্যারেথ। ‘অভিযোগ যখন উঠবে, ততোদিনে আমরা অন্য কোথাও সরে গেছি-ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখেই।’

প্রস্তাবটা যে জেকের নীতিবোধ, বিবেক ইত্যাদির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে সেটা উপলব্ধি করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো গ্যারেথের। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো, জেকের কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ।

আধঘণ্টা পরও দেখা গেলো ওদের তর্ক থামে নি।

‘এ স্রেফ আমার দ্বারা সম্ভব নয়,’ চোঁচিয়ে উঠলো জেক, বাতিল বাহনগুলোয় একটা ডাকায় লাথি মারলো ও। ‘এভাবে মানুষকে ঠকাবার কথা তুমি ভাবতে পারো কীভাবে। অচল জিনিস সচল ব’লে চালিয়ে দেয়া...।’

দ্রুত শেখার ব্যাপারে গ্যারেথের জুড়ি নেই, জেকের মেজাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলার চমৎকার একটা কৌশল বেছে নিলো সে। বুঝতে পারছে, এভাবে চলতে থাকলে দু’জনের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি বেঁধে যাবে। হঠাৎ করে কৌশলটা কাজে লাগালো সে। ‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ,’ নরম সুরে বললো, ‘নিজেদের মধ্যে চোঁচামেচি করার কোনো মানে হয় না....।’

‘আমি চোঁচাচ্ছি না!’ গর্জে উঠলো জেক।

‘না, অবশ্যই না,’ প্রায় আদর করার সুরে জেককে শান্ত করার চেষ্টা করলো গ্যারেথ। ‘তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারছি। তুমি ঠিক কথাই বলছো। তোমার মতো আমিও কাউকে ঠকাতে চাই না।’

সামান্যই শান্ত হ’লো জেক, প্রতিবাদে ফেটে পড়ার জন্যে আবার মুখ খুললো, কিন্তু ঠোট গ’লে শব্দ বেরুবার আগে মুখের ফাঁকটার ভেতর লম্বা কালো একটা চুরুট ভরে দিলো গ্যারেথ। ‘এসো, এবার ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধি খাটাই আমরা, কেমন? প্রথমে আমাকে বলো, কেনো চলবে না, বা কী করলে ওগুলোকে সচল করা যায়।’

পনেরো মিনিট পর। তাঁবুর বাইরে সান-ফ্র্যাণ্সিসকোয় ব’সে বরফ দেয়া টুস্কার বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ওরা, গ্যারেথের নিপুণ দক্ষতার মধুর বন্ধুত্বসূচক পরিবেশ ফিরে এসেছে আবার।

‘একটা স্মিথ-বেন্টিলি কারবুরেটর,’ চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করলো গ্যারেথ।

‘সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করে দেখেছি আমি, কোথাও নেই। লোকাল এজেন্ট নাইরোবি আর কেপটাউনেও খোঁজ নিয়ে দেখেছে। এক হ’তে পারে, অর্ডার দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আনানো-তাও যদি পুরনো লোহা-লব্ধের দোকান থেকে কোনো সাপ্লাইয়ার জোগাড় করতে পারে। এতো পুরনো জিনিস কে রাখতে গেছে।’

‘উহঁ, ইংল্যান্ড থেকে আনাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। শোনো, ওল্ড বয়। কী করতে হবে, আমি জানি। কাজটা করার জন্যে মৃত্যুর চেয়েও বড় ঝুঁকি নিতে হবে, তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু আমাদের যৌথ ব্যবসার স্বার্থে কাজটা আমি করবো।’

তাঞ্জানিয়ায় ব্রিটিশ অ্যামবাসাডার ভদ্রলোকের এক মেয়ে আছে, বাবার বিশাল সয়-সম্পত্তি এবং সম্মানজনক খেতাব থাকা সত্ত্বেও বত্রিশ বছর পেরিয়ে যেতে চললো, অথচ আজও তার বিয়ের ফুল ফোটে নি।

আড়াচোখে তার দিকে তাকিয়ে এক পলকে কারণটা উপলব্ধি করতে পারলো গ্যারেথ সোয়েলস্। প্রথম যে বিশেষণটা তার মনে পড়লো সেটা হ’লো ‘ঘোড়াযুগী’, কিন্তু না, ঠিক মিললো না ব’লে মনে হ’লো গ্যারেথের। ‘উটযুগী’-হ্যাঁ, উটযুগী বললে চেহারার কাছাকাছি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। দেহ-মন অবশ্য করা একটা উট, ভাবলো সে। চামড়া মোড়া নরম সিটে কাত হয়ে ব’সে মেয়েটা তার দিকে প্রেম-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, জবাবে দু’খান বিস্তৃত হাসি হাসছে গ্যারেথ, ফলে আপনা থেকেই চোখ বুজে আসায় না তাকানোর অজুহাত তৈরি করতে হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে পরীক্ষণ হাসতে থাকায় এরই মধ্যে মুখ ব্যথা করছে তার, তাছাড়া চোখ বুজে পরীক্ষণ একজন মানুষ গাড়ি চালাতে পারে? রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে বললো, ‘মেয়ে হিসেবে তোমার কোনো তুলনা হয় না। বেড়ানোর জন্যে তোমার বাবার এতো শেখের গাড়িটা আমার হাতে তুলে দিয়েছে, কী ব’লে যে ধন্যবাদ দেবো।’

রোমান্স বা রোমাঞ্চ যাই হোক, তার প্রতিক্রিয়া, এ রকম আগে কখনো হ'তে দেখে নি গ্যারেথ। মেয়েটা কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগলো, হলুদ কোদালগুলো বের করে, যেনো কেউ তাকে অবিরাম কাতুকুতু দিচ্ছে।

‘তুমি জানো, তোমার বাবাকে আমি হিংসা করি? কোথাও যদি পাই, এ-ধরনের পুরনো একটা গাড়ি অবশ্যই আমি কিনবো, দেশে ফিরে।’ মেইন রোড ছেড়ে ধুলো ঢাকা পথ ধরলো গ্যারেথ, পামগাছের মাঝখান দিয়ে সাগরের কিনারা ঘেঁষে বহুদূর চলে গেছে। বাঁক নেয়ার সময় একজন পুলিশ এমবাসীর লাম্বার প্লেট চিনতে পারলো, ঝট করে সিধে হয়ে স্যালুট করলো সে। মার্জিত ভঙ্গিতে আলগোছে হ্যাটের কিনারা ছুলো গ্যারেথ, একটা ঢোক গিলে লক্ষ্য করলো, দূতাবাসে গাড়িতে ওঠার পর থেকে মুহূর্তর জন্যেও তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি চিরকুমারী মেয়েটা।

‘সামনে চমৎকার একটা স্পট আছে—নির্জন। কিছুক্ষণের জন্যে ওখানে আমরা থামতে পারি।’

এতো জোরে ঘাড় ঝাঁকালো মেয়েটা, গ্যারেথের সন্দেহ হ'লো ওটা না মাথাসহ ছিঁড়ে পড়ে। কোনো কথাই বলছে না ওর সঙ্গিনী, সম্ভবত বিপুল উল্লাস আর অবিশ্বাস নিজের ওপর আত্মস্থান কর তুলেছে তাকে, ভয় পাচ্ছে কথা বলতে চেষ্টা করলে চিঁচি আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বেরাবে না। সেজন্যে গ্যারেথ অবশ্য কৃতজ্ঞ, এবং তার কৃতজ্ঞতা মিটিমিটি হাসি হয়ে ফুটে বেরলো। সাড়া পাচ্ছে মনে করে বেগুনি হয়ে গেলো সঙ্গিনীর চেহারা, ঠোঁটের ফাঁকে আবার বেরিয়ে পড়লো হলুদ কোদালগুলো।

ওর চোখ দুটো সুন্দর, নিজেকে সান্ত্বনা এবং অভয় দেয়ার চেষ্টা করলো গ্যারেথ—অবশ্য তোমার যদি উটের চোখ পছন্দ হয়। একজোড়া বিষণ্ণ সাগর, বড় বড় পাতা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো গ্যারেথ, শুধু চোখ দুটোর দিকে তাকাবে সে, এড়িয়ে যাবে দাঁতগুলোকে। আকস্মিক উদ্বেগের একটা আঁচ অনুভব করলো সে। নাজুক, সংকটময় মুহূর্তে মেয়েটা কামড়ায় না তো? ওই ধারালো কোদাল গুরুতর জখম করতে পারে। মুহূর্তের জন্যে পরিকল্পনাটা বাতিল করে দেয়ার কথা ভাবলো সে। তারপর কল্পনার সাহায্যে নিজেকে দেখালো থরে থরে সাজানো রয়েছে ইথিওপিয়ান ডলার, সাথে সাথে সাহস ফিরে পেলো সে।

ব্রেক করলো গ্যারেথ, বাঁকটা কোথায় খুঁজলো। ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা, পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। গাড়ি নিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো।

অবশেষে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে থামলো বেটলি। চারপাশে উঁচু ঝোপ, মাথার ওপর পাম গাছের ডাল, খুব কাছে থেকে সাগরের ভোঁতা গর্জন ভেসে আসছে, আশপাশে লোকবসতি বা লোকজনের আনাগোনা নেই।

‘দেখো কাণ্ড, সত্যি পৌঁছে গেছি আমরা, কি?’ সঙ্গিনীর দিকে ফিরলো গ্যারেথ, মুখ চোখ বোঁজা হাসি। ‘ঘাড়টা যদি একটু বাঁকাও, বোধহয় সাগরও দেখতে পাবে।’

সামনের দিকে ঝুঁকে সাগরের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে সে, অ্যামবাস্যাডরের মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। গ্যারেথের সর্বশেষ সচেতন চিন্তা ছিলো, অবশ্যই তাকে দাঁতের কামড় এড়াতে হবে।

নতুন রঙ করা ঝকঝকে বিশাল বেন্টলি যতক্ষণ না ঝাঁকি খেতে শুরু করলো, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো জেক, ওটাকে চেউয়ের ওপর লাইফবোটের মতো দুলতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ও, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ। মাথা নিচু করে বনেটের কাছে চলে এলো, এঞ্জিন কাউলিং খোলার সময় শব্দ হলেও গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ফাঁস-ফাঁস আর নাকিসুরে ফোঁপানির আওয়াজে চাপা পড়ে গেলো সব। ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, দুর্ঘটনাবশত উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ভেতরে একবার চোখ পড়লো, সাথে সাথে আতংকে কঁকড়ে গেলো ও, দৃশ্যটা জীবনে কখনো ভুলবে না-মেয়েটার সরু সাদা পা, লম্বা আর হাড়িসার, গাঁটগুলো উটের পায়ের মতো শক্ত আর বেচপ, ক্যাবের সিলিংয়ে অবিরত লাথি মারছে। তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে একটা ঢোক গিললো ও। এই প্রথম দুঃখ হ'লো গ্যারেথের জন্যে।

কাজটা দ্রুত শেষ করলো জেক, কারবুরেটর হাতে চলে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। গাড়ির ভেতর ধস্তাধস্তির আওয়াজ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। আর্মারড্ কারগুলো রঙ করার কাজে গ্যারেথ ওকে সাহায্য করে নি ব'লে রাগ হয়েছিল জেকের, হঠাৎ করে সেই রাগটা পানি হয়ে গেলো। এই মুহূর্তে গ্যারেথ সোয়েলস্ যে গাধার খাটনি খাটছে, তার তুলনায় গাড়ির পেছনে যেকোনো অমানুষিক পরিশ্রম তাৎপর্যহীন ব'লে মনে হবে।

গোটা কারবুরেটর অ্যাসেম্বলি ক্যানভাস ব্যাগে ভরে নিয়ে পিছু হটেতে শুরু করলো জেক। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেলো বেন্টলি, তীক্ষ্ণ একটা শেষ চিৎকারের পর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এলো। ঝোপের আড়ালে পৌঁছে সিধে হ'লো জেক। পার্টনারকে সাদা সাদা নগ্ন হাত-পা আর গোলাপি ফ্রেঞ্চ অন্তর্বাসের জটলার মধ্যে রেখে পালিয়ে এলো ও।

‘আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, এই শরীরে হেঁটে বাড়ি ফিরতে জান বেরিয়ে গেছে আমার। সেই সাথে মহিলাকে বিশ্বাস করাতে হয়েছে, গাড়ির ভেতর ঘটনাটা বাগদানের কোনো অংশ ছিলো না।’

‘অকুতোভয় বীরত্ব দেখানোর জন্যে অবশ্যই তোমাকে পদক দেয়া হবে,’ প্রতিশ্রুতি দিলো জেক, আর্মারড্ কারের হাউজিং থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এলো ও। ‘ন্যাক্তগত নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে আদর্শের ধ্বজাধারী মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্ এতাই দুর্গম দুর্গের দিকে ধাবিত হন, শত্রুহননে চরম নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বধ করেন...।’

‘প্রচণ্ড কৌতুককর,’ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো গ্যারেথ। ‘কিন্তু মনে রেখো, গোষ্ঠজনকে না ঠকানোর ব্যাপারে তোমার যেমন একটা সুখ্যাতি আছে, তেমনি আমারও একটা সুনাম আছে। এই ঘটনা যদি ফাঁস হয়ে যায়, নির্দিষ্ট একটা মহলে আমার মাথা কাটা যাবে। কথা দিতে হবে, ওস্তা চ্যাপ। স্পিকটি নট, কি?’

‘কথা দিলাম,’ আন্তরিকতার সাথে বললো জেক ক্রাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরাবার জন্যে ঝুঁকলো। প্রথমবার ঘোরাতেই স্টার্ট নিলো এঞ্জিন, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর নিঃশব্দে হাসলো জেক। ‘শুনতে পাচ্ছে, গ্যারেথ? এঞ্জিনের এই মিষ্টি গান তোমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়?’

নরকতুল্য দৃশ্যটার কথা স্মরণ করে জ্ঞান হারিয়ে চলে পড়ার ভঙ্গি করলো গ্যারেথ, হেসে উঠলো জেক।

‘চার চারটি লৌহমানবী। জীবনের কাছ থেকে আর কী আশা করো তুমি?’

‘পাঁচটা,’ সাথে সাথে বললো গ্যারেথ, ভুরু কুঁচকে তাকালো জেক। ‘পাঁচ নম্বরটা আমার নামে বিক্রি হবে,’ মিনতির সুরে আবার বললো সে। ‘তোমার সুখ্যাতি রক্ষার জন্যে আমার নিজের প্যাডে লিখবো, ওটা আমি বিক্রি করেছি, কি?’

কথা না বললেও জেকের গম্ভীর চেহারা জবাবের জন্যে যথেষ্ট। ‘না?’ দীর্ঘশ্বাস ফেললো গ্যারেথ। ‘এই আমি ব’লে রাখলাম, তোমার মাক্কাতা আমলের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দু’জনকেই প্রতিমুহূর্তে বিপদে ফেলবে।

‘আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি।’

‘স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, ওল্ড চ্যাপ।’ ঘন ঘন মাথা নাড়লো গ্যারেথ। ‘একটা কথা বোধহয় ঠিক, অচল মাল দিলে ইথিওপিয়ানরা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। ওরা আবার তলোয়ার ব্যবহার করে, আর ওটা দিয়ে ওরা শুধু মাথাই কাটে না—অন্তত তাই শুনেছি। থাক, পাঁচ নম্বরটা গছাবার দরকার নেই।’

মাসের বাইশ তারিখে ‘ডানোত্তার ক্যাসেল’ নোঙর ফেললো দার-এস-সালাম বন্দরে, সাথে সাথে এক ঝাঁক বার্জ আর লাইটার জেকে ধরলো জাহাজটাকে। সাউথাম্পটন থেকে রওনা হয়ে কেপ টাউন, ডারবান ঘুরে দার-এস-সালাম এসেছে ইউনিয়ন ক্যাসেল লাইনের এই ফ্ল্যাগশিপ, জিবুতি পর্যন্ত যাবে।

প্রথমশ্রেণীর দুটো সুইট আর পাঁচটা ডাবল কেবিন প্রিন্স লিজ মিখায়েল ওয়াসান সাগুদ-এর দখলে রয়েছে, কয়েকজন সঙ্গী-সহকারীকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ সফর শেষ করে ফিরছে সে। প্রিন্স লিজ মিখায়েল ইথিওপিয়ার রাজপরিবারের একজন, সেই রাজা সলোমন আর রানী সেবা’র সময়কাল পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষদের কথা শোনা যায়। সম্রাটের একান্ত কাছের লোকদের মধ্যে তিনি একজন; এবং বাপের সূত্রে ইথিওপিয়ার উত্তর প্রদেশের পাহাড় এবং মরু অধ্যুষিত বিশাল এক এলাকার প্রশাসক, আকৃতিতে যা স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের সমান। ফ্যাসিবাদী ইতালির একনায়কের আক্রমণের হুমকির মুখে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য আদায়ে ব্যর্থ হয়ে চাঁদা সংগ্রহের জন্যে পশ্চিমা দুনিয়ায়, থ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কাছে ধরণা দিতে গিয়েছিলো প্রিন্স, জেনেভায় লীগ অব নেশনসেও তদবির চালিয়েছেন; দীর্ঘ তিন মাসের সফর আংশিক সফল হওয়ায় দেশে ফেরার পথে দার-এস-সালামে যাত্রা বিরতি। জেটি থেকে একটা

হুড খোলা কারে চড়লো প্রিন্স, অপরটায় উঠলো তার সঙ্গী-সাথীরা। ওগুলো কে পাঠিয়েছে এই মুহূর্তে ঠিক জানা নেই প্রিন্সের, ড্রাইভারদের কাছ থেকে শুধু জানা গেলো ডকে অপেক্ষা করছেন স্যার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

স্যার অর্থাৎ মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্ তার নবীন বন্ধু জেক বারটনকে নিয়ে চার নম্বর ওয়্যারহাউসে অপেক্ষা করছে, ড্রাইভারদের আগেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছে সে।

‘মনে আছে তো, ওল্ড চ্যাপ? কথা বলার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে তুমি, কি?’ বিশাল ওয়্যারহাউসের ভেতর আলো খুব কম, অগ্রহ এবং উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছে ওরা। ‘মারমুখো গান্ধীর্ষ থাকবে তোমার চেহারা। জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে দেখানোর দায়িত্ব তুমি নিতে চাইছো, বেশ নাও, কিন্তু দেখো, আবার ডুবিয়ো না।’

ম্লান নীল ট্রপিক্যাল স্যুট পরেছে গ্যারেথ, বোতামের গর্তে ঝুলছে তাজা একটা গোলাপ। তার টাইটা আড়াআড়িভাবে ডোরা কাটা। লালচে সোনালি চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, আজ সকালে সুন্দর করে গৌফও ছেঁটেছে সে। বন্ধু জেকের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকালো, সম্ভ্রষ্টির হাসি ফুটলো ঠোঁটে। জেকের পায়ের জুতোটা পুরনো হলেও, সদ্য পালিশ করা, নতুনের মতোই ঝকঝক করছে। ঝাঁকড়া চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। যদিও নিজের গরজেই হাত আর নখের ভেতর থেকে ঘ্রিজের সব দাগ পরিষ্কার করে ফেলেছে জেক।

‘ওরা সম্ভবত ইংরেজি জানে না,’ বললো গ্যারেথ। ‘প্রয়োজনে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে হ’তে পারে। রাগ করো না, এখনো সময় আছে—তুমি রাজি হলে পাঁচ নম্বরটা ওদেরকে অনায়াসে গছানো যায়।’ জেকের চেহারা দেখে একটা হাত তুললে। ‘থাক, এ-প্রসঙ্গ থাক।’ কান খাড়া করলো সে, এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। ‘ওই বোধহয় আসছে ওরা। সব মনে আছে তো, কি?’

ওয়্যারহাউসের সামনে প্রখর রোদের মধ্যে থামলো গাড়ি দুটো, কিচিরমিচির করতে করতে নামলো আরোহীরা। সাদা ঢোলা আলখাল্লা পরে আছে চারজন, অনেকটা প্রাচীন রোমানদের পরিধেয় টোগা-র মতো দেখতে, কাঁধের ওপর থেকে ভাঁজ হয়ে নেমে এসে পা ঢেকেছে। আলখাল্লার নিচে গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার আর খোলা স্যান্ডল। সবাই তারা বয়স্ক লোক, মুখে বলিরেখা, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল। কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙলো না, সবাই সসম্মনে ঘিরে দাঁড়ালো পশ্চিমা ধাঁচে তৈরি গাঢ় রঙের স্যুট পরা দীর্ঘদেহী যুবককে। তাদেরকে নিয়ে ওয়্যারহাউসের আবছা অন্ধকারে প্রবেশ করলো যুবক। নিয়ে যাচ্ছে গ্যারেথ সোয়েলসের কাছ।

লম্বায় প্রিন্স লিজ মিখায়েল ছ’ফুটের বেশি হবে, কাঁধদুটোয় পঙ্কিতসুলভ ঝুঁকে থাকা ভাব। গাঢ় মধু রঙের চামড়া, চকচকে চোখা নাক আর চিন্তামগ্ন বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকার প্রবণতা সত্ত্বেও তার হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে একজন দক্ষ অসিযোদ্ধার সৌষ্ঠব আর মাধুর্য ফুটে বেরুলো, হাসতে শুরু করায় গাঢ় চামড়ার মাঝখানে ঝিক করে উঠলো সাদা দাঁত।

রেখেছিল, তাই না? ঘণ্টা কয়েক উলঙ্গ থাকতে হয়েছিল তোমাকে। তুমি চলে আসার পরও অনেক দিন তোমার ছেলেরা তোমার কথা ভোলে নি। শুনেছিলাম সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলে, সেখান থেকেও নাকি তোমাকে...।’

হঠাৎ ঝুঁকে প্রিন্স লিজ মিখায়েলের গালে চুমো খেলো গ্যারেথ, কারো মুখ বন্ধ করার জন্য এরচেয়ে ভালো অস্ত্র আর হ’তে পারে না। ‘তুমি আমার পরাণের দোস্ত...।’

প্রিন্স লিজ জানতে চাইলো, ‘তারপর থেকে কী করছো তুমি, ওল্ড চ্যাপ?’

গ্যারেথের জন্যে প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে বিব্রতকর। উদার ভঙ্গিতে হাতের চুরুটটা নাড়লো সে। ‘এটা-সেটা, বোঝাই তো। একটা না একটা। ব্যবসা আর কি। আমদানি-রফতানি, বেচা-বিক্রি।’

‘সেই সূত্রেই আমরা আবার মিলিত হলাম, তাই না?’ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো প্রিন্স।

‘ঠিক তাই,’ ব’লে প্রিন্সের একটা হাত ধরলো গ্যারেথ। ‘এখন যখন জানি কে আমার ক্রেতা, উন্নতমানের জিনিস সাপ্লাই দিতে পারছি ব’লে আনন্দের পরিমাণ বেড়ে গেলো আমার।’

ওয়্যারহাউসের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে কাঠের বাস্তুগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

‘চোদ্দটা ভিকার্স মেশিনগান, বেশিরভাগ সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে আনা হয়েছে—বলতে পারো ব্যারেল থেকে এখনো কোনো গুলি বেরোয় নি।’

বাস্তুগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে ওরা থামলো সর্বশেষ বাস্তুটার কাছে, ওটা খুলে বের করা হয়েছে একটা মেশিনগান, তেপায়ার ওপর ফিট করে রাখা হয়েছে।

প্রিন্সের সঙ্গী পাঁচজন ইথিওপিয়ানই অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধা, মেশিনগানের দিকে সবাই তারা হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

‘দেখতেই পাচ্ছে, সবগুলো ফাস্টব্লুজ জিনিস।’ জেকের দিকে চট করে একবার তাকিয়ে একটা চোখ টিপলো গ্যারেথ। ‘একশো চুয়াল্লিশটা লী-এনফিল্ড রাইফেল—এখনো গ্রিজ লেগে রয়েছে—,’ প্রদর্শনের জন্যে মাত্র ছ’টা রইফেল পরিষ্কার করা হয়েছে।

ওদের কাছে সাতরাজার গুপ্তধনে ঠাসা গুহা হয়ে উঠলো চার নম্বর ওয়্যারহাউস। বয়স্ক যোদ্ধারা ব্যক্তিগত এবং মর্যাদা ভুলে পচা আবর্জনাভাষী কাকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো অস্ত্রগুলোর ওপর, তেলমাখা ঠাণ্ডা ইস্পাতগুলোকে ব্যগ্রতার সাথে হাতে তুলে নিয়ে আদর করতে শুরু করলো, ভিজিয়ে দিলো চুমোয় চুমোয়, অ্যামহারিক ভাষায় কিচিরমিচির করছে। তাদের একজন মেশিনগানের পিছনে দাঁড়ালো, পড়নের আলখাল্লা হাঁটুর ওপর তোলা, হঠাৎ ঝুঁকে তেপায়ার ওপর ঘোরাতে শুরু করলো মেশিনগানটা, মুখ দিয়ে গুলিবর্ষণের আওয়াজ ছাড়লো, অবিরাম হাসছে।

এমনকি প্রিন্স লিজ মিখায়েলও ইটোনিয়ান ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে সঙ্গীদের সাথে ভিড়ে গেলো, সত্তর বছরের এক যোদ্ধাকে কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে লী-এনফিল্ড তুলে গুলিবর্ষণ করার কৃত্রিম মহড়া দিতে শুরু করলো—কাল্পনিক শত্রুদের পাইকারী হাতে নিধন করছে। ঠিক সময়মতো নাক গলালো গ্যারেথ।

‘বলছিলাম কি, চকলেট, ওল্ড চ্যাপ-তোমার জন্যে এগুলোই আমার সব উপহার নয়। আসল জিনিস সবশেষে দেখাবো ব’লে রেখে দিয়েছি।’ আলখাল্লা পরা শূশ্রুমণ্ডিত উপদেষ্টাদের এক জায়গায় জড়ো করতে তাকে সাহায্য করলো জেক, তারপর পথ দেখিয়ে ওয়্যারহাউস থেকে বের করে এনে সবাইকে তুললো খোলা গাড়ি দুটোয়।

মোটর শোভাযাত্রা শহর ছেড়ে মেহগনি বনে ঢুকলো, প্রথম গাড়িতে গ্যারেথ, জেক ও প্রিন্স রয়েছে। জেকের ক্যাম্পের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় চাঁদোয়া আর রঙিন ছাতা টাঙানো হয়েছে, নিচে কাপড় ঢাকা দুটো টেবিল, টেবিলে সিটি হোটেলের প্রায় সব উপাদেয় খাবারই পরিবেশনের অপেক্ষায়। আরো আছে রূপালি বালতি ভরা বিয়ার ও শ্যাম্পেন। পরিবেশন শুরু করার অপেক্ষায় মাথায় ফেজ টুপি আর সাদা আচকান পরা ওয়েটাররা অদূরে দণ্ডায়মান।

খরচের প্রশ্ন তুলে এই আয়োজনে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল জেক, কিন্তু গ্যারেথ তার প্রতিবাদে কান দেয় নি। তার যুক্তি ছিলো, ‘বলতে পারো এক ধরনের জুয়া খেলছি। একটা টুস্কারের বোতল হাতে তুলে দাও—কেল্লা ফতে। ভুলে যেয়ো না কয়েকশো গুণ দাম চাইবো গাড়িগুলোর, মাতাল ছাড়া ওই দামে কে ওগুলো কিনতে চাইবে? তাছাড়া, ওরা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে ব’লে ওদের সাথে আমরা তো আর বর্বরদের মতো আচরণ করতে পারি না! সব কাজের একটা স্টাইল আছে। স্টাইল অ্যান্ড টাইমিং—জীবন তো এই দুটোর নির্যাস বৈ কিছু নয়, কি?’

অনুমতির ধার না ধরে প্রিন্স আর তার সঙ্গীরা বালতি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলো শ্যাম্পেনের বোতলগুলো। হাতে গ্লাস নিয়ে ছুটে এলো ওয়েটাররা, কিন্তু বৃথাই, সরাসরি বোতল থেকে খেতেই পছন্দ করলো তারা। বিশেষ করে প্রিন্সকে অনবরত উৎসাহ দিয়ে চলেছে গ্যারেথ।

আধ ঘণ্টা পর আস্ত রোস্ট করা একটা বাচ্চা ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অতিথিরা। ভুড়িভোজনের সাথে এখনো মদ্যপান চলছে সমানে। জেক বা গ্যারেথ, দু’জনের কেউই খুব বেশি পান করে নি, তবু পরস্পরকে প্রায়ই সতর্ক করে দিচ্ছে ওরা, ‘অ্যাই, মাত্রা ছাড়িয়ে না।’

হাতের বোতল মুখের কাছে তুলে গ্যারেথ চোঁচিয়ে বললো, ‘সম্রাটদের সম্রাট হাইলে সেলাসির উদ্দেশ্যে!’

জেকের কানের কাছে চোঁট নামিয়ে ফিসফিস করলো গ্যারেথ, ‘শালাকে আরো খাওয়াতে হবে, দেখছো না নিজের সমস্যার কথা এখনো ভোলে নি।’ সিধে হয়ে প্রিন্সের হাতে আরেকটা বোতল ধরিয়ে দিলো সে, নিজের হাতের গ্লাস উঁচু করে প্রিন্স এবারে ঘোষণা করলো, ‘হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টি, জর্জ পঞ্চম, ইংল্যান্ডের রাজা এবং ভারতবর্ষের সম্রাটের উদ্দেশ্যে।’

এরপর জেকের উদ্দেশ্যে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের উদ্দেশ্যে।’

প্রতিটি ঘোষণার সাথে এক দফা করে পানীয় পান করলো অতিথিরা।

‘তাজানিয়ায় ব্রিটিশ কলোনির গভর্নরের উদ্দেশ্যে!’

‘এবং তার মেয়ের উদ্দেশ্যে!’ বিড়বিড় করে যোগ করে জেক।

এই কথায় আরো এক দফা পানাহার চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যারেথ আর জেক বুঝলো, নিজেদের চোলাই করা মদ, তেজ্জ পান করে করে অভ্যস্ত ইথিওপিয়ানদের সাথে আর যাই হোক, সমান তালে মদ্যপান সম্ভব নয়।

‘কেমন বোধ করছো?’ উদ্ভিগ্ন ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে শুধালো গ্যারেথ।

‘দারুণ,’ দাঁত বের করে হেসে উত্তর দেয় জেক।

‘খোদার কসম, এরা ফুঁর্তি করতে জানে বটে!’

‘উৎসাহ দিয়ে যাও, উলস্ সোয়েলস। তুমি পেয়ে গেছো ব্যাটারদের।’

‘শোনো, ওল্ড চ্যাপ,’ গম্ভীর সুরে বললো গ্যারেথ, ‘ওই নামটা উচ্চারণ না করলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করবো। ডিসটেস্টফুল, কি?’ জেকের কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারলো, কিন্তু লাগলো না—টলছে সে। জেকের নিষেধ সত্ত্বেও যথেষ্ট গিলেছে।

‘অনেক হয়েছে, গ্যারেথ, এবার ইতি করো।’

প্রিন্সের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। ‘চকলেট, ওল্ড স্পোর্ট—এবার চলো, শেষ চমকটা দেয়া যাক তোমাকে।’ তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিলো সে, কজি ধ’রে টেনে নিয়ে চললো। ‘এসো সবাই। এদিকে, ভায়েরা।’

বিশেষ করে যাদের পাকা দাড়ি তারাই পান-ভোজনের রমরমা আসর ছেড়ে নড়তে চাইলো না, দলটাকে খেদিয়ে মেঠো পথে নামিয়ে আনতে জেকের সাহায্য লাগলো গ্যারেথের। তাকে হেই, হো ইত্যাদি ডাক ছাড়তে শুনে হাসি চেপে রাখা দায় হ’লো জেকের। অবশেষে একশো গজের মতো এগিয়ে ঝোপের পাঁচিল ভেদ করলো ওরা, সামনে বেশ বড়সড় একটা খোলা মাঠ।

লৌহমানবীদের দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ পাথর হয়ে গেলো দলটা। নতুন ধূসর রঙ রোদ লেগে ঝলমল করছে, পোর্ট থেকে বেরিয়ে আছে ভয়াল-দর্শন ভিকার্স মেশিনগান, বুদ্ধি করে চারটে আর্মারড্ কারের মাথায় একটা করে ইথিওপিয়ান পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে গ্যারেথ।

ওদেরকে দেখে মনে হ’লো কেউ জেগে নেই, ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। এগিয়ে গিয়ে ছাতার নিচে ফেলা চেয়ারগুলোয় বসলো সবাই, কারো চোখে পলক নেই। স্কুল মাস্টারের মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ, যদিও এখনো সে একটু একটু টলছে।

‘অদ্রমহোদয়গণ, এখানে আমরা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের প্রদর্শনী দেখতে পাচ্ছি, নিঃসন্দেহে বলা যায়, বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলোও এতো উন্নতমানের আর্মারড্ ভেহিকেল ব্যবহারের সুযোগ সুযোগ পায় নি—,’ প্রিন্স লিজ মিখায়েল তার বক্তব্য অনুবাদ করতে শুরু করলো, এই ফাঁকে জেকের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলো সে, বললো, ‘স্টার্ট দাও, ওল্ড বয়।’

প্রথম এঞ্জিন গর্জে উঠতেই বয়োবৃদ্ধ উপদেষ্টারা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, তুমুল করতালিতে ফেটে পড়লো সবাই। তারপর তারা পালা করে পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো।

‘একেকটা পনেরোশো পাউন্ড স্টার্লিং,’ জেকের কানে ফিসফিস করে বললো গ্যারেথ, ক্রেতাদের উৎসাহের মাত্রা লক্ষ্য করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সে, জেকের সাথে পরামর্শ না করেই। ‘নেবে, ওরা নেবে।’

প্রিন্স লিজ মিখায়েলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডিনার খেতে এসেছে ওরা ডানোস্তার ক্যাসেলে। একই স্যুট দ্বিতীয়বার পরে প্রিন্সের সামনে হাজির হওয়া ঠিক হবে না, তাতে প্রেস্টিজ পাণ্ডার হয়ে যাবার সম্ভাবনা, এই যুক্তিতে তাড়াহুড়ো করে জেককে আরো একটা ডিনার জ্যাকেট বানিয়ে দিয়েছে গ্যারেথ। জেকের মন খুঁতখুঁত করছে, ভালো ফিট করে নি গায়ে।

ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাসলো গ্যারেথ। ‘জানো, তোমাকে একজন ডিউকের মতো লাগছে দেখতে? এতো দিনে তোমার মধ্যে একটা স্টাইল দেখতে পাচ্ছি আমি। স্টাইল, ওল্ড চ্যাপ, সব সময় মনে রাখবে। স্টাইল! দেখে যদি মনে হয় তুমি লোকটা গরিব, লোকজন তোমার সাথে নোংরা আচরণ করবে।’

প্রিন্স লিজ মিখায়েল সাদা আলখাল্লা পরেছে; তাতে সোনালি, বেগুনিও কালো এমব্রয়ডারির কাজ করা, গলার কাছে গাঢ় লাল রঙের একটা পদ্মরাগমণি ঝুলছে। আলখাল্লার ভেতর পরেছে আঁট-সাঁট ভেলভেট পা’জামা, পায়ে চক্কিশ ক্যারেট সোনার তার জড়ানো স্যান্ডেল। ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে তার নিজস্ব স্যুইটে। প্রচুর সময় নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পালা চুকলো। মস্ত একটা ঢেকুর তুলে গ্যারেথের দিকে ফিরলো সে।

‘এবার, মাই ডিয়ার সোয়েলস্,’ বললো প্রিন্স, ভব্যতার খাতিরেই গ্যারেথের কণ্ঠার্জিত ডাকনামটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেনি সে। ‘মেশিনগান আর অন্যান্য অস্ত্রের দাম কয়েক মাস আগেই ঠিক করা হয়েছে, কিন্তু চিঠিপত্রে কখনোই তুমি আর্মারড্ কারগুলোর কথা উল্লেখ করো নি। ওগুলোর দাম সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারো?’

‘ইওর এক্সেলেন্সি, তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগে ন্যায্য একটা দাম আমি ভেবে রেখেছিলাম,’ প্রিন্সের একটা হাভানা চুরুটে কষে দম দিলো গ্যারেথ। ‘কিন্তু ক্রেতা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ায় কেনা দামে ওগুলো বিক্রি করতে হবে আমাকে।’ ঘন ঘন মাথা নাড়লো সে। ‘না, অসম্ভব! বন্ধুর কাছ থেকে আমি কোনো লাভ করতে পারবো না।’ জেকের দিকে তাকালো সে। ‘ওকে আমি বুঝিয়ে-শুনিয়ে ম্যানেজ করবো। তা নিয়ে চিন্তা করো না।’

খুশি হয়ে হাসলো প্রিন্স।

তাকে খুশি হ’তে দেখে দাম আরো বাড়িয়ে দিলো গ্যারেথ। ‘প্রতিটি দুই হাজার পাউন্ড,’ দ্রুত বললো সে, শব্দগুলো জড়িয়ে গিয়ে অর্থটা যাতে একটু দেরিতে বোধগম্য হয়। তারপরও ছুইফ্রির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো জেক।

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালো প্রিন্স। ‘আচ্ছা,’ বললো সে। ‘দামটা সম্ভবত ন্যায্যমূল্যের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি চাইছো।’

গ্যারেথের চেহারা ব্যথা ও বিস্ময় ফুটে উঠলো। ‘ইওর এক্সেলেন্সি...।’

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো প্রিন্স। ‘গত ছয়মাস ধরে বিভিন্ন ধরনের সামরিক ইকুইপমেন্ট দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্লিজ, সোয়েলস্, প্রতিবাদ করে আমাদের দু’জনকেই অপমান করো না।’

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো, গিটারের তারের মতো উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো পরিবেশ।

অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেললো প্রিন্স। ‘যেগুলো দেখে এসেছি তার দাম দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তবু আমি ওগুলো কিনতে পারি না। বিশ্বের তাবৎ বৃহৎ শক্তি গোত্রগুলোর জন্যে অস্ত্র কেনা নিষিদ্ধ করেছেন। মুশকিল হলো, ওরা বেচতে রাজি কিন্তু জায়গামতো ডেলিভারি দিতে রাজি নয়।’ তার চোখে বিষণ্ণ ভাব। ‘আপনারা জানেন, অস্ত্রগুলো যেখানে আমার দরকার সেখানে কোনো সাগর নেই। সমস্ত মালামাল ফ্রেঞ্চ এলাকা নয়তো ব্রিটিশ সোমালিয়া হয়ে আসতে হবে— না হয় ইতালি অধ্যুষিত ইরিত্রিয়া হয়ে। ইতালি হানাদার; আর ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চরা তো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েই রেখেছে।’ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হৃদের গ্লাসে মৃদু চুমুক দিলো সে।

‘হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কেবল পুরোনো তলোয়ার হাতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই ফ্যাসিবাদী বর্বরের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ওরা আমাদের।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্যারেথের পানে চাইলো প্রিন্স, মুখাবয়ব পাল্টে গেছে।

‘মেজর সোয়েলস্, তুমি আমাকে ভাঙাচোরা, বাতিল কিছু অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দিচ্ছো, দাম চাইছো প্রকৃত মূল্যের পাঁচগুণ। এই মুহূর্তে আমি ভারি অসহায় বোধ করছি। মরিয়ান না হয়ে আমার কোনো উপায় নেই। তোমার প্রস্তাব এবং মূল্য আমাকে মেনে নিতে হবে।’

সামান্য স্বস্তি ফিরে পেয়ে জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ।

‘হ্যাঁ, ব্রিটিশ স্টার্লিংয়েই পেমেন্ট করা হবে তোমাকে—তোমার এই শর্তটাও আমি মেনে নিচ্ছি।’

এতোক্ষণে হাসলো গ্যারেথ। ‘মাই ডিয়ার ফেলো—,’ শুরু করলো সে, কিন্তু আবারও হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো প্রিন্স।

‘তোমার অনেক শর্ত, কিন্তু আমার মাত্র একটা,’ বললো লিজ মিখায়েল। ‘এটার ওপরই নির্ভর করছে অস্ত্রগুলো আমি কিনবো কিনা। ওগুলো ইথিওপিয়ায়, আমার এলাকায়, পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাদের। আমার কাছে বা আমার নির্বাচিত এজেন্টের কাছে অস্ত্রগুলো ডেলিভারি দেয়ার পর পেমেন্ট পাবে তোমরা।’

‘গুড গড, ম্যান!’ ফেটে পড়লো গ্যারেথ। ‘কী বলছো তুমি নিজেও জানো না! কয়েকশো মাইল দুর্গম এলাকা, চারদিকে শত্রু গিজগিজ করছে, তার ভেতর দিয়ে আমরা ওগুলো স্মাগল করে নিয়ে যাবো? এমন আস্ত উন্মাদ তো দেখি নি।’

‘উন্মাদ, মেজর সোয়েলস্? ভেবে দেখো। ওগুলো এখানে ডেলিভারি নিলেই লোকে বরং আমাকে উন্মাদ বলবে, তাই না? আরো ভাবো। দার-এস-সালামে ওগুলো না আমার কোনো কাজে আসবে, না তোমার। দুনিয়ায় এমন কোনো বোকা নেই যে ওগুলো কিনতে চাইবে তোমার কাছ থেকে। শত্রু এলাকার ভেতর দিয়ে ওগুলো আমি নিয়ে যেতে পারবো না, কারণ বৃহৎ শক্তির গুপ্তচররা আমার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখছে। জিবুতিতে আমার সাথে সাথে সার্চ করা হবে আমাকে। অপরদিকে, এখানে পড়ে থাকলে ওগুলোর কোনো মূল্যই নেই।’ থেমে গ্যারেথের দিকে, তারপর জেকের দিকে তাকালো সে।

চোয়ালে আঙুল বুলিয়ে জেক বললো, ‘আপনার যুক্তি বুঝতে পারছি, মি: মিখায়েল।’

‘আপনি বুদ্ধিমান, মি: বারটন,’ বললো প্রিন্স, আবার সে গ্যারেথের দিকে তাকালো। ‘ইথিওপিয়ায় পৌঁছে দাও, একেকটার জন্যে পনেরো হাজার পাউন্ড পাবে তুমি। এখানে ফেলে রাখো, মরচে ধ’রে নষ্ট হবে। কী করবে সেটা তোমার ব্যাপার। কী বলো? হয় পৌঁছে দাও ইথিওপিয়ায়— নয়তো বাতিল এই ব্যবসা।’

‘লো’কটাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম!’ উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে গ্যারেথ, ‘কল্পনাও করি নি পুরনো ইটোনিয়ান একজন বন্ধু এভাবে আমার সাথে বেসম্মানি করবে! এ তো স্রেফ চুক্তিভঙ্গ!’

মাদাম সিসিলি’র ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠে হেলান দিয়ে ব’সে ছিলো জেক। ডিনার জ্যাকেট খুলে ফেলেছে, ওর পায়ের কাছে ব’সে আছে স্বর্ণকেশী এক সুন্দরী। পুরুষ্ট উরুজোড়া উন্মুক্ত তার, অন্তর্বাসের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। সমস্ত মনোযোগ একীভূত করে তার একটা বিশালাকার স্তন হাতের তালুতে নিয়ে ওজন করে দেখছিলো জেক। কোলে মাথা রেখে খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ছিলো রূপসী।

‘ড্যাম ইট, জেক, আমার কথা শোনো!’

‘গুনছি তো।’ জেক বলে।

‘ব্যাটা আমাকে অপমান করলো।’ বলে, পোশাকের চেইন খুলতে থাকা রূপসীর দেহে তাকিয়ে থেকে সব ভুলে গেলো গ্যারেথ।

‘খোদা, দারুণ জিনিস দেখছি!’ বস্ত্রহরণ পর্ব আমোদের সাথে উপভোগ করছে ওরা দু’জন।

‘আরে ভাই, তোমার জিনিস নিয়েই থাকো না, কেনো আবার আমারটার দিকে নজর দাও।’ বিড়বিড় করে অভিযোগের সুরে বললো জেক।

‘ঠিক।’ বলে, কাউচের অপর ধারে ধৈর্য্য ধ’রে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার উদ্দেশ্যে ফিরলো গ্যারেথ। চকচকে কালো চুলগুলো স্তূপ হয়ে জ’মে আছে মাথার উপর, ফ্যাকাসে সাদা চামড়া, বড়ো বড়ো চকলেট-রঙা চোখ; টকটকে লাল লিপস্টিক ঠোটে। গ্যারেথের কাঁধে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ’রে লাস্যময়ী।

‘তুমি নিশ্চিত— এদের কেউ ইংরেজি জানে না?’ সাদা হাতের আলিঙ্গনে ডুবে যাবার আগে গ্যারেথ জানতে চায়।

‘ওরা দু’ জনেই পর্তুগীজ,’ আশ্বস্ত করে ব’লে জেক। ‘তবুও, পরীক্ষা করে দেখা যাক।’

‘ঠিক আছে।’ এক মুহূর্ত চিন্তা করে গ্যারেথ বললো। ‘দেখো মেয়েরা, একটা কথা বাপু আগে ভাগে শুনে নাও, তোমাদেরকে এক পাই-পয়সাও দিচ্ছি না। এ হ’লো নিঃশর্ত ভালোবাসা। কি?’

এই কথাতেও মেয়েদুটোর ভাব পাল্টায় না। আগের মতোই গাঢ় আলিঙ্গনে ভরিয়ে তুলতে থাকে তারা গ্যারেথ আর জেককে।

‘যাক, নিশ্চিত হলাম।’ গ্যারেথ বলে। ‘এখন কথা বলা যায়।’

‘এই সময়ে?’

‘আগামীকাল সকাল পর্যন্ত কেবল সময় আছে, কী করবো ভেবে-চিন্তে বের করার জন্যে।’

অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা বললো জেক, ঠিকমতো শুনতে পেলো না গ্যারেথ।

‘আগে অ্যাকশন, তারপর ডিসিশন!’

‘ঠিক হ্যাঁ!’ দুই বন্ধুতে মিলে এবারে মগ্ন হ’য়ে পড়ে দুই সঙ্গিনীর বাহুডোরে।

ত্রিশ মিনিট পর। অবিন্যস্ত পোশাকে মাদাম সিসিলি’র সরবারহ করা ইথিওপিয়ার একটা লার্জ স্কেল ম্যাপের উপর ঝুঁকে ব’সে আছে জেক এবং গ্যারেথ।

‘হাজার মাইল লম্বা অরক্ষিত কোস্ট লাইন,’ ম্যাপের গায়ে আঙুল বুলিয়ে উপকূল রেখা চিহ্নিত করলো গ্যারেথ। এরপর মূল ভূখণ্ডের দিকে আঙুল চালালো। ‘সেই সীমান্ত পর্যন্ত কেবল ধু ধু মরু এলাকা। এমন নয় যে, খুব কারো চোখে পড়বো আমরা। ওদিকে লোক বসতি নেহাতই কম।’

‘টাকা উপার্জনের জন্যে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ উপায়।’

‘আমরা তবে যাচ্ছি না?’ চোখ তুলে তাকায় গ্যারেথ।

‘তুমি জানো, যাচ্ছি।’

‘হ্যাঁ, জানি আমরা যাচ্ছি। পনেরো হাজার ব্রিটিশ স্টার্লিং সেই কথাই বলে।’

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো প্রিন্স লিজ মিখায়েল, জিজ্ঞেস করলো, ‘কীভাবে যাওয়া হবে ঠিক করেছে? ইচ্ছে করলে আমার পরামর্শ নিতে পারো তোমরা। উপকূল, আর উপকূল থেকে ভেতর দিকের সবগুলো পথ সম্পর্কে জানি আমি।’ একজন উপদেষ্টাকে ইঙ্গিত করতে টেবিলের উপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে দিয়ে গেলো।

‘আমরা দার-এস-সালামে একটা জাহাজ ভাড়া করবো ব’লে ভেবেছি,’ বললো জেক। ‘জাহাজ আমাদেরকে,’ ম্যাপের গায়ে এক জায়গায় আঙুল রাখলো ও, ‘এখানে

কোথাও নামিয়ে দেবে। আর্মারড্‌ কারে বাব্বগুলো ভরা হবে, ট্যাংকে থাকবে যথেষ্ট গ্যাসোলিন, সরাসরি ইংল্যান্ডের দিকে যাবো আমরা, সামনে কোথাও আপনাদের লোকদের সাথে মিলিত হবো—জায়গাটা আগেই ঠিক করা থাকবে।’

‘গুড,’ বললো প্রিন্স। ‘বেসিক আইডিয়াটা ঠিক আছে। কিন্তু ব্রিটিশ এলাকা এড়িয়ে যেতে হবে আমাদের। তাদের ভূখণ্ড থেকে পূর্বে ক্রীতদাস নিয়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্যে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে। লোহিত সাগরে পৌঁছে কোথায় নোঙর ফেলবেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। সোমালি প্রজাতন্ত্র এড়িয়ে যেতে পারলে সব দিক থেকে ভালো, ওদের উপকূলে কড়া পাহারা আছে। ফ্রেঞ্চ জিবুতির কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলতে হবে।’

অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হলো। জেক এবং গ্যারেথ দু’জনেই উপলব্ধি করলো, বাধাগুলোকে হালকাভাবে নিয়েছিল ওরা, প্রিন্সের পরামর্শ খুব কাজে এলো ওদের।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে জাহাজ ভেড়ানোর জন্যে একটা জায়গা বাছলো প্রিন্স। ‘ওদিকের উপকূলে নোঙর ফেলতে হলে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই, চেউগুলো একেকটা বিশ ফুট উঁচু, পানির নিচে পাথুরে স্তরগুলোরও অনুকূল নয়।’ ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখলো সে। ‘এখানে, জিবুতি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, প্রাচীন একা হারবার আছে, নাম মন্ডি। না, চার্টে মার্ক করা নেই। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশরা দখল করে নিয়েছিলো। জাঞ্জিবার আর মোজাম্বিক দ্বীপের মতো মন্ডিও এককালে ক্রীতদাস ব্যবসার একটা কেন্দ্র ছিলো।’

‘হারবারটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না?’

‘না। কারণ বিস্কন্ধ পানির অভাব। যদিও গভীর একটা ওয়াটার-চ্যানেল আছে, তীরে পৌঁছানোর পথটাও বেশ নিরাপদ—পানির নিচে পাথর কম। তবে জাহাজ থেকে কার্গোগুলো নামাবার জন্যে ক্রেন ইত্যাদির সাহায্য পাবেন না।’

একটা নোটবুকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো টুকে নিচ্ছে গ্যারেথ, জেক ঝুঁকে আছে ম্যাপের ওপর। ‘পুলিশ পেট্রল এদিকটায় কী রকম?’ জিজ্ঞেস করলো ও।

কাঁধ ঝাঁকালো প্রিন্স। ‘জিবুতি সরকার উট ব্যবহার করে, মাঝে মধ্যে উপকূল এলাকায় দেখা যায় ওগুলোকে। দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে খুবই কম।’

‘এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে আমার না খুব ভালো লাগে,’ গ্যারেথের কণ্ঠে ব্যঙ্গ বারলো।

‘তীরে নামলাম, তারপর?’ জিজ্ঞেস করলো জেক।

ম্যাপে চোখ রাখলো প্রিন্স। ‘আপনারা তারপর সাবেক ইতালিয়ান ইরিত্রিয়া সীমান্ত ধরে এগোবেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এক সময় জলাভূমি দেখতে পাবেন, যেখানে অ্যাওয়াস নদী মরুভূমিতে শুকিয়ে গেছে। ওখান থেকে সরাসরি পশ্চিম দিকে মুখ করে এগোবেন, পেরিয়ে আসবেন সোমালি সীমান্ত, সেই সাথে ঢুকে পড়বেন ইথিওপিয়ার ডানাকিল প্রদেশে। আমার লোকেরা আপনাদের সাথে দেখা করবে এখানে—,’ বয়স্ক উপদেষ্টাদের দিকে ফিরে কিছু প্রশ্ন করলো সে। উচ্চস্বরে আলোচনা চললো বেশ কিছুক্ষণ অ্যামহারিক ভাষায়। তারপর ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে আবার জেকের দিকে ফিরলো সে।

‘আমরা একমত হয়েছি, সাক্ষাতটা হবে ওয়েলস অব চান্ডিতে—এখানে।’ ম্যাপটা আবার সে দেখালো ওদের। ‘দেখতেই পাচ্ছেন, জায়গাটা ইথিওপিয়ার বেশ খানিকটা ভেতরে। আমার গোত্রের জন্যে এই ডেলিভারি পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কারগুলো সারডি গিরিপথ আর ডেসি গামী পথটার প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করা হবে।’ উপদেষ্টাদের একজন প্রিন্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে আবার ওদের দিকে ফিরলো লিজ মিখায়েল। ‘আমার উপদেষ্টা জানালেন, মন্ডি থেকে ওয়েলস অব চান্ডি পর্যন্ত আপনাদের যাত্রা মরুর ওপর দিয়ে হবে, ওখানে কোনো পথচিহ্ন নেই। কোথাও কোথাও গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। এলাকাটা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে এমন একজন গাইড পেলে সুবিধে হবে আপনাদের...।’

‘খুব ভালো হয়,’ বললো জেক। ‘তেমন কেউ আছে?’

‘চুক্তিভঙ্গ করলেও, লোক তুমি খারাপ নও,’ বিড়বিড় করে উঠলো গ্যারেথ।

‘যাকে আপনাদের সাথে পাঠাবো বলে ভাবছি সে আমার আত্মীয়—ভাইপো। তিন বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়েছে, ভালো ইংরেজি জানে। আপনাদের পথটাও চেনে সে, ওদিকে অনেকবার সিংহ শিকার করতে গেছে।’ একজন উপদেষ্টাকে অ্যামহারিক ভাষায় কিছু বললো সে, উপদেষ্টা কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ‘আমার ভাইপো আসছে। ওর নাম গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম।’

গ্রেগোরিয়াসের বয়স হবে আঠারো কি উনিশ, যদিও এরই মধ্যে সে তার চাচার মতোই লম্বা হয়ে উঠেছে, চেহারা আদিবাসী যোদ্ধার ছাপ থাকা সত্ত্বেও আচরণে অত্যন্ত মার্জিত। পরেও আছে পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক, চোখ দুটো মায়া ভরা, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় জ্বলজ্বল করছে। নিজেদের ভাষায় কিছু কথা বললো চাচা-ভতিজা, তারপর ভতিজা ওদের দিকে ফিরলো।

‘আমাকে কী করতে হবে চাচার কাছ থেকে শুনলাম,’ তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং আগ্রহে ভরপুর। ‘সাহায্য করতে পারবো জেনে সম্মানিত বোধ করছি, স্যার।’

‘তুমি গাড়ি চালাতে পারো?’ প্রত্যাশা নিয়ে জানতে চায় জেক। হেসে মাথা নাড়ায় গ্রেগোরিয়াস।

‘আদিস আবাবায় আমার নিজের একটা স্পোর্টস কার আছে।’

হাসি ফিরিয়ে দিলো জেক। ‘দ্যাটস গ্রেট। তবে আর্মারড কার চালানো একটু কঠিন।’

‘গ্রেগোরিয়াস ওর ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করবে,’ বললো প্রিন্স। ‘মনে আছে তো, জাহাজ রওনা হবে দুপুরে।’ চাচার উদ্দেশ্যে বাউ করে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম।

‘উপকারের বিনিময়ে উপকার, এটাই দুনিয়ার নীতি,’ বললো প্রিন্স গভীর দৃষ্টিতে গ্যারেথের দিকে তাকালো সে। ‘এইমাত্র তোমার একটা উপকার করেছি আমি সোয়েলস্। বিনিময়ে আমার একটা পাওনা হয়েছে।’

দর কষাকষিতে প্রিন্সের সাথে হেরে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে গ্যারেথের, তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করলো সে, ‘দেখো চকলেট, ওল্ড চ্যাপ....।’

কিন্তু প্রিন্স নিজের কথা ব'লে চললো, যেনো কেউ তাকে বাধা দেয় নি, 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, আমার গোত্রের জন্যে যেসব অস্ত্র দরকার তার মধ্যে বিশ্ব বিবেকও একটা।'

'কিন্তু সমস্যার আকৃতি-প্রকৃতি ক্ষুদ্র হলে বিশ্ববিবেক কান্নাকাটি করে না,' মন্তব্য করলো জেক। 'আবার কান্নাকাটি করলেও তাতে সাধারণত কোনো কাজ হয় না।'

'না, তা হয় না, জানি,' একমত হ'লো প্রিন্স। 'তাই ব'লে আমরা তো আর চুপচাপ ব'সে থাকতে পারি না। আমাদের উপর অন্যায় আক্রমণ এবং অবিচারের কথা দুনিয়াকে আমরা জানাতে চাই। আশা করি, তাতে খানিকটা হলেও চাপ সৃষ্টি হবে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার উপর। আর চাপ সৃষ্টি করতে হ'লে লোকজনের কাছে পৌঁছতে হবে আমাদের উপর অত্যাচারের কথা।'

'খাঁটি কথা।' গ্যারেথ মেনে নিলো।

'সে কথা ভেবেই আমেরিকার সেই নামকরা সাংবাদিককে সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। তিনি যে পত্রিকায় কাজ করেন, সারা দুনিয়ায় তার অজস্র পাঠক আছে। তিনি নিজে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর একজন গুভানুধ্যায়ী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। তিনি আমার বন্ধুও বটে।' বিরতি দিলেন প্রিন্স। 'কিন্তু তার সুনাম ইতিমধ্যে ইথিওপিয়ায় পৌঁছে গেছে। ইতালিয়রা বুঝে গেছে, সত্য প্রকাশ করা হলে তারা বিপদে প'ড়ে যাবে। কাজেই এটা ঠেকাতে ব্যবস্থা নিয়েছে তারা। ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ এবং ইতালিয় ভূ-খন্ড তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

'জানি কী চাইছো,' তাকে বাধা দিয়ে বললো গ্যারেথ। 'কিন্তু না, সম্ভব নয়। এমনিতেই হাজারটা বিপদ মাথায় করে যেতে হবে, তার ওপর সারা দুনিয়ার সংবাদ-মাধ্যমকে সাথে করে নিয়ে...।'

'সে কী গাড়ি চালাতে পারে, আর্মারড্ কার?' জিজ্ঞেস করলো জেক। 'শেষ গাড়িটার জন্যে একজন ড্রাইভার লাগবে আমাদের।'

'যতদূর চিনি এই সাংবাদিক ব্যাটারদের, হুইস্কির বোতল ছাড়া কিছু বোঝে না এরা।' গ্যারেথের স্বরে রাগ।

'গাড়ি চালাতে জানলে বাড়তি একজন ড্রাইভার ভাড়া করার হাত থেকে বেঁচে যাবো আমরা,' জেক বলে।

'তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক,' বললো প্রিন্স, তার ইঙ্গিতে একজন উপদেষ্টা কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

আলোচনার বিরতিতে সুযোগটা নিলো গ্যারেথ, প্রিন্সের কনুই খামচে ধ'রে দল থেকে সরিয়ে আনলো একপাশে। 'অতিরিক্ত যে খরচ হবে তার একটা হিসাব করেছি আমি-জাহাজ ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি খাতে। পুঁজির ওপর অপ্রত্যাশিত চাপ পড়ছে কিনা, তাই ভাবছিলাম তোমাকে বিশ্বস্ততা প্রমাণের সুযোগ দেয়ার জন্যে অল্প কিছু টাকা অগ্রিম চাইবো কিনা....।'

'মেজর সোয়েলস্, আমার ভাইপোকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে তা আমি এরই মধ্যে প্রমাণ করেছি।'

চোয়ালের রেখাগুলোয় আলাদা ধরনের সৌষ্ঠ্যব দৃষ্টি কাড়ে, ঠিক ধারালো নয়—স্পষ্ট। 'সত্যি কথা বললে কেউ যদি কিছু মনে না করে, তোমাকে অপছন্দ করবে এমন পুরুষ খুব কমই আছে।'

এই প্রথম হাসলো মেয়েটা। স্বতঃস্ফূর্ত, উষ্ণ হাসি। জেক দেখতে পেলো, ভিকি কেমবারওয়েলের সামনের সারি একটা দাঁত অসমান, লাইন থেকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। হতভম্ব হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে ছিলো ও, হঠাৎ খেয়াল হ'তে একটু অপ্রতিভ হলো, দৃষ্টি রাখলো সবুজ চোখে।

'তুমি গাড়ি চালাতে জানো?' সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করলো ও।

'জানি,' আবার শব্দ করে হাসলো ভিকি কেমবারওয়েল। 'সেই সাথে আমি ঘোড়া আর সাইকেলও চড়তে পারি, স্কি করতে পারি, প্লেন চালাতে জানি, স্নুকার আর ব্রিজ খেলতে জানি, গান গাই, নাচি, পিয়ানো বাজাই।'

'চলবে,' তার সাথে জেক যোগ দিলো হাসিতে। 'তাতেই আমার চলবে।'

প্রিন্সের দিকে ফিরলো ভিকি। 'ব্যাপারটা কী বলো তো, মিখায়েল?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমাদের পরিকল্পনার সাথে এই দুই ভদ্রলোকের কী সম্পর্ক?'

ডানোভার ক্যাসেল তার নোঙর তুললো। আপার ডেকে দীর্ঘদেহী প্রিন্স দাঁড়িয়ে আছে, দু'পাশে সাদা আলখাল্লা পরা উপদেষ্টারা। জাহাজের গতি বাড়তে শুরু করলো, একটা হাত তুলে বিদায় জানালো লিজ মিখায়েল।

ধীরে ধীরে দিগন্তরেখায় অদৃশ্য হয়ে গেলো জাহাজটা। নীরবে জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা চারজন।

জেক প্রথমে কথা ব'লে উঠলো। 'মিস কেমবারওয়েলের জন্যে একটা ঠাই খুঁজে বের করতে হবে।' চিন্তাটা জাগতেই, ওরা দু'জনেই, জেক ও গ্যারেথ, একযোগে হাত বাড়ালো ভিকি কেমবারওয়েলের ব্যাগ আর টাইপ-রাইটার কেসের দিকে।

'টস করি এসো,' প্রস্তাব দিলো গ্যারেথ, ভোজবাজির মতো তার হাতে একটা পূর্ব আফ্রিকার শিলিং বেরিয়ে এলো।

'টেইলস,' বললো জেক।

শিলিংটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তালি মারার ভঙ্গিতে দুই তালুর মাঝখানে সশব্দে গ্রহণ করলো সেটা গ্যারেথ, হাত খুললো। 'রাফ লাক, ওল্ড চ্যাপ,' সহানুভূতি জানালো গ্যারেথ, পকেটে চালান করে দিলো শিলিংটা। 'মিস ভিকি কেমবারওয়েলের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ওর একটা জুংসই ব্যবস্থা করে জাহাজের খোঁজে বেরুবো। ইতিমধ্যে তুমি আবার মন খারাপ করে ব'সে থেকো না, বরং গাড়িগুলো আরেকবার চেক করে নাও।' কথা বলার ফাঁকে হাতছানি দিয়ে একটা রিক্সা ডাকলো সে। 'মনে রেখো, জেক, শক্ত রাস্তায় চালিয়ে ওগুলোকে বন্দরে আনা এক কথা, আর দুশো মাইল মরু পাড়ি দেয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা।' ভিকি কেমবারওয়েলের হাত ধ'রে মার্জিত ভঙ্গিতে বাউ

করলো সে, তাকে রিস্কায় উঠতে সাহায্য করলো। ‘ড্রাইভার, অ্যাডভান্স!’ বিজয়ীর হাসি হেসে জেকের উদ্দেশে হাত নাড়লো।

‘মনে হচ্ছে আমরা একা হয়ে গেলাম, স্যার,’ গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম বললো।

‘হুম!’ এখনো জেক দ্রুত অপসূয়মান রিস্কার দিকে তাকিয়ে আছে।

‘যাই, আমাকেও একটা ঠাই খুঁজে নিতে হবে....’

‘আমার সাথে চলো, গ্রেগোরিয়াস। এই কটা দিন তাঁবুতে থাকতে পারবে।’ হঠাৎ হাসলো জেক, ‘যদি বলি তোমার বদলে তাঁবুতে মিস কেমবারওয়েলকে পেলে খুশি হতাম, আশা করি দুঃখ পাবে না?’

হেসে ফেললো ছেলেটা। ‘আপনার মনের কথা বুঝতে পারি....কিন্তু ভিকি সম্ভবত নাক ডাকে, স্যার?’

‘যে মেয়ে দেখতে অতো সুন্দর সে নাক ডাকতে পারে না,’ জ্ঞান দানের সুরে বললো জেক। ‘আরেকটা কথা, আমাকে তুমি স্যার স্যার করবে না, নার্ভাস বোধ করি। আমার নাম জেক।’ গ্রেগোরিয়াসের একটা ব্যাগ তুলে নিলো ও। ‘চলো হাঁটি।’ ধুলোময় রাস্তা ধ’রে হেঁটে চললো ওরা দু’জন।

মেহগনি বনে ঢোকায় মুখে জেক জিঙ্ক্‌স করলো, ‘বলছিলে তোমার একটা মরগান গাড়ি আছে?’

‘আছে, জেক।’

‘জানো, কী ওটাকে চালায়?’

‘ইন্টারন্যাশনাল কমবাসশন এঞ্জিন।’

গ্রেগোরিয়াসের পিঠি চাপড় দিলো জেক। ‘এইমাত্র তোমাকে সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হলো—আন্তিন গুটাও।’

নিজের ফাঁদে মেয়েদের ধরার জন্যে মেজর গ্যারেথ সোয়েলসের রয়েছে নিজস্ব একটা কৌশল, যা গত বিশ বছরে একবারও পরিবর্তন বা সংশোধন করবার কারণ দেখে নি সে। মেয়ে মাত্রই অভিজাত পুরুষের সঙ্গলোভী, তারা শক্তের ভক্ত, বাস্তবতা এবং দারিদ্র্য তাদের দু’চোখের বিষ, মিষ্টি কথা আর বড়লোকি চালচলন দিয়ে তাদেরকে সহজেই কাবু করা যায়। গদি মোড়া রিস্কায় উঠে আর দেরি করলো না গ্যারেথ, সে তার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সবটুকু হাসি আর মার্জিত আচরণের মায়াজাল বিস্তার করার কাজে নেমে পড়লো।

কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কণ্ঠকাকীর্ণ সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক বৃত্তে যে মেয়ে ত্রিশ বছরে পা দেয়ার আগেই নাম কিনেছে, লক্ষণ দেখে পরিস্থিতি আঁচ করতে পারা তার জন্যে কঠিন কিছু নয়, এবং এমনও নয় যে, দুনিয়ার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ। পরিচয় হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্যারেথ সোয়েলস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা পেয়ে গেছে ভিকি কেমবারওয়েল। পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা, মার্জিত হাস্যরস,

দরাজ কণ্ঠস্বর, উদার ভাবভঙ্গি, আভিজাত্যের গর্ব, চোখে ইম্পাতের মতো চকমকে দৃষ্টি—এ-সব বহু পুরুষের মধ্যেই দেখেছে সে। পাজি এবং দুর্বৃত্ত হিসেবেই তাদেরকে চেনে ভিকি কেমবারওয়েল। গ্যারেথের সঙ্গলাভ করার পর প্রতিটি মুহূর্তে তার সন্দেহ দৃঢ় হ’তে লাগলো, এ-ও তাদেরই দলে, হয়তো সবার মধ্যে সেরা একজন, পাজিদের শিরোমণি। তবে পাজি হলেও, সুদর্শন পাজি। তাকে মুগ্ধ করার জন্যে বক বক করে চলেছে গ্যারেথ, ভিকি ভাবছে শতকরা কতো ভাগ গাল-গল্প আর কতো ভাগ সত্যি। শুনছে আর কৌতুক বোধ করছে সে।

‘কর্নেলের কথা বলছি, আমার বাবা....,’ বললো গ্যারেথ। সত্যি কর্নেল হয়েই মারা গেছেন ভদ্রলোক, তবে তিনি কর্নেল ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে।

‘হুঁ-হুঁ,’ প্রতিটি নতুন বিষয়ে কথা শুরু করলেই গ্যারেথকে উৎসাহ দিচ্ছে ভিকি কেমবারওয়েল।

‘বলাই বাহুল্য, পারিবারিক বিশাল জমিদারি আর সম্পত্তি আমার হাতে আসে মায়ের তরফ থেকে....,’ গ্যারেথের মা ছিলো ব্যর্থ এক মুদির মেয়ে। পারিবারিক বিশাল জমিদারি মানে মটগেজ করা প্রাচীন বাড়ি সোয়ানসিতে।

‘আমি যে ইটনে পড়াশোনা করবো সে তো জানা কথা—পারিবারিক ঐতিহ্য, ঝুঝতেই পারছো।’ গ্যারেথের চৌদ্দপুরুষের কেউ ইটনে কেনো, কোনো কলেজেই পড়াশোনা করে নি। তাকে ইটনে ভর্তি করা হয়েছিল পরিবারের খুদ-কুঁড়ো যা ছিলো সব বিক্রি করে, বখাটে ছেলেকে মানুষ করার জন্যে সেটাই ফিলো মা-বাবার সর্বশেষ ব্যর্থ চেষ্টা।

‘ফরেন সার্ভিসে ছিলেন বাবা, ভারি রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। বীরত্ব আর আদর্শ তাঁর রক্তের প্রধান উপদান ছিলো, উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর কাছ থেকেই ওগুলো পেয়েছি আমি। বিশ্বাস করবে, ভদ্রলোক ডুয়েল লড়ে জীবনের ইতি ঘটান?’ আসলে ভারত ভাগ হওয়ার আগে আত্মহত্যা করেন ভদ্রলোক, কারণ ঘুষ খেয়ে ধরা পড়ার পর বিচারের সম্মুখীন হ’তে যাচ্ছিলেন।’

‘তাই?’

‘ইটন ছাড়তে হ’লো আমাকে, স্বভাবতই—বিশাল সম্পত্তি আর জমিদারি দেখাশোনা করার জন্যে।’ ইটন ছাড়তে হয়েছিল হাউজ মাস্টারের মেয়ের সাথে কলেংকারীতে জড়িয়ে পড়ায়। অবশ্য এই কারণেই অনেকে মনে রেখেছে গ্যারেথ সোয়েলসকে।

‘ভাগ্যই বলতে হয়—যুদ্ধ চলছিলো তখন—’ এমনকি, ডিউক রেজিমেন্টও তাদের নতুন অফিসারদের ব্যাপারে খুব একটা খোঁজ-খবর করতো না; আর তাছাড়া, ইটনের পড়াশোনায় ব্যাপারটা গ্যারেথের পক্ষে কাজ করেছিলো সেই সময়। জার্মান সেনাবাহিনীর মেশিনগানের কারণে পদোন্নতিও হয়েছিলো দ্রুত। এরপর, যেনো কি সেই। রেজিমেন্টের নিয়মে চলতে হ’লে একজন অফিসারের তিন হাজার পাউন্ড প্রয়োজন হতো বছরে। চাকরি ছেড়ে দিলো গ্যারেথ। আর তারপর থেকে কেবল ঘুরে ফিরছে।

সতর্ক থাকা সত্ত্বেও, খানিকটা মুগ্ধ হ’লো ভিকি কেমবারওয়েল। তার জানা আছে, এ হ’লো মুরগির সামনে কেউটের নৃত্য, ছোবল দেয়ার আগের মুহূর্ত। তার পেশাই

তাকে দুনিয়ার সংকটবহুল এলাকাগুলোয় নিয়ে গেছে, সে-সব জায়গায় এ-ধরনের লোক ভুরি ভুরি দেখেছে সে। এরা উত্তেজনা আর বিপদ ভালোবাসে, জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করতে চায়, কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের শেষ পরিণতি হয় বেদনামলিন।

কিন্তু হুঁ-হুঁ করা ছাড়া সাড়া দিলো না ভিকি কেমবারওয়েল। জানে, এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামবে গ্যারেথ সোয়েলস্, কোনো আশা নেই বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু এতো সহজে হাল ছাড়ার পাত্র গ্যারেথ সোয়েলস্ নয়। রয়্যাল হোটেলের সামনে রিক্সা যখন থামলো, তখনো পুরোদমে বক বক করে চলেছে সে। শুনতে শুনতে হাসি চেপে রাখা দায় হ'লো ভিকি কেমবারওয়েলের। রিক্সা থেকে নামার সময় নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারলো না। খিলখিল করে হেসে ফেললো, মাথাটা ঝাঁকি খাওয়ায় তার সোনালি চুল উড়তে শুরু করলো বাতাসে।

মেয়েদের হাসির মাপ নিতে জানে গ্যারেথ সোয়েলস্। হাসি যদি মিষ্টি, গভীর আর দীর্ঘস্থায়ী হয়, বুঝতে পারে অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে গেছে। রিক্সা থেকে নেমে ভিকি কেমবারওয়েলের কজি চেপে ধরলো সে, যেনো মহামূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজের হেফাজতে নিয়ে এলো।

‘রয়্যাল হোটলে একটাই মাত্র সুইট। ঝুল-বারান্দা থেকে বাগান দেখা যায়, সন্ধ্যার দিকে সাগরের বাতাস পাবে। আর বিছানাটা এত নরম, মনে হবে তুমি মেঘের উপর শুয়ে আছো। একা শোয়ার অভিজ্ঞতা এক রকম, কাউকে নিয়ে শোয়ার অভিজ্ঞতা অন্যরকম হবে।’

‘আমাকে কি এখানেই থাকতে হবে?’ ছোট্ট খুকির সরলতা নিয়ে প্রশ্ন করলো ভিকি।

‘ভাবছি দু’জনেরই যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে নেয়া কঠিন হবে না,’ বললো গ্যারেথ। ‘ও-সব তুমি ভেবো না, আয়োজনটা কী হবে আমার ওপর ছেড়ে দাও।’

ভিকির মনে কোনো সন্দেহ নেই, কী ধরনের আয়োজন করার কথা ভাবছে গ্যারেথ। ‘তোমার খুব দয়া, মেজর,’ বিড়বিড় করে বললো সে, ধীর পায়ে টেলিফোনটার দিকে এগুলো। রিসিভার তুলে বললো, ‘মিস কেমবারওয়েল বলছি। মেজর সোয়েলস্ তার সুইট খালি করছেন, রুম-সার্ভিস পাঠিয়ে তার জিনিসপত্র অন্য কোথাও সরাবার ব্যবস্থা করুন, প্লিজ।’

‘বলছিলাম কি...,’ মুখের হাঁ তাড়াতাড়ি বন্ধ করলো গ্যারেথ। মাউথপীসে হাতচাপা দিয়ে মিষ্টি করে হাসলো ভিকি কেমবারওয়েল। ‘সত্যি তুমি মহৎ পুরুষ, মেজর। মেয়েদের জন্যে ক’জন আজকাল এমন আত্মত্যাগ করতে জানে?’ তারপর সে মুখ ফিরিয়ে টেলিফোনে কথা বললো, ‘কী বললেন?’ আর কোনো ভালো কামরা নেই? ঠিক আছে, ঠিক আছে-মিঃ সোয়েলস্ কিছু মনে করবেন না- ধারণা করি, আমার জন্যে উনি কষ্টটুকু সানন্দে মেনে নেবেন।’

সিঁড়ির তলায় ওটা কামরা নয়, কবুতরের খোপের চেয়েও খারাপ। মুকডেন-এ চাইনিজ জেলখানা, অথবা, ১৯১৭-এর শীতে সমরাস্ত্রের ডাগ আউট এর চেয়ে বেশি খোলামেলা ছিলো।

পরবর্তী তিন দিন বন্দরে কাটালো গ্যারেথ, হারবার মাস্টারের অফিসে বসে চা খেলো, প্রতিটি সদ্য নোঙর ফেলা জাহাজের পাইলটের সাথে নিভূতে আলাপ করলো। সারা দিন ঘরামাঝ কলেবরে কাজে ব্যস্ত থাকলেও, সন্ধ্যার দিকে ফিটফাট বাবু সেজে ভিক্টোরিয়া কেমবারওয়েলকে সঙ্গ দিতে ভুল হয় না তার। ডিনারের সময় সিটি হোটেলের সবচেয়ে দামি খাবার আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলো সে। দেখা গেলো, প্রায় নির্লিপ্তভাবে সমস্ত কিছু হজম করে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েলের। গ্যারেথ তার প্রশংসা করলে মৃদু হাসির সাথে গ্রহণ করে সে, বিনয় বা ভদ্রতা দেখিয়ে মৃদু প্রতিবাদও করে না। সহজ সরল হাসির সঙ্গে গ্যারেথের কথা শোনে, আগ্রহের সাথে শ্যাম্পেনের স্বাদ নেয়, আন্তে ধীরে খালি করে ফেলে প্লেটগুলো। কিন্তু মাঝরাতের দিকে গ্যারেথ যখন তার সাথে স্যুইটে ঢুকতে চেষ্টা করে, অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে মুখের ওপর বন্ধ করে দেয় দরজা।

চার দিনের দিন সকালে, সঙ্গত কারণেই বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লো গ্যারেথ। তার ইচ্ছা হ'লো এক বালতি বিয়ার নিয়ে জেকের ক্যাম্পে যায়, বন্ধুর সাথে দু'দণ্ড কথা বললে মনটা হয়তো হালকা হবে। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলো, নিজের পরাজয়ের কথা জেকের কাছে স্বীকার করা উচিত হবে না, কাজেই ইচ্ছাটাকে গলা টিপে মারলো সে, রিক্সায় চেপে রওনা হ'লো বন্দরের দিকে।

রাতে নতুন একটা জাহাজ বহিঃনোঙ্গরে ভিড়েছে, চোখে বাইনোকুলাম তুলে সেটাকে খুঁটিয়ে দেখল গ্যারেথ। কিনারায় আর গায়ে লবণ জ'মে আছে, অত্যন্ত পুরনো, কোথাও কোথাও তোবড়ানো আর ভাঙা, এমনকি ক্রুদের চেহারাও বিশেষ সুবিধের নয়, তবে গ্যারেথের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়লো জাহাজটার রিগিং-এ কোনো খুঁত নেই। মাস্তুল দেখে বোঝা যায় বিশাল ক্যানভাস পাল ওড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে, অর্থাৎ প্রথম জীবনে পালতোলা জাহাজই ছিলো, পরে ডিজেল এঞ্জিন ফিট করা হয়েছে। হারবারে এ-পর্যন্ত যতো জাহাজ দেখেছে সে, সেগুলোর মধ্যে এটাকেই তার মনে ধরলো। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে ফেরিতে চড়লো সে। ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে এক শিলিং বেশি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো মাঝিকে।

কাছ থেকে আরো করুণ দেখলো জাহাজটাকে। রঙের ভেতর অন্য রং দেখা যাচ্ছে, খোলের গায়ে কাদাটে হলুদ বর্জ্য পদার্থের সচল ধরা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না স্যানিটারি ব্যবস্থা মাস্কাতা আমলের।

আরো কাছ থেকে জানা গেলো রঙচটা হলেও, প্রাক্ষিৎ-এ কোনো খুঁত নেই। স্বচ্ছ পানির নিচে খোলের তলাটাও পরিষ্কার দেখা গেলো-নিখাদ কপারের তৈরি, কোথাও জলজ সবুজ আগাছা জড়িয়ে নেই। জাহাজটার নাম হীরনডেল, সেইশেলস্-এ রেজিস্টার করা। দেখে মনে হয় ভাস্কাচোরা, বাতিল জিনিস, কিন্তু কাজের সময় ওটা একটা বুনো ঘোড়ার মতোই শক্তিশালী। এ-ধরনের জাহাজ সোনা, ড্রাগস, আদম সন্তান ইত্যাদি পাচার করার কাজেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়, জানা আছে গ্যারেথের। তার মন বলছে, ঠিক জাহাজটি খুঁজে পেয়েছে সে। অবৈধ মালামাল পাচার

করে এমন একজন পাইলটই তার দরকার। হাত তুলে নাড়ালো সে, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চিৎকার, 'আহয়, হীরনডেল!'

ক্রুরা রেলিংয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কোনো সাড়া দিলো না। চোখে বিদ্রোহ, হাবভাব মারমুখো, তাকিয়ে আছে ফেরির দিকেই। ক্রুদের মধ্যে চীনা, ভারতীয়, নিগ্রো রয়েছে, দু'একজন আরব-ও আছে।

হাত দুটাকে মুখের চারপাশে চোঙ বানালো গ্যারেথ, ইংরেজিতে বললো, 'তোমাদের ক্যাপটেনের সাথে কথা বলতে চাই।'

ক্রুদের মধ্যে সামান্য নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেলো। খানিকপর তাদের মাঝখানে একজন শ্বেতাঙ্গ উদয় হলো। রোদে পোড়া গ্রিক চেহারা, এতো বেঁটে যে কোনো রকমে ক্রুদের কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে মাথাটা। নিচের দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কী চাও তুমি? পুলিশ?'

গ্রিক না হয় আমেরিকান- গ্যারেথ ভাবে। লোকটার এক চোখে পট্টি বাঁধা, ফলে অপর চোখটা অত্যন্ত উজ্জ্বল আর চকচকে লাগলো। 'আরে না, পুলিশ হ'তে যাবে কেনো!' বললো গ্যারেথ। কোটের পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে দেখালো সে। 'বন্ধু!'

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে আরো কিছুক্ষণ গ্যারেথকে খুঁটিয়ে দেখল ক্যাপটেন। কে জানে, সে হয়তো ওর চোখে দুষ্টামির ঝিলিক আর ঠোঁটের কোণে লুটেরার হাসি দেখে থাকবে। রতনে রতন চেনে, কথাটা তো মিছে নয়। তার ভাব দেখে মনে হ'লো খুসি হয়েছে সে। আরবি ভাষায় কী যেনো বললো, ক্রুরা রশির সিঁড়ি নামিয়ে দিলো নিচে।

'উঠে আসুন,' আমন্ত্রণ জানালো ক্যাপটেন। কিছুই তার লুকোবার নেই। এবারের যাত্রায় শুধু তুলো বয়ে নিয়ে এসেছে বম্বে থেকে। অবশ্য দার-এস-সালামে তুলো খালাস করার পর, ক্রীতদাস তুলে নেবে উত্তর আফ্রিকা থেকে। যতোদিন পর্যন্ত ডানাকিল বা গালা গোত্রের রুগ্ন কালো মেয়েদের জন্যে আরব, ভারত এবং পূর্বের বণিকেরা মোটা টাকা দিচ্ছে, তার মতো লোকেরা ব্রিটিশ পেট্রোলশিপের তোয়াক্কা না করে কাজ চালিয়ে যাবে। জাহাজে পা দিয়েই গ্যারেথ ঘোষণা করলো, 'সামান্য হুইস্কির সাথে টাকা আয় করার পছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করবো আমরা। আমার নাম মেজর সোয়েলস্।'

'আমি পাপাডোপোলাস।' এই প্রথম হাসলো ক্যাপটেন। 'টাকা-পয়সার আলাপ আমার কাছে মিষ্টির মতো-ভারি পছন্দ করি।' সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

জেকের জন্যে উপহার সামগ্রী নিয়ে মেহগনি বনের ক্যাম্পে পৌঁছলো গ্যারেথ সোয়েলস্, সাথে ভিকি কেমবারওয়েল।

'সারগ্রাইজ, সারগ্রাইজ।' ব্যঙ্গাত্মক সুরে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালো জেক, ওয়েল্ডিং সেট হাতে নিয়ে সিঁধে হ'লো সে, টর্চটা থেকে এখোনো হিস হিস করে নীলচে আগুন বেরুচ্ছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা দুজন পালিয়েছো।'

‘আগে কাজ, তারপর ফুর্তি।’ ভিকির হাত ধ’রে রিক্সা থেকে নামলো গ্যারেথ।
‘বুঝলে, ওল্ড চ্যাপ, এই ক’দিন কঠিন ধকল গেছে আমাদের উপর দিয়ে।’

‘দেখতেই তো পাচ্ছি। প্রচণ্ড পরিশ্রমে তুমি অর্ধেক হয়ে গেছো।’ টর্চ নিভিয়ে
টুস্কার বিয়ারের বালতিটা নিলো জেক, দুটো বোতল শেষ করে ফেললো এক
নিমিষেই। বোতলের ছিপি খুলে একটা করে ওদের হাতে ধরিয়ে দিলো, কালি মাখা
খাকি শর্টস পরে আছে ও, উর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই।

বিয়ার খেয়ে বোতলটা নামালো, বললো, ‘তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো, কাজেই
তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম।’

‘আপনারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, মেজর সোয়েলস্ ও মিস কেমবারওয়েল,’
বলে ওদেরকে স্যালুট করলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। বিয়ারের একটা বোতল তার
কপালে জুটেছে।

‘কী ব্যাপার? কী করছিলে?’ ঘাড় ফিরিয়ে বড়সড় কাঠামোর দিকে তাকালো
গ্যারেথ, ওটাকে নিয়েই জেক আর গ্রেগোরিয়াস কাজ করছিলো।

জিনিসটার গায়ে হাত বুলালো জেক। ‘এটা একটা ভেলা।’ বাঁক আর খালি ড্রাম
দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ভেলাটা। ‘আর্মারড্ কার ভাসতে বা সাঁতার কাটতে জানে না
অথচ আমাদেরকে জাহাজ থেকে নামতে হবে তীরে পৌঁছানোর আগেই। উপকূলের যা
অবস্থা, জাহাজ সৈকতের কাছাকাছি যেতে পারবে না, আমরা ওগুলোকে ভেলায় চড়িয়ে
তীরে নিয়ে যাব।’

ভিকি কেমবারওয়েল জেকের কাঁধ আর বাহুর পেশিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে,
চোখ বুলালো ওর সমতল পেট আর বুক ঢেকে থাকা ঘন কালো লোমগুলোর ওপর।

গ্যারেথের মুগ্ধ দৃষ্টি এখনো ভোতা চেহারার ভেলার দিকে নিবদ্ধ। ‘ল্যান্ডিংয়ের
সমস্যা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম,’ বললো সে। ‘ঠিক এ-ধরনের একটা পরামর্শই আমি
তোমাকে দিতে যাচ্ছিলাম।’

জেকের তির্যক দৃষ্টিতে ক্ষীণ অবিশ্বাস। ‘দেখতে হবে জাহাজটায় যথেষ্ট শক্তিশালী
ডেরিক আছে কিনা, সেটা ভেলা পর্যন্ত কারগুলোকে পৌঁছে দিতে পারবে কিনা।’

‘ওগুলোর ওজন কতো?’

‘একেকটা পাঁচ টন।’

‘কোনো সমস্যা হবে না, হীরনডেল সামলাতে পারবে।’

‘হীরনডেল?’

‘ওই জাহাজেই যাচ্ছি আমরা।’

‘তার মানে সত্যি তুমি কাজ করছিলে!’ হেসে উঠলো জেক। ‘অবিশ্বাস্য! দেখা
যাচ্ছে তোমার ভেতর পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। কখন রওনা হচ্ছি আমরা?’

‘পরশু সকালে। কার্গো লোড করবো রাতে, চাই না কেউ দেখে ফেলুক।’

‘তাহলে তো বেশি সময় নেই, মিস কেমবারওয়েল,’ ব’লে এবার ভিকি
কেমবারওয়েলের দিকে ফিরলো জেক। ‘মনে আছে, একটা আর্মারড্ কার চালাতে
হবে? গাড়ি চালাতে জানলেও, আরো কিছু শিখতে হবে তোমাকে।’

‘আপাতত আমার সবটুকু সময় নিতে পারো তুমি, আর শেখার ব্যাপারে আমার আশ্রয়েরও কোনো শেষ নেই।’ দার-এস-সালামে ভিকি কেমবারওয়েলের এই যাত্রা বিরতি ক্লাস্ত আর উত্তেজিত নার্ডগুলোকে বিশ্রাম পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে, এর আগের জেনেভা অ্যাসাইনমেন্টটায় সাংঘাতিক ছুটোছুটি করতে হয়েছিল তাকে। গত ক’টা দিন দার-এস-সালামের প্রাচীন বন্দরে ঘোরাফেরা করেছে সে, বন্দরের জন্ম আর ইতিহাস সম্পর্কে দু’হাজার শব্দের একটা ছোট্ট ফিচার লিখেছে। সেই সাথে তার প্রতি মেজর সোয়েলসের গভীর মনোযোগও উপভোগ করেছে সে, সংকটময় মুহূর্তগুলোর ছলনা আর চাতুরির সাহায্যে লোকটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও তার কাছে কৌতুককর একটা খেলা বিশেষ ছিলো। এখন জেক বারটনের মনোযোগ ওর দৃষ্টি কাড়লো। দুই কঠিন পাত্র, বিপজ্জনক এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর, নিজেদের সমস্ত পৌরুষ নিয়ে যদি কোনো মেয়ের পিছু নেয় বা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, মেয়েটির জন্যে এরচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতা আর কী হ’তে পারে? জেকের চোখে চোখ রেখে হাসলো ভিকি—জেক সাড়া দিতে উপভোগ করলো মুহূর্তটি, উপভোগের মাত্রা বেড়ে গেলো হতাশায় ভেঙে পড়তে পড়তে বাধা দেয়ার জন্যে গ্যারেথকে ছুটে আসতে দেখে।

‘তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার দরকার কী,’ জেককে বললো গ্যারেথ। ‘তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছো, ওটা থেকে তোমাকে সরাতে চাই না। ভিকিকে যা শেখাবার আমিই শেখাবো।’

ভিকি কেমবারওয়েল মাথা ঘোরালো না, জেকের দিকে তাকিয়ে হাসতেই লাগলো। ‘কিন্তু আমার যেনো মনে হচ্ছে, ডিপার্টমেন্টটা মিঃ জেক বারটনের।’

‘জেক,’ বললো জেক।

‘ভিকি,’ বললো ভিকি।

গোটা ব্যাপারটা, কোনো সন্দেহ নেই, চমৎকার উতরে যাচ্ছে। নির্জলা সত্য হলো, এটা একটা পিছু ধাওয়ার কাহিনী, দু’জন পুরুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর সেই সাথে বহু কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত ভিকি কেমবারওয়েলের চারিত্রিক সুনাম আরেকটু বাড়িয়ে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ। ভিকি কেমবারওয়েলের জানা আছে, তার পেশায় নিয়োজিত আর কোনো মেয়ে একটা রিপোর্ট তৈরির খাতিরে দু’জন অস্ত্র চোরাচালানীর সাথে মেলামেশা করবে না, বা অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরোবে না—অতো সাহস তাদের কারো নেই। এখন দেখার বিষয়, সতেজপ্রাণ ষাঁড় দুটোকে ঠিক মতো সে সামলাতে পারে কিনা। তার নিজের ভাবাবেগেরও লাগাম টেনে রাখার দরকার আছে। আর বিপদ, সে তো ঘটতেই পারে। বিপদ আছে বলেই না জীবন এতো রোমাঞ্চকর।

মেহগনি বনের ভেতর দিয়ে ঐক্যেবঁকে এগিয়ে যাওয়া সরু পথ ধ’রে হাঁটছে ওরা। জেক আর গ্যারেথকে তার পাশে জায়গা পাবার জন্যে অস্থিরতা প্রকাশ করতে দেখে গোপনে হাসলো ভিকি কেমবারওয়েল। তবে ফাঁকা জায়গাটায় পৌছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো গ্যারেথ।

‘এ-সব কী?’ জিজ্ঞেস করলো সে।

‘নতুন রঙ। গ্রেগোরিয়াসের আইডিয়া,’ ব্যাখ্যা করলো জেক। ‘গুলি ছোঁড়ার আগে প্রতিপক্ষকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে।’

দুধ-সাদা চকচকে চেহারা পেয়েছে আর্মারড্ কারগুলো, টারিটে আগুনরঙা ক্রস চিহ্ন।

‘ফ্রেশ বা ইতালিয়রা যদি থামতে ব’লে আমাদের, নিজেদের পরিচয় দেবো ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রসের সদস্য বলে-ওগুলো আর্মারড অ্যান্ডুলেন্স। তুমি, গ্রেগোরিয়াস আর আমি ডাক্তার ভিকি সিস্টার।’

‘সত্যি কাজ করছিলে তুমি।’ মুখ হ’লো ভিকি।

‘সাদা রঙ গাড়ির ভেতরটাও ঠাণ্ডা রাখবে,’ বললো গ্রেগোরিয়াস।

‘র্যাকের ডিজাইন আমি তৈরি করেছি,’ বললো জেক। ‘টারিটের পিছনে প্রতিটি গাড়িতে থাকবে চল্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিনের দুটো ড্রাম, পানির একটা ড্রাম। অস্ত্র আর গোলাবারুদের বাস্তুগুলো সমান চার ভাগে ভাগ করে চারটে গাড়িতে রাখা হবে।’ আর্মারড্ কারের গায়ে রশি দিয়ে বাঁধা র্যাকগুলো এই মুহূর্তে খালি।

‘ভেবেছো রেডক্রস বললেই পার পেয়ে যাবে?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ। ‘বাস্তুগুলো দেখামাত্র ফাঁস হয়ে যাবে সব, প্রত্যেকটার গায়ে লেবেল সাঁটা আছে...।’

‘সব ছিঁড়ে ফেলে মেডিকেল সাপ্লাইয়ের নতুন লেবেল লাগানো হবে,’ ব’লে ভিকির দিকে ফিরলো জেক। ‘তোমার জন্যে একটা গাড়ি আলাদা করে রেখেছি, দেখবে এসো। চারটের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বাধ্য আর... আর লক্ষ্মী।’

‘ওগুলোর আবার নিজস্ব চরিত্রও আছে নাকি?’ হালকা গলায় বিদ্রূপ করলো ভিকি।

‘ঠিক মেয়েদের মতোই ওরা, আমার লৌহমানবীরা।’ কাছের একটা আর্মারড্ কারে মৃদু চাপড় দিলো জেক। ‘এটা সবচেয়ে শান্ত, সুবোধ বালিকা-শুধু ওর সাসপেনশন-টা একটু বাঁকা হয়ে আছে, গতি খুব দ্রুত হলে নিতম্ব বাঁকায়, এই যা। তবে সিরিয়াস কিছু নয়, যদিও এ-কারণেই ওর নাম দেয়া হয়েছে রঙ্গিলা। ওটা তোমার। দেখবে, ভালো না বেসে পারবে না।’ এগিয়ে পাশের গাড়ির সামনে দাঁড়ালো জেক, লাথি কষলো টায়ারে। ‘এটা যেমন অস্থির তেমনি পাজি, প্রথমবার ক্রাঙ্ক ঘোরাতেই আরেকটু হলে আমার কজি ভেঙে দিয়েছিল। ওর পরিচয়, প্রিন্সিলা দ্য পিগ্। একমাত্র আমার পক্ষেই ওকে সামলানো সম্ভব। আমাকে ও ভালোবাসে না, তবে শ্রদ্ধা করে।’ সামনে এগোলো ও। ‘নিজের জন্যে এটা বেছে নিয়েছে গ্রেগোরিয়াস, নাম টেনাসটেলিন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায়, আমার দেয়া নাম- ভরসা। ভবিষ্যতেই জানা যাবে তিনি আমাদের সহায় কি না। আর গ্যারেথ, এটা তোমার জন্যে-এতে রয়েছে আনকোরা নতুন একটা কারবুরেটর। আমার ধারণা, এটাকে ভোগ দখল করার অধিকার একা তুমি সংরক্ষণ করো, কারণ কারবুরেটরটা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তোমাকে।’

‘তাই?’ গল্লের গন্ধ পেয়ে ভিকির চোখ দুটো আত্মহে জ্বলজ্বল করে উঠলো। ‘কী ঘটেছিল?’

‘সে এক লম্বা কাহিনী,’ নিঃশব্দে হাসলো জেক। ‘উটের পিঠে চড়ে দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার দুঃসাহসিক অভিযান।’ চুরুর টের ধোঁয়া গলায় আটকে যাওয়ায় খক্ খক্ করে

কাশতে শুরু করলো গ্যারেথ, তবু ব'লে চললো জেক, 'কাজেই ওটার নাম দেয়া হয়েছে হেনরিয়েটা দ্য হাম্প।'

'হাউ ভেরি কিউট।' ভিকির কণ্ঠনিঃসৃত হাসি মর্মরধ্বনির মতো বাজলো জেকের কানে।

মাঝরাতের খানিক পর ঘুমন্ত শহরের নির্জন রাস্তায় উঠে এলো চারটে আর্মারড কার। হেডলাইটের সামনে ইস্পাতের শাটার নামানো রয়েছে, ফলে আলোর স্রু একটা ফালি শুধু নিচের দিকে সামনেটা আলোকিত করেছে। গতি খুব মন্থর, সামান্যই শব্দ করছে এঞ্জিন। রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি, মাথার ওপর ডালপালা আর পাতা আড়াল করে রেখেছে তারাগুলোকে।

গায়ে-মাথায় একাধিক বোঝা থাকায় গাড়িগুলোর আকৃতি বদলে গেছে। ড্রাম, কাটের বাস্র, রশির কুণ্ডলি, ট্রেঞ্চিং টুল, আর ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট-ওগুলোর ভিড়ে আর্মারড কার চেনাই দায়।

কনভয়ের সামনে রয়েছে মেজর সোয়েলস্, সদ্য দাড়ি কামিয়ে ধূসর রঙের প্যান্টের ওপর সাদা জ্যাকেট চড়িয়েছে সে। দার-এস-সালাম ত্যাগ করার এই বিশেষ মুহূর্তটিতে কিঞ্চিৎ উদ্ভিগ্ন গ্যারেথ। রয়াল হোটেলের মালিক কেনোভাবে যদি টের পেয়ে যায়। বেশি না, তিন সপ্তাহের স্যুইট ভাড়া আর তিনবেলা করে আহার গ্রহণ ও মদ্যপানের বিল বাকি পড়েছে তার। সন্দেহ নেই একবার সাগরে পৌঁছুতে পারলে হয়, রয়াল হোটেলে কবে কী খেয়েছে বা ক'দিন কোথায় শুয়েছে সব ভুলে যাবে সে। অনেক দিন আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্, জীবনটাকে আনন্দময় করে তুলতে হলে নিজের ব্যর্থতাগুলো যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করতে হয়।

গ্যারেথের পিছনে রয়েছে গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। নিজের গোত্রে তার একটা সামরিক পদ আছে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, বাম শাখার কমান্ডার। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে রয়েছে সে, তবু নিজেকে নিয়ে তার গর্বের পরিসীমা নেই, কারণ এরইমধ্যে ছোটোখাটো যুদ্ধে এবং শিকারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, গেছে দু'একটা সিংহ শিকারে, রাইফলে তার হাত সম-বয়েসীদের ঈর্ষার কারণ। শহরের ভেতর দিয়ে কনভয় নিয়ে যাওয়ার সময় চোখ দুটো বিপুল উত্তেজনায় চকচক করছে তার, দেশ তথা গোত্রপ্রেমে উজ্জীবিত, জানে নিজের এলাকায় পৌঁছানোর আগে একের পর এক বহু বিপদ পেরোতে হবে তাদের, নিতে হবে মৃত্যুর অথবা দীর্ঘ কারাভোগের ঝুঁকি। বলাই বাহুল্য, যুদ্ধের মতো নোংরা ও অকারণ রক্তঝরা ব্যাপারটা তার কাছে এখনো গৌরবের এবং পুরুষোচিত বীরত্বের কাজ।

তার পিছনে রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, রঙ্গিলাকে সতর্ক দক্ষতার সাথে চালাচ্ছে। এঞ্জিনের ভাষা ঠিক মতো বুঝতে পারছে মেয়েটা, হালকা ছোঁয়ায় ক্লাচ, স্টিক

দুই কাজে মনটা দুই ভাগ হয়ে গেলেও, মনের গভীরে অজানা বিপদের আশঙ্কা সতর্ক করে রেখেছে জেককে। এমন রাত আগেও এসেছে, অন্ধকার রাতে এক সারিতে অবিরাম এগিয়ে যাওয়া— কানে এঞ্জিনের ছন্দোবদ্ধ শব্দ— কিন্তু তখন মাথার উপরের আকাশে তারাদের মেলা ছিলো, নাকে ছিলো মৃত্যু আর কাদার গন্ধ, দূরগত ম্যাক্সিম গানের গুলির শব্দ ছিলো সবসময়ের সঙ্গী। জেক বারটন যুদ্ধ চেনে, শ্বেগোরিয়াস মারিয়ামের মতো অনভিজ্ঞ নয় সে।

জেটি থেকে খানিক দূরে, জাহাজঘাটায় অপেক্ষা করছিল পাপাডোপোলাস, পড়নে হাঁটুঢাকা ওভারকোট, হাতে ল্যাম্প। ল্যাম্প নেড়ে সংকেত দিলো সে, সামনে এগোতে বললো কনভয়টাকে। পাথুরে জাহাজঘাটায় হীরনডেলের তুরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে রুক্ষকঠিন চেহারা নিয়ে। হাবভাব আর কাজের দক্ষতা দেখে বুঝতে অসুবিধে হ'লো না, রাত দুপুরে সন্দেহজনক কার্গো লোড করতে তারা অভ্যস্ত।

একটা করে গাড়ি সামনে এগিয়ে থামলো, গা থেকে খুলে নেয়া হ'লো ড্রাম আর বাক্সগুলো। ওগুলো তোলা হ'লো কার্গো নেটে, ডেরিকের সাহায্যে জাহাজে উঠে গেলো নেট। এপর গাড়িটার তলায় কাঠের তক্তা ঢোকানো হলো, মোটা রশি দিয়ে তক্তার সাথে বাঁধা হ'লো চেসিস, পাপাডোপোলাসের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে উইঞ্চের এঞ্জিন চালু হলো, ধীরে ধীরে ভারি বোঝা নিয়ে শূন্যে উঠে গেলো ডেরিক।

কাজটা শেষ হ'লো প্রায় নিঃশব্দে, অপ্রয়োজনীয় একটা কথাও বললো না কেউ। 'ব্যাটারা নিজেদের কাজ বুঝে,' ফিসফিস করলো গ্যারেথ, জেকের কাঁধে টোকা দিলো। 'আমি যাই, হারবার মাস্টারের কাছ থেকে কাগজ পত্র নিয়ে আসি। ঘন্টা-খানেকের মধ্যে রওনা হবো।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

গ্যাংপ্ল্যাক্স ধ'রে উঠে এল জেক, ভিকি কেমবারওয়েলের হাত একটা হাত ধ'রে আছে সে। 'চলো, থাকার কী ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখে আসি।' ডেকে উঠে আসতে, ক্রীতদাস বহনের আলামত সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ পেলো ওরা।

ক্যাপটেনের সাথে কথা ব'লে জানা গেলো, অতিরিক্ত কেবিন মাত্র একটাই আছে, ওদের সবাইকে সেখানে মাথা গুজতে হবে।

খানিক পর হারবার মাস্টারকে দুশো শিলিং ঘুষ দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে ফিরে এল গ্যারেথ। কাগজে দেখা গেলো, আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে চারটে আর্মারড অ্যান্ডুল্যাস আর মেডিকেল সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছে ওরা, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তরফ থেকে।

জেক বললো, 'মাত্র ক'টা দিনেরই ব্যাপার, সবাই আমরা ডেকে কাটিয়ে দিতে পারবো। আর যদি বৃষ্টি আসে, গাড়িতে ঢুকে পড়লেই হবে।'।

জাহাজের রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে দার-এস-সালাম বন্দরের আলো ধীরে হারিয়ে যেতে দেখলো ওরা। পায়ের নীচে গর্জন ছাড়ছে স্কুনারের ডিজেল এঞ্জিন; খোলা সমুদ্রের বিস্তৃত বাতাস এসে ধুয়ে নিয়ে গেলো দাস বহনকারী দুর্গন্ধ।

চোখে মুখে নক্ষত্রের কোমল উজ্জ্বলতা নিয়ে ঘুম ভাঙলো ভিকি কেমবারওয়েলের, চোখ মেলেই তারাভরা মুক্ত আকাশ দেখে কী এক আনন্দে মনটা ভরে গেলো তার, পূব আকাশ থেকে সবেমাত্র পালাতে শুরু করেছে অন্ধকার। গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দাঁড়ালো সে, পা টিপে টিপে রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলো।

নানা রঙের আলো মেখে বিচিত্র চেহারা পেয়েছে সাগর। প্রতিটি ঢেউ যেনো নিরেট ও মহামূল্যবান কোনো ধাতু থেকে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে, নক্ষত্রের আলোকছটা অলংকার হিসেবে ছড়িয়ে রয়েছে গায়ে। জাহাজের পিছনে আলোড়িত পানি যেনো সবুজ আগুন হাত আর চুলে, মুখ আর গলায় প্রেমিকের আদরমাখা স্পর্শের মতো সাগরের বাতাস, মাথায় ওপর বিশাল পাণ্টা ফিসফিস করছে। রাতের এই রূপ দেখতে দেখতে হাঁটু ধঁরে গেলো ভিকি কেমবারওয়েলের, অদ্ভুত একটা পুলকে অবশ্য হয়ে এলো সারা শরীর।

নিঃশব্দ পায়ে গ্যারেথ যখন এগিয়ে এলো, দাঁড়ালো তার পিছনে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তার কোমর, সে এমনকি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালোও না, বরং হেলান দিলো ওর গায়ে। তর্ক বা ব্যঙ্গ করার কোনো ইচ্ছাই তার হ'লো না। কথাটা তো আর মিথ্যে লেখে নি সে, দু'চার দিনের মধ্যে মারা যেতে পারে। অথচ এতো সুন্দর রাত জীবনে আর হয়তো না-ও আসতে পারে।

কেউ ওরা কথা বললো না, তবে গ্যারেথের হাত চোরের মতো সন্তর্পণে ব্লাউজের ভেতর ঢুকছে বুঝতে পেরে কেঁপে উঠলো ভিকি কেমবারওয়েল। ওর ছোঁয়া, বাতাসের মতোই, কোমল আর আদরমাখা।

পাতলা কাপড় ভেদ করে গ্যারেথের গরম শরীরের আঁচ ভিকির চামড়া যেনো পুড়িয়ে দেবে। বুঝতে পারছে ভিকি, অস্বিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস করছে গ্যারেথ।

আলিসনের ভেতর থেকেই ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো ভিকি, মুখ তুলে তাকালো গ্যারেথের চোখে। সামনের দিকে চাপ দিয়ে ভিকির সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হ'লো গ্যারেথ, সাড়া দিলো ভিকিও-দুটো শরীর জোড়া লেগে এক হয়ে গেলো। গ্যারেথ চুমো খেতেই পুরুষালি গন্ধে নেশা ধঁরে গেলো ভিকির, বুঝতে পারলো এখনি যদি সাবধান না হয় পরে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না।

মনের সমস্ত দৃঢ়তা আর সংযম একত্রিত করতে হলো, মুখ নামিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো ভিকি। খানিকটা জোর খাটাতে চেষ্টা করলেও, গ্যারেথ তাকে ধঁরে রাখতে ব্যর্থ হলো। ঘুরে দাঁড়ালো ভিকি, দ্রুত ফিরে এলো নিজের চাদরের কাছে। কাঁপা হাতে সেটা তুললো সে।

জেক আর থ্রেগোরিয়াসের মাঝখানে সাবধানে চাদরটা বিছালো ভিকি, কোনো শব্দ না করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। এখনো হাঁপাচ্ছে সে, চেষ্টা করছে নিজেকে শান্ত করতে। আর ঠিক এই সময় টের পেলো, জেক বারটন জেগে আছে।

চোখ বুজে রয়েছে জেক, নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভিকি জানে, জেগে আছে ও।

নিজের অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে আসমারা শহরের দিকে তাকিয়ে আছে বিশালবপু জেনারেল এমিলিও ডি বোনো। তাকিয়ে রইলেন দূরের ইথিওপিয়া হাইল্যান্ডের দিকে। ঠিক যেনো ড্রাগনের মেরুদণ্ড— কেঁপে উঠে ভাবলেন তিনি।

সত্তর বছর বয়স জেনারেলের; শেষ যে ইতালিয়ান সেনাবাহিনী ওই পর্বত অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, তার কথা পরিষ্কার মনে আছে তার। আদোয়া নামটি এখনো ইতালিয় সেনাবাহিনীর কলঙ্ক হিসেবে পরিগণিত হয়, এখনো, এই চল্লিশ বছর পরেও আধুনিক ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর সেই পরাজয়ের কথা কেউ ভুলে যায় নি।

আর এখন, নিয়তি তার উপর প্রতিশোধ নেয়ার ভার দিয়েছে। জেনারেল ডি বোনো অবশ্য নিশ্চিত নন, তিনি এই কাজের জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তি কিনা। কাউকে আঘাত না করে যুদ্ধ জেতা সম্ভব হ'লে তাই করতেন জেনারেল। খাটাখাটনি, ব্যথা-বেদনা দুচোখে দেখতে পারেন না ডি বোনো। কোনো নির্দেশ গ্রহণকারীর জন্যে বিশ্বাসপূর্ণ হ'লে বরং সেটা বাদ দেবেন তিনি। যদি কোনো অপারেশনে কারো একটু ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তো সেটা বাদ। তার অধঃস্তনেরাও ব্যাপারটা জানে।

মূলত, হৃদয়ে কূটনীতিবিদ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডি বোনো। যুদ্ধ তার বিষয় নয়। হাসিমুখ দেখতে ভালোবাসেন তিনি, নিজেও হাসেন বেশ। স্বতঃস্ফূর্ত, জ্ঞানী ছাগলের মতো দেখতে, খাটো খোঁচা খোঁচা দাড়ির কারণে 'ছোট্ট দাড়িওয়ালা' অভিধাও জুটেছে কপালে। নিজের অফিসারদের 'ক্যারো' এবং ফাই-ফরমাশ খাটাদের ডাকেন 'ব্যাম্বিনো' নামে। চান সবাই ভালোবাসুক তাকে, তাই হাসেন এবং কারো হাসির কারণ হ'তে চান।

এখন অবশ্য হাসছেন না জেনারেল। সকালে বেনিটো মুসোলিনি স্বাক্ষরিত একটা কোডেড টেলিগ্রাম পেয়েছেন, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কঠোর ছিলো সেটার ভাষা। 'ইতালির রাজার ইচ্ছেয় আমি, মুসোলিনি, সেনাবাহিনীর প্রধান এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছি—'

আচমকা নিজের বুকের মেডালে চাপড় দিলেন জেনারেল ডি বোনো। তার সামনে ব'সে থাকা ক্যাপ্টেন ফ্রেসপি চমকে উঠলো।

'ওরা বুঝছে না,' তিক্তস্বরে ব'লে উঠলেন জেনারেল। 'রোমে ব'সে থেকে যেনো তেনো নির্দেশ দেয়া এক কথা, আর এইখানে, এই মারিব নদীর ওপারে শত্রুবাহিনীর দিকে তাকিয়ে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।'

জেনারেলের পাশে চ'লে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ক্যাপ্টেন। আসমারার সেনাবাহিনী যে ভবনে রয়েছে সেটি দোতলা, উপরের তলায় জেনারেলের অফিস থেকে সেই পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত চমৎকার দেখা যায়। শত্রুবাহিনীর অবশ্য তেমন কোনো লক্ষণ চোখে পড়লো না ক্যাপ্টেনের। ঝকঝকে সূর্যালোকে শূন্য প'ড়ে আছে ভূমি। বিমান পর্যবেক্ষণও জানিয়েছে, কোথাও ইথিওপিয়াদের সংঘবদ্ধ কোনো তৎপড়তা নেই। নির্ভরযোগ্য ইন্টেলিজেন্স সূত্র মোতাবেক জানা গেছে, সম্রাট হাইলে

সেলাসি সীমান্তের পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত কোনো ইথিওপিয়াকে যেতে নিষেধ আরোপ করেছেন, যাতে করে ইতালির সৈনিকেরা সামনে এগুনোর কোনো রকম অযুহাত না পায়।

‘ওরা বুঝছে না, এইখানে, এই ইরিত্রিয়া আমার অবস্থান সুসংহত করা প্রয়োজন। একটা শক্ত ভিত্তি এবং সাপ্লাই ট্রেন প্রয়োজন আমার,’ দুঃখ ঝরে পড়লো ডি বোনার কণ্ঠ থেকে। গত এক বছরের বেশি সময় ধরেই নিজের অবস্থান সুসংহত করে সাপ্লাই পেয়ে আসছেন তিনি। মাসাওয়া বন্দর নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। ইতালির মালামাল পরিবহনের জন্যে সুয়েজ খাল খোলা, নির্বিঘ্নে দক্ষিণে যেতে পারছে তারা, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে।

আজ পর্যন্ত, প্রায় তিন মিলিয়ন টন মাল এসেছে, এর মধ্যে পাঁচ মিলিয়ন যুদ্ধাস্ত্র বাদ— ট্রপ ট্রান্সপোর্ট, আরমারড কার, ট্যাঙ্ক এবং বিমান— ইতিমধ্যেই তীরে পৌঁছেছে এগুলো। এতো বিশাল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র চলাচলের জন্যে দারুণ রাস্তা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে।

আবারো নিজের বুক চাপড়ে সঙ্গী ক্যাপ্টেনকে চমকিত করলেন জেনারেল ডি বোনো। ‘এই মুহূর্তে আমাকে এগুনোর নির্দেশ দিয়েছেন তারা। কিছুতেই বুঝছে না, আমার বাহিনী এখনো অপরাধী।’

যে বাহিনীকে জেনারেল অপরাধী বলছেন, আফ্রিকার বুক এর চেয়ে শক্তিশালী বাহিনী আগে কখনো একত্র করা হয় নি। তিনশো ষাট হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে রয়েছেন তিনি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত তারা— ক্যাপরোনি সিএ ১৩৩, তিন এঞ্জিনের মনোপ্লেন যা দুই টন হাই এক্সপ্লোসিভ এবং বিষাক্ত গ্যাস নয়শো মাইল এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম, সেই বিমান থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক আর্মার্ড কার। ভারী আর্মার যুক্ত সিভি ৩ ট্যাঙ্ক, সঙ্গে ৫০ মিমি গান এবং হেভী আর্টিলারি।

মারিব নদীর উপরে, পাথুরে জমিনে এই মুহূর্তে অবস্থান নিয়ে আছে তারা। সবুজ রঙের আর্মির নিয়মিত পোশাক, চওড়া কানওয়ালা ট্রপিক্যাল হেলমেট; কালো শার্ট পরিহিত ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ারা পরেছে উঁচু বুট, ক্রস স্ট্রাপ, সঙ্গে ঝকঝকে ব্যাজ আর চকচকে ছোরা। কলোনিয়াল সোমালি এবং ইরিত্রিওরা পরে আছে লাল ফেজ টুপি আর ঢোলা জামা, রঙ-বেরঙের সামরিক পোশাক—খালি পা। সবশেষে, মরুর ভবঘুরে স্বেচ্ছাসেবকের দল, যুদ্ধের খবর পেয়ে রক্তপিপাসু হায়নার মতোই জড়ো হয়েছে তারা।

জানা থাকা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার আমলেই নিচ্ছেন না জেনারেল ডি বোনো, সত্তর বছর আগে মাত্র হাজার পঞ্চাশেক সৈন্য নিয়ে ম্যাগডালা অতিক্রম করেছিলেন ব্রিটিশ জেনারেল নেপিয়ার; সমগ্র ইথিওপিয়ান আর্মিকে পরাভূত করে পর্বতের উপরের জেলখানা থেকে মুক্ত করেছিলেন সমস্ত ইংরেজ বন্দী। তার কল্পনায় এ ধরনের বীরোচিত কোনো কিছু করবার কথা কখনো আসে নি।

‘ক্যারো,’ সঙ্গী ক্যাপ্টেনের স্বর্ণখচিত ব্যাজের উপর, কাঁধে হাত রাখলেন ডি বোনো। ‘ডুসে’কে একটা জবাব পাঠাতে হবে আমাদের। এই অভিযানের ঝুঁকির কথা

তাকে বোঝাতে হবে।' কাঁধে চাপড় দিতে দিতে ক্রমশ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার। মনে মনে কথা সাজিয়ে নিচ্ছেন।

'সম্মানিত প্রাণপ্রিয় নেতা, আপনার এবং মাতৃভূমি ইতালির প্রতি আমার আনুগত্যের ব্যাপারে সুনিশ্চিত থাকুন।' দ্রুত একটা মেসেজ প্যাড হাতে নিয়ে বাক্যগুলো লিখতে শুরু করে ক্যাপ্টেন। 'নিশ্চিত থাকুন, দিন-রাত অতদ্রুত প্রহরীর মতোই সচেষ্ট আমি—'

প্রায় দুই ঘণ্টার সৃজনশীল প্রচেষ্টায় অবশেষে অভিযান শুরু না করার ব্যাপারে নিজের মতামত লিখতে সমর্থ হলেন জেনারেল ডি বোনো।

'এখন,' পায়চারী থামিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন তিনি ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে। 'যদিও সশস্ত্র সামরিক অভিযান শুরুর জন্যে এখনো প্রস্তুত নই আমরা, তবে দক্ষিণের উদ্দেশ্যে একটা বাহিনী রওনা করিয়ে দিলে এল ডুসে' খুশি হবেন বই কি।'

দক্ষিণে আক্রমণের ব্যাপারে জেনারেলের ধ্যান-ধারণা পূর্ববর্তী সময়ের মতোই যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মূল আক্রমণ চালাতে হবে আদোয়া'র কেন্দ্রে। আগের বারের পরাজয়ের অপমান ইতালিয়রা ভুলে যায় নি।

কিন্তু উঁচু পার্বত্য এলাকার প্রবেশদ্বারে আলাদা ভাবে সাহায্যকারী একটা দল পাঠানোর ব্যাপারেও ভেবেছেন তিনি। জায়গাটার নাম সারডি গিরিসংকট-বিশাল মরুভূমির মাঝখানে সরু একটা ফাটল আরো বিস্তৃত হয়ে দুর্গম পাহাড়শ্রেণীকে দু'ভাগ করেছে। সমতল মরু থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে রয়েছে মালভূমি, ওখানে পৌঁছতে হলে এই গিরিপথ ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনো সহজ পথ নেই। সামরিক দিক থেকে সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে এই গিরিপথের। ওটা দখলে থাকলে ইতালির সেনাবাহিনী সহজেই ইথিওপিয়া সাম্রাজ্যের ভেতর ঢুকতে পারবে। আর এই সারডি গিরিসংকট দখল করতে হলে প্রথমে দখল করতে হবে গিরিসংকটে পৌঁছানোর রাস্তাটা। পরিকল্পনা সফল করতে হ'লে প্রথমে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে গিরিখাদ অভিযুখে, অতিক্রম করতে হবে বহু মাইল শুষ্ক, তপ্ত মরু।

দেয়ালে ঝোলানো পূর্ব আফ্রিকার লার্জ-স্কেল ম্যাপটার দিকে এগুলেন জেনারেল ডি বোনো, পর্বতের নিচের শূন্যতার উপর কোনো এক স্থানে আইভরি পয়েন্টারটা রাখলেন।

'ওয়েলস্ অব চান্ডি,' জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন তিনি। 'কাকে পাঠানো যায়?'

সামনের কাগজ থেকে মুখ তুলে নির্জন সেই এলাকার চারপাশের মরু পর্যবেক্ষণ করলেন ক্যাপ্টেন।

বহু বছর ধ'রে আফ্রিকা বসবাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, ওই কথার কী অর্থ। মাত্র একজনের নামই মাথায় এলো তার।

'বেলি,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'আহ,' যেনো খুশি হলেন জেনারেল ডি বোনো। 'কাউন্ট আলদো বেলিনি- আগুন খেঁকো।'

‘ভাড়া,’ চট করে ব’লে বসলেন ক্যাপ্টেন ফ্রেসপি।

‘আহা, ক্যারো,’ মৃদু ভর্তুকি করলেন জেনারেল, তার সঙ্গীকে। ‘ও রকম করে ব’লো না। কাউন্ট একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেট, লন্ডনের সেইন্ট জেমস কোর্টে দীর্ঘ তিনবছর রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। অত্যন্ত ধনী এবং সম্মানিত পরিবার থেকে এসেছেন।’

‘ও ব্যাটা একটা আস্ত রিপুক,’ একগুঁয়ের মতো বললেন ফ্রেসপি। ‘দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবারে জেনারেল।’

‘বেনিটো মুসোলিনির একজন ব্যক্তিগত বন্ধু তিনি। এল দুসে তার ক্যাসেলে নিয়মিত যাতায়াত করেন। রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট আছে তার—’

‘ও রকম একটা দুর্গম জায়গায় কেঁদে কুল পাবে না ব্যাটা কাউন্ট,’ ক্যাপ্টেনের কথা শুনে আবারো বড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনারেল ডি বোনো।

‘দয়া করে মহান কাউন্টকে ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করো, ক্যারো।’

হেডকোয়ার্টার্স ভবনের সিঁড়িপথে দাঁড়িয়ে কাউন্ট বেলিনিকে আমন্ত্রণ জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন ফ্রেসপি।

উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে এলো কাউন্ট আলদোর রোলস-রয়েস। সন্ধ্যায় আবছা আলোয় গাড়িটার হেডলাইট রাস্তার বিক্ষারিত চোখের মতো লাগলো, আকাশ-নীল বডিতে মিহি ধুলোর প্রলেপ লেগে রয়েছে। পাঁচ বছর রোজগারের টাকা এক করলেও এ-ধরনের একটা গাড়ি কিনতে পারবে না ক্যাপ্টেন ফ্রেসপি, কাউন্টের প্রতি তার বিদ্রোহের সেটাও একটা অন্যতম কারণ।

আলদো বেলিনি, বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক, ইতালির পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির একজন, নিজের বেতনের টাকার ধার ধারেন না; কোথাও দু’পা যেতে হলেও রোলসরয়েস ছাড়া তার চলে না। প্রস্তুতকারকরা তার রুচিমারফিক তৈরি করে দিয়েছে গাড়িটা।

মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মাস্কাতা আমলের পাথরের তৈরি দালানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো রোলস-রয়েস। ফ্রেসপি লক্ষ্য করলো, গাড়ির গায়ে ক্ষতচিহ্নের মতো অসংখ্য স্টিকার সাঁটা রয়েছে, সবচেয়ে বড়টি দরজার গায়ে, তাতে লেখা—‘সাহস-ই আমার অস্ত্র এবং ভূষণ।’

গাড়ি থামতেই বানরতুল্য ছোটোখাটো একজন মানুষ, পড়নে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম, লাফ দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়লো। কাঁকরের ওপর একটা হাঁটু গেড়ে বেটপ আকৃতির ক্যামেরাটা চোখে তুললো সে, ভয়ানক অস্থির এবং সতর্ক-জানে, জেনারেল ডি বোনের সাথে কাউন্টের দেখা করতে আসার এই দুর্লভ মুহূর্তটির ছবি ঠিকমতো তুলতে না পারলে তার নিতম্বের দফারফা হয়ে যাবে।

ড্রাইভার দরজা খুলে অপেক্ষা করছে, ভেতরে বসে গাড়ি থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে কাউন্ট আলদো। সতর্কতার সাথে ঠিকঠাক করে নিলো কালো বেরেটটা। বড়

ভাঁড়, আবারো তিক্ত মনে ভাবলেন ক্রেসপি। একহাত বাড়িয়ে হাস্যমুখে হ্যান্ডশ্যাক করলেন। 'ডানকালি মরুতে মাছির ঝাঁকের মধ্যে গিয়ে ছবি তোলা গে, যাও। অথবা, চান্ডির কুয়োয় উটের গু-মুত গুঁকো।' মনে মনে বললেন ক্যাপ্টেন। মুখে, 'এই পথে, কর্নেল, দয়া করে এই পথে আসুন।'

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে দুর্গম ইথিওপিয় পর্বত পর্যবেক্ষণ করছিলেন ডি বোনো, কাউন্টের আগমনের শব্দে ঘুরে তাকালেন।

'ক্যারো,' হেসে বললেন জেনারেল। দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। 'মাই ডিয়ার কাউন্ট, আপনি এসেছেন ব'লে আমি আনন্দিত।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিস্ট স্যালুটে জেনারেলকে চমকে দিলো কাউন্ট। 'আমার দেশ এবং আমার রাজার জন্যে যে কোনো সেবায় সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে আমি পিছ বা হবো না।' চমৎকার ভাষা, পরে আবার ব্যবহারের জন্যে মনে গেঁথে রাখা দরকার, নিজেকে পরামর্শ দিলো সে।

শান্তভাবে, মৃদু হেসে, জেনারেল ফাদ বাধা দিলো তাকে, 'আলোচনার আগে দু'টোক হুইকি খেলে হতো না, মাই ডিয়ার কাউন্ট আলদো?' তিক্ত ওষুধ খাবার আগে একটু মিষ্টি ওটা। ডানাকিল প্রদেশে যে কেউকে পাঠাতে দারুণ কুণ্ঠা বোধ করেন জেনারেল। এইখানে, এই আসমারায় এতো গরম, ডানাকিল প্রদেশে না জানি কী হবে। আসার সাথে সাথে কাজের কথা ব'লে কাউন্টকে চমকে দিতে চান না তিনি।

'আমার মনে হয়, রোম ছাড়ার আগে ওখানকার সাম্প্রতিক খবরা-খবর আপনি শুনেছেন?'

'জি, জেনারেল। ডুসে'র পার্টিতে আমি ছিলাম সেই রাতে।' ঝকঝকে হাসলেন কাউন্ট, শিথিল বোধ করছেন খানিকটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওয়াইন ঢেলে নিলেন ডি বোনো। 'হা! কী জীবন! এই জংলী এলাকায় যে কতোদিন ধ'রে প'ড়ে আছি...'

অবশেষে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন জেনারেল, আসল কথা পাড়বার জন্যে। নিজের নির্দেশ উচ্চারণ করলেন তিনি।

'ওয়েলস অব চান্ডি,' পুনরাবৃত্তি করলো কাউন্ট, হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো চেহারা। লাফ দিলো সে, টেবিলের কোণায় কোমরের ধাক্কা লাগায় হুইকির বোতল আর গ্লাস মেঝেতে পড়ে গেলো। উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করলো সে, উদ্ধত ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে তার চিবুক, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে মুখের রঙ। 'সম্মান হারানোর আগে মৃত্যুও শ্রেয়।' গর্জে উঠলো সে, মদ তাকে ভালোভাবেই ধরেছে।

'উত্তেজিত হবেন না, কাউন্ট,' অভয়দানের সুরে বললো জেনারেল ফাদ। 'আপনাকে আমি শুধু একটা অরক্ষিত ওয়াটার হোলে পজিশন নিয়ে পাহারায় থাকতে বলছি, তার বেশি কিছু না।'

কিন্তু কাউন্ট তার কথা শুনতে পেয়েছে ব'লে মনে হ'লো না।

'আপনি আমাকে বীরত্ব প্রদর্শনের এই বিরাট সুযোগ দেয়ায় আমি ধন্য! এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার বিকল্প যদি মৃত্যুও হয়, তা-ও আমি বরণ করে নেবো।' নতুন একটা

চিত্তা মাথায় ঢুকতে পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ‘আপনি অবশ্যই আমাকে আর্মার আর এয়ারক্রাফট দিয়ে সাহায্য করবেন, জেনারেল?’

‘ও সবের কোনো দরকার আছে ব’লে আমি মনে করি না, ক্যারো’ মৃদু কণ্ঠে বললেন ডি বোনো, বীরত্ব আর মৃত্যুর প্রসঙ্গ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে। কিন্তু এমন কিছু তিনি বলবেন না, যাতে আহত হয় কাউন্ট। ‘ওখানে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।’

‘কিন্তু শত্রুকে ছোটো করে দেখা উচিত নয়,’ বললো কাউন্ট। ‘যদি বাধা পাই?’

চেয়ার ছেড়ে কাউন্টের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল ডি বোনো, তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনার কাছে তো রেডিও আছেই, সাহায্য দরকার হলে জানাবেন আমাকে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হ’লো কাউন্ট। চোখে জ্বলছে দেশপ্রেমের আলো।

‘আওয়ারস ইজ দ্য ভিক্টরি,’ হুংকার ছাড়লো সে, সাথে সাথে প্রতিধ্বনি তুললেন জেনারেল। অকস্মাৎ চরকির মতো আধপাক ঘুরে গিয়ে দরজার দিকে ছুটলো কাউন্ট, হাঁক ছাড়লো, ‘জিনো!’

গলায় মস্ত ক্যামেরা ঝুলিয়ে দরজার আড়ালে এই ডাকের আশাতেই লুকিয়ে ছিলো জিনো, বক্রিশ পাটি দাঁত বের করে উদয় হ’লো সে, ব্যস্ত হাতে ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করছে।

জেনারেল ডি বোনের কজি ধ’রে জানালার দিকে টেনে নিয়ে চললো কাউন্ট। ‘আশা করি, জেনারেল কিছু মনে করবেন না? এখানে আলো বেশি।’ জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে পোজ নিলো সে।

‘দু’জন আরো ঘনিষ্ঠ হোন, প্রিজ। একটু পিছিয়ে যান, জেনারেল, প্রিজ—মহামান্য কাউন্টকে আপনি আড়াল করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। চিবুকটা, মাই কাউন্ট, একটু উঁচু করুন। বাহ, চমৎকার!’ হতচকিত ছোট্ট দাঁড়িঅলা জেনারেলের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে, শাটার টিপে দিলো জিনো।

কালো পোশাকের আফ্রিকা ব্যাটালিয়নের সিনিয়র মেজর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষ।

লড়াই লড়ে অভ্যস্ত সে, রেগুলার আর্মির সম্মানিত পদ থেকে মিলিশিয়া বাহিনীতে নিজের স্থানান্তরকে মোটেও ভালোভাবে নিলো না। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে সে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে, কিন্তু ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্স থেকে আসা নির্দেশ তাকে মানতেই হবে। ডিভিশন্যাল জেনারেল, কাউন্ট আলদো বেলিনি’র বন্ধু মানুষ, কাজেই কথা রেখেছেন তিনি। কাউন্টকে তো জেনারেল চেনেন, একজন সত্যিকারের যোদ্ধা তার সাথে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা জেনারেলের তালিকায় এক নম্বরে স্থান পেয়েছে। সমগ্র ইতালিয়ান বাহিনীতে অন্যতম সত্যিকার যোদ্ধা হ’লো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। একবার যখন মেজর নিশ্চিত হ’লো, তার নতুন পদ মেনে না নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, অবিন্যস্ত মিলিশিয়া বাহিনীকে বিন্যস্ত করার কাজে লেগে পড়লো সে।

বিশাল আকৃতির মানুষ মেজর, ধূসর খাটো চুল, শিকারী কুকুরসদৃশ মুখ, বহু লড়াইয়ের ছাপ পড়েছে তাতে। মৃদু বাতাসেও বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর।

বলা যায়, একক প্রচেষ্টায় বাহিনীতে কিছুটা হ'লেও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হ'লো মেজর ক্যাস্টেলানি। সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেক আগে মার্চ করে এগুনোর জন্যে তৈরি হ'লো মিলিশিয়া বাহিনী। ছয়শো নব্বই জন সৈনিক, সাথে মোটর ভেহিকেল আসমারার সদর রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরি। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে যার যার গ্রেটকোট আঁকড়ে ধ'রে নিশ্চুপ ব'সে রইলো যোদ্ধারা, মোটর সাইকেল চালকেরা কাউন্টের রোলস রয়েসের দুই পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে। অনিশ্চিত ভাব পুরো বাহিনীতে।

ইতিমধ্যে মিলিশিয়া বাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, অন্ত্যস্ত বিপজ্জনক একটা মিশনে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে। মেস সার্জেন্ট নাকি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁউমাউ করে কান্নাকাটি করেছেন কাউন্ট আলদো, জুনিয়র অফিসারদের সাথে মদ্যপানের সময় তিনি নাকি তাঁর ভাবাবেগ চেপে রাখতে পারেন নি। 'অসম্মানের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়,' বাহিনীর শ্লোগান ছিলো তার ঠোঁটে।

রোদ ওঠার পর গ্রেটকোট কূলে ফেলতে হলো, সৈনিকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার অবস্থা, অথচ এখনো যাত্রা শুরুই আদেশ আসছে না। কে যেনো একবার বলেছিল, যুদ্ধ হ'লো শতকরা নিরানব্বুই ভাগ একঘেষেই, এক ভাগ চরম আতংক। থার্ড ব্যাটালিয়ান নিরানব্বুই ভাগের যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

সময় গড়িয়ে চললো। দুপুরের দিকে তৃতীয় বারের মতো কর্নেলের কোয়ার্টারে বার্তাবাহক পাঠালো মেজর। এবারই প্রথম একটা উত্তর পেলো সে—কাউন্ট নাকি সত্যি সত্যি বিছানা ত্যাগ করেছেন, এবং প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার অবশ্যপালনীয় কাজটি প্রায় শেষ করে এনেছেন। একটু পরই তিনি থার্ড ব্যাটালিয়ানের সাথে যোগ দেবেন।

অবশেষে উদ্ভিত সূর্যের মতো কাউন্টের আগমন ঘটলো—চেহারা উত্তেজনা উদ্ভাসিত, বুক ফুলে আছে গর্বে। তার দু'পাশে দু'জন ক্যাপটেন, সামনে একজন রাইফেলধারী সৈনিক। জুনিয়র অফিসারদের আলিঙ্গন করলো কাউন্ট আলদো, চটপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেললো জিনো। সিনিয়র নন কমিশনড অফিসারদের আলিঙ্গন নয়, তাদের শুধু পিঠ চাপড়ে দিলো কাউন্ট, আর সাধারণ সৈনিকদের দিকে ফিরে উপহার দিলো উষ্ণ হাসি। সবশেষে মেজরের দিকে ফিরে বললো, 'সুশৃঙ্খল বীর যোদ্ধাদের দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।'

আঁতকে উঠলো মেজর। কাউন্টের প্রায়ই গান গাইতে ইচ্ছে করে। ইতালির বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা তাকে গান শিখিয়েছেন, পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগে, শিশু কাউন্টের তখন ভারি ইচ্ছে হতো অপেরায় যোগ দেবে। চর্চা না থাকায় তার গলা আর ভেড়ার ডাকে এখন আর তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী সে, রণক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতির বিশাল অঙ্গন, সবখানে তার অনায়াস পদচারণা। ফ্যাসিস্ট সঙ্গীত 'লা গিওভিনেজ্জা' গাইতে লাগলো কাউন্ট, তার সাথে অফিসারসহ ছ'শো নব্বুইজন সৈনিকও গাইলো।

গান থামার সাথে সাথে খাপে ভরা ছোরার হাতলে হাত রেখে চোঁচিয়ে উঠলো কাউন্ট, 'যথেষ্ট হয়েছে। যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত। ম্যাপটা কোথায়?' ম্যাপ কেস নিয়ে ছুটে এলো একজন অধস্তন।

‘কর্নেল, স্যার,’ লুইগি কৌশলে বাধা দিলো, ‘রাস্তা আমাদের সবারই চেনা, সাইনপোস্টও আছে....।’ এছাড়া, সঙ্গে দুইজন আদিবাসী পথ-প্রদর্শক নিয়েছি, চোখ বুজে চিনে নিতে পারবে পথ।’

মেজরকে পান্তা না দিয়ে রোলস-রয়েসের বনেটের ওপর সদ্য ভাঁজ খোলা ম্যাপের দিকে ঝুঁকে পড়লো কাউন্ট। কয়েক সেকেন্ড পর মুখ তুললো সে, ক্যাপটেন দু’জনের দিকে তাকালো। ‘তোমরা দু’জন আমার দু’দিকে দাঁড়াও। মেজর ভিটো, তুমি এখানে। চেহারায় এমন ভাব ফোটাও যাতে দেখে মনে হয় তুমি একটা নির্দয় গোঁয়ার। কিন্তু খবরদার, ক্যামেরার দিকে তাকাবে না!’

জিনো ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়েই ছিলো। ফটো তোলার পর রওনা হ’লো ট্রাক বহর। কলামের সামনে রোলসরয়েস, দু’পাশে মোটরসাইকেল আউটরাইডার, ডানাকিল মরুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো কাউন্ট।

তার এই নির্দেশকে ভুলবশত এগুনোর আহ্বান মনে করে সামরিক হুক্কার ছেড়ে সৈন্যবহর আগে বাড়ার ঘোষণা করলো লুইগি ক্যাস্তেলানি। কিন্তু না, দেড় মাইল এগোবার পর কাউন্টের নির্দেশে দাঁড়িয়ে পড়লো রোলস-রয়েস। কারণ আর কিছুই নয়, রাস্তার ধারে ক্যাসিনোর ওপর চোখ পড়েছে তার। রোলস-রয়েসের সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো পিছনের ট্রাক বহর-ও।

সবাই জানে কয়েকজন ইতালিয়ান চালায় ক্যাসিনোটো, ছ’মাসের চুক্তিতে ইতালি থেকে যুবতী মেয়েদের নিয়ে আসা হয়, নারীবর্জিত পরিবেশে উতলা হয়ে উঠা হাজার হাজার সৈন্যের অতি ব্যবহারে বিধ্বস্ত মেয়েগুলোর মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যকই চুক্তি নবায়নে রাজি হয়। তবে এই ছ’মাসে যৌতুক দেয়ার মতো যথেষ্ট টাকা জমা হয় তাদের হাতে, দেশে ফিরে স্বামী খোঁজার জন্যে অস্থির হয়ে থাকে।

ক্যাসিনোয় ঢুকে বার-এর আসন গ্রহণ করলো কাউন্ট আলদো বেলিনি। হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এলো ম্যানেজার। বারকয়েক গোঁফ মুচড়ে কাউন্ট তাকে বললো, ‘তুমি জানো আমি কী চাই।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিজেদের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েগুলো। খানিক পর দেখা গেলো তাদের মাঝখানে অদৃশ্য হয়েছে আলদো, নারীদেহের কোমল স্তপে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে সে।

এক ঘণ্টা পর ক্যাসিনো থেকে কাউন্টের একটা মেসেজ পেলো মেজর লুইগি। আঁকাবাঁকা হরফে কাউন্ট লিখেছে, ‘এই মুহূর্তে আমি ভয়ানক ব্যস্ত। কাল ভোরে আবার আমরা অগ্রসর হবো।’

পরদিন সকাল দশটায় আবার আসমারা থেকে থার্ড ব্যাটালিয়ান যাত্রা শুরু করলো। কাউন্ট স্বকণ্ঠে কোনো নির্দেশ দিতে পারছে না, কারণ কাল রাতে দীর্ঘ সময় গান গাওয়ায় তার গলা ভেঙে গেছে, কথা বলতে চেষ্টা করলে ইঁদুরের ডাক ছাড়া কিছুই

বেরুচ্ছে না। আকার-ইঙ্গিতে কাজ সারছে সে। এই মুহূর্তে তাকে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থও বলা যায়, কারণ গান গাওয়ার ফাঁক ফাঁকে রাতভর মদ্যপান করেছে সে। তাছাড়া, শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বলও হয়ে পড়েছে—দুটো মেয়েকে দু'পাশে নিয়ে শুলে যা হয়, তাও আবার ইতালিয়ান মেয়ে।

তার মাথার উপর ছাতা ধ'রে রোলসের পিছনের সিটে ব'সে রয়েছে জিনো। কাউন্টকে এমন ভাব-গম্ভীর দেখে অভ্যস্ত নয় সে। কাজেই গতদিনের মতো এখনো যুদ্ধ সম্পর্কে তাকে উৎসাহ দিতে সে ব'লে উঠলো, 'ভেবে দেখুন, কাউন্ট। সমস্ত ইতালিয় সেনাবাহিনীর মধ্যে আমরাই প্রথম শত্রুর মখে মুখি হ'তে যাচ্ছি। রক্তপিপাসু বর্বরদের সাথে প্রথম সংঘর্ষ আমাদের সাথেই হবে।'

বমির ভাবের সাথে সাথে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কাউন্ট। হঠাৎই ভাবনাটা এলো মনে— ৩৬০,০০০ সৈনিকের বিশাল ইতালিয় বাহিনীর মধ্যে তিনিই প্রথম শত্রুর উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছেন। আদোয়া'র ভয়ংকর গল্পগুলো এক এক করে মনে পড়ে যেতে লাগলো তার। সবচেয়ে ভয়াবহ গল্পটি হ'লো, ইথিওপিয়রা ধরা-পরে যাওয়া শত্রুদের বিঁচি কেটে ফেলে! মনে হ'লো, তার উরুসন্ধির ভাঁজে লুকিয়ে থাকা মহৎ সদস্যদ্বয় পর্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়লো এই ধারণায়।

'স্টপ!' চিৎকার করলো সে। 'এই মুহূর্ত থামো।'

ট্রাক বহর দাঁড়িয়ে পড়লো। জুনিয়র অফিসাররা হেঁচ গুরু করলো। তাদেরকে পিছনে ফেলে রোলস-রয়েসের দিকে ছুটে এলো মেজর লুইগি। কাউন্টের তরফ থেকে তাকে জানানো হলো, যুদ্ধযাত্রার কৌশলে টেকনিক্যাল পরিবর্তন আনার জন্যে নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কাউন্ট এখন আর থার্ড ব্যাটালিয়ানের সামনে থাকবে না, ট্রাক বহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করবে সে, রোলস-রয়েসের দু'পাশে থাকবে ছ'জন মোটরসাইকেল আউটরাইডার।

নতুন আয়োজন সম্পূর্ণ হ'তে এক ঘণ্টার মতো লাগলো। আবার অগ্রসর হ'লো থার্ড ব্যাটালিয়ান। রোলস-রয়েসের নরম আসনে গা এলিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কাউন্ট আলদো। সামনে তিনশো পঁয়তাল্লিশ জোড়া বিঁচি রেখে নিশ্চই তার দিকে আক্রমণ করতে আসবে না ইথিওপিয়রা। তার তলপেটের কাছে এখন আর কোনো রকম অস্বস্তিকর অনুভূতি নেই।

আসামারা থেকে কেবল তিপাল্লো কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে সক্ষম হ'লো সেদিন ইতালিয় বাহিনী। দু'জন মোটর সাইকেল আরোহীকে জেনারেল ডি বোনের কাছে নিজের অগ্রযাত্রা এবং দায়িত্ববোধের সম্পর্কে লিখে পাঠালো কাউন্ট। ফিরতি পথে তার জন্যে বরফ সমৃদ্ধ পানীয় নিয়ে আসবে তারা।

পরদিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে আলদো বাহিনী ধু-ধু মরুভূমির কিনারা থেকে আবার যাত্রা শুরু করলো। সামনের মাটি পাথরের মতো শক্ত আর আসমান, এখানে সেখানে কিছু বিবর্ণ শুকনো ঘাস ছাড়া গাছপালার কোনো চিহ্ন নেই। মরুভূমির দূর

প্রান্ত ক্রমশ উঁচু হয়ে দিগন্তরেখার সাথে মিশেছে, ফলে কাউন্টের মনে হ'লো তারা যেনো বিশাল একটা পিরিচের মাঝখানে রয়েছে। লালচে পাথুরে মাটিতে মস্ত কোনো খাবা-র আঁচড় যেনো পথটা, এতোই গভীর যে মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা অংশের সাথে রোলস-রয়েসের চেসিস খানিক পরপরই ঘষা খাচ্ছে। কনভয়টা পিছনে ফেলে আসছে লালচে ধুলোর বিশাল মেঘ।

ধু-ধু মরুপ্রান্তের বিপদের কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে সাহস ফিরে এলো কাউন্টের মনে। 'কলামের মাথায় চলো,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো সে। কলামের মাঝখান থেকে বেরিয়ে ট্রাক বহরকে পাশ কাটাতে শুরু করলো দ্রুতগতি রোলস-রয়েস। খানিক পর সামনে দেখা গেলো মেজর ক্যাস্তেলানিকে, রোলস-রয়েস তাকে তীরবেগে পাশ কাটালো, স্যালুটের জবাবে মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালো কাউন্ট। তার জানার কথা নয়, মনে মনে তাকে গাল দিচ্ছে মেজর।

আবার কাউন্টের কাছে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগলো মেজরের। সে দেখলো, রোলস-রয়েসের বনেটে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে কাউন্ট, চোখে বাইনোকুলার, আক্ষরিক অর্থেই বনেটের ওপর ধৈই ধৈই করে নাচছে সে, জিনোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে, 'রাইফেল, আমার রাইফেল!'

লেনার কেস থেকে ম্যানলিকার নাইন পয়েন্ট থ্রি এম এম স্পোর্টিং রাইফেলটা বের করলো জিনো, ওটার বাঁট ও স্টক সজিন করা ওয়ালনাটের তৈরি, আর নীল ইস্পাতের গায়ে চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে রচিত হয়েছে শিকারের কিছু ক্ষুদে দৃশ্য-ঘোড়সওয়ার শিকারী, শিকারী কুকুর ধাওয়া করছে হিংস্র সিংহকে। চোখ থেকে বাইনোকুলার না নামিয়েই মেজরকে নির্দেশ দিলো কাউন্ট। রেডিওর এরিয়াল লম্বা করো, জেনারেল ডি বোনোকে মেসেজ পাঠাও। সারডি গিরিসংকটে পৌঁছানোর সব ক'টা পথ অচিরেই আমরা দখল করে নেবো। মেজরকে আরো একটা কাজ করতে হবে। ক্যাসিনো থেকে কাঠের মিহি গুঁড়োয় মুড়ে কয়েক মণ বরফ নিয়ে আসা হয়েছে, তা থেকে খানিকটা বের করে এক বালতি পানি ঠাণ্ডা করা হোক। কাউন্টের ধারণা, পরবর্তী পদক্ষেপ যেটা সে নিতে যাচ্ছে, তাতে বেশ খানিকটা ঘাম ঝরবে তার, ফলে পিপাসা মেটানোর জন্যে ঠাণ্ডা পানির দরকার হবে।

মেটে রঙের একদল মরু হরিণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কাউন্ট। এক মাইল দূরে ওগুলো, তাপ-তরঙ্গের ভেতর ঝাপসা দেখাচ্ছে, শান্ত ভঙ্গিতে ক্রমশ আরো দূরে সরে যাচ্ছে ঝাঁকটা। দূর আকাশের গায়ে খাড়া শিংগুলোই শুধু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কাউন্ট।

কাউন্টকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলো রোলস-রয়েস, ইতিমধ্যে তার হাতে রাইফেলটা ধরিয়ে দিয়েছে জিনো। দূরত্ব কমে সিকি মাইল দাঁড়ালো, তবে ধাওয়া করা হচ্ছে বুঝতে পেরে হরিণের দলটাও ছুটতে শুরু করেছে। ড্রাইভারকে ফাঁসিতে লটকানো হবে, বারবার ঘোষণা করলো কাউন্ট মৃত্যুদণ্ড পেয়েও আরো জোরে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করলো লোকটা। কাউন্ট ভীষণ উত্তেজিত, আফ্রিকায় আসার পর এই প্রথম সে বড় একটা কিছু শিকার করার সুযোগ পেয়েছে। মোট আটটা হরিণ, ঝাঁকের সামনে

রয়েছে দুটো মর্দা, মাদী আর বাচ্চারা রয়েছে পিছনে। দূরত্ব ক্রমশ কমে এলো। সামনের একটা ধাড়ী কে জানে কেনো পিছিয়ে পড়েছে দল থেকে। সেটাকেই ধাওয়া করার জন্যে বেছে নিলো কাউন্ট। হরিণটার বিশ গজ পাশে চলে এলো গাড়ি। ওদের দিকে ওটা একবারও তাকালো না, তবে প্রাণপণে ছুটছে।

‘হল্ট!’ গর্জে উঠলো কাউন্ট, সাথে সাথে ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো ড্রাইভার। ধুলোর পাহাড় তুললো রোলস-রয়েস, ঢাকা পড়ে গেলো গাড়ি। ধুলো সরে যাবার পর দেখা গেলো ধাড়ী হরিণটা প্রায় তিনশো গজ দূরে সরে গেছে, এখনো দলের অনেক পিছনে ওটা, তবে আগের মতোই ছুটছে। গর্বিত ভঙ্গিতে গুলি করলো কাউন্ট, প্রথম গুলিটা মিস হ’লেও পরেরটা সঁধিয়ে গেলো হরিণের বুকে, ডিগবাজী খেয়ে প’ড়ে গেলো ওটা। আবারো সামনের হরিণের ঝাঁকের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগলো রোলস রয়েস।

দূরের, প্রায় রেঞ্জের বাইরের একটার গায়ে লাগালো কাউন্টের বুলেট। ছিটকে পড়লো হরিণটা। পড়েই লাফ দিলো ওটা, শুকনো একটা নালা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো উঁচু পাড়ের ওদিকে। পেলভিসের কয়েক ইঞ্চি সামনের স্পাইনাল কলাম গুঁড়ো হয়ে গেছে ওটার, শরীরের পিছনের দিকটার কোনো সাড়া নেই, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে।

নালা পেরিয়ে উঁচু পাড়ের কিনারা দিয়ে উঁকি দিকেই হরিণটাকে পড়ে থাকতে দেখলো কাউন্ট। তাড়াতাড়ি সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে, দাঁতে দাঁত চেপে তাড়া লাগালো জিনোকে। আলদোর হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এলো, নাটকীয় ভঙ্গিতে শিংসহ মাথার দিকে সেটা তাক করে পোজ নিলো সে। ছবি তোলার জন্যে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলো জিনো।

ঠিক এই সংকটময় মুহূর্তে নড়ে উঠলো হরিণটা, বসার ভঙ্গিতে উঁচু হলো, ঘোলাটে দৃষ্টি হলে তাকালো কাউন্টের দিকে। স্থানীয়ভাবে ওগুলোকে বেইসা বলা হয়, আফ্রিকার হিংস্রতম প্রজাতির অন্যতম, লম্বা শিং দিয়ে এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক সিংহকেও বধ করতে পারে। এই ধাড়ীটার ওজন চারশো পঞ্চাশ পাউন্ড, কাঁধ পর্যন্ত চার ফুট লম্বা, তার ওপর আরো তিন ফুট লম্বা তার শিং।

আহত হরিণটা নাক টানলো, পোজ দেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ডাইভ দিলো কাউন্ট, মাটিতে পড়ে ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে ছুটলো গাড়ির দিকে। তাকে ধাওয়া করলো হরিণটা।

দৌড় প্রতিযোগিতায় ছ’ইঞ্চি এগিয়ে থাকলো কাউন্ট, রোলস-রয়েসের ব্যাকসিটে উঠে কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলো সে, দু’হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলো, চোখ বন্ধ। গাড়ির গায়ে গুঁতো মারলো হরিণ, ভেতর দিকে খুবড়ে গেলো একটা দরজা, শিঙের খোঁচায় গা থেকে রক্ত উঠে গেলো।

শুধু শরীরের চাপ দিয়ে ধরণীর ভেতর সঁধিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে জিনো, হুবহু সাইরেনের মতো ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। গাড়িতে স্টার্ট দিলো ড্রাইভার, কিন্তু পরবর্তী ধাক্কায় উইন্ডশীল্ডে লেগে তার মাথা কেটে গেলো। রক্তাক্ত

ড্রাইভার কাঁদো কাঁদো সুরে অনুনয় করলো, ‘ওটাকে মারুন, মাই কাউন্ট! গুলি করুন, প্লিজ! দানবটাকে হত্যা করুন!’

কাউন্টের পেছনটা আকাশমুখী হয়ে রয়েছে। গাড়ির পিছনের সিটের ওপর তার শুধু ওইটুকু অংশই দেখা যাচ্ছে। তবে তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সবাই, ‘রাইফেল, আমার রাইফেল।’

বুলেটটা মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে দিয়ে ফুসফুসটাকেও ফুটো করেছে, ছুটোছুটি করায় হঠাৎ ওটার একটা বড় শিরা ছিঁড়ে গেলো। যন্ত্রণায় কাতর একটা শব্দ করে কাত হয়ে পড়ে গেলো ওটা, নাকের ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুলো।

নির্জন মরুপ্রান্তরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অনেকক্ষণ পর পিছনের দরজার পাদানির কাছে কাউন্টের ফ্যাকাসে মুখ দেখা গেলো, চোখে আতংকে নিয়ে মৃত হরিণটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা নড়ছে না দেখে আশ্বস্ত হ’লো সে। সতর্কতার সাথে রাইফেলটার খোঁজে এদিক ওদিক হাত বাড়ালো। এতোই কাঁপছে তার হাত, এতো কাছ থেকেও ছ’টার মধ্যে দুটো গুলি লাগাতে পারলো না। তার মাথায় এই চিন্তাটা একাবরও ঢুকলো না যে মরাটাকে মারছে সে। লক্ষ্যবস্তু বুলেট দুটো একটুর জন্যে মাটিতে পড়ে থাকা জিনোর গায়ে লাগলো না।

রাইফেল ফেলে দিয়ে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক কি যেনো খুঁজলো কাউন্ট। খানিকটা সামনে ছোটো একটা ঝোপ দেখতে পেয়ে সেদিকে হাঁটা ধরলো সে। হাঁটছে দু’পা ফাঁক করে, ভঙ্গিটা ভারি আড়স্ট। অবশ্য তার একটা কারণ আছে। মরে গেলেও কথাটা কারো কাছে স্বীকার করবে না কাউন্ট আলদো। মনোপ্রাণ করা তার সিদ্ধ আভ্যারওয়্যার নোংরা হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে ওটাকে বিসর্জন না দিলেই নয়।

সন্ধ্যার সময় বাহিনীর মধ্যে আবারো ফিরে এলো তোবড়ানো রোলস রয়েস। বনেটে লেগে আছে অ্যান্টিলোপের রক্ত—সৈনিকদের উচ্ছ্বাস উপভোগ করলো কাউন্ট। জেনারেল ডি বোনের কাছ থেকে রেডিও মেসেজ এসেছে তার জন্যে। কোনো তাগাদা নয়, জেনারেল তাগাদা দিতে জানেন না, তবে কাউন্টকে তার বিশ্বস্ত তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে গতি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন ডি বোনো।

পাঁচশো শব্দের একটা উত্তর লিখে পাঠালো তাকে কাউন্ট, শেষ করলো এইভাবে, ‘বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।’ এরপর, হরিণের ঝলসানো কলজে খেতে চললো সে।

হীরনডেলকে সামলানোর দায়িত্ব মুসলিম নাবিকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্যাপটেন পাপাডোপোলাস। পরপর পাঁচদিন তার কেবিন থেকে প্রায় বেরুলোই না, মেজর গ্যারেথ সোয়েলসের সাথে রামি খেলায় মশগুল হয়ে থাকলো। ‘জীবনে আর কী আছে,’

প্রস্তাবটা গ্যারেথই তাকে দেয়, ‘এসো, সমুদ্রভ্রমণের একঘেয়েমি দূর করার জন্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা যাক।’ এক পাটি তাস সব সময় তার পকেটেই থাকে।

পাঁচ দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় পাপাডোপোলাসের মন খুঁতখুঁত করতে লাগলো। ভালো কার্ড বারবার শুধু মেজরই পাবে কেনো? কিন্তু সর্বনাশ যা ঘটান তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, আর কিছু করার নেই। এমনও নয় যে চৌর্যকর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে, কিসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবাদ জানাবে সে?

ঠিক হয়েছিলো কার্গো ও আরোহীদের ভাড়া বাবদ ক্যাপটেনকে দুইশো পঞ্চাশ স্টার্লিং দিতে হবে। পুরোপুরি সেই পরিমাণ জেতার পর ক্যাপটেনের মুখের ওপর গাল ভরা বিজয়ের হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গ্যারেথ বললো, ‘তুমি কি বলো, পাপ, ওল্ড স্পোর্ট, সাময়িক বিরতি দিলে হতো না? ডেকে গিয়ে একটু হাত-পা নাড়া যেত?’

খেলতে বসার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ায় খোলা ডেকে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে গ্যারেথ, ওখানে ভিকি কেমবারওয়েল আর জেক বারটনের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার মাত্রা তার মানসিক প্রশান্তির জন্যে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে যতোবারই ক্যাপটেনের কেবিন থেকে সে খোলা ডেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, প্রতিবার ওদের দু’জনকে একসাথে দেখেছে। শুধু একসাথে দেখে নি, হো-হো হি-হি করে হাসতেও শুনেছে—আরো খারাপ লক্ষণ হলো, জেকের চেয়ে বেশি হেসেছে ভিকি, শরীর কাঁপানো স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। জেককে বেশির ভাগ সময় কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছে গ্যারেথ। হয়তো আর্মারড্ কারগুলো স্টার্ট দিয়ে পরীক্ষা করছে, না চাইতেই সাহায্যের জন্যে ওর গা ঘেষে দাঁড়িয়েছে ভিকি, যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিচ্ছে। আবার কখনো নেই কাজ তো খই ভাঁজ, মাঝখানে থ্রেগোরিয়াসকে নিয়ে ডেকের ওপর বসেছে দু’জন, গভীর অধ্যবসায়ের সাথে অ্যামহারিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা চলেছে। সন্দেহের কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে গ্যারেথের মনে, না জানি আরো কতো কী করছে ওরা।

তবে কোন কাজটা কতোটুকু জরুরি গ্যারেথ জানে, জানে কোনটা আগে সারতে হবে। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিলো পাপাডোপোলাসের কাছ থেকে ভাড়ার টাকাগুলো উদ্ধার করা। সেটাতে সফল হওয়ায় এখন সে ভিকি কেমবারওয়েলের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে। জেকের কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনা তার জন্যে কোনো সমস্যাই নয়। অবশ্য মেয়েটা খুব কঠিন পাত্রী, নিজের ফাঁদে ঠিকমতো ফেলতে হলে আদাজল খেয়ে লাগতে হবে। কাজটায় খাটনি আছে, তবে পুরস্কারের কথাটাও ভাবো একবার—গাছ ভর্তি ভাঁসা পেয়ারা।

‘তোমার সাথে খেলে সত্যি ভারি মজা পেলাম, পাপা,’ চেয়ার ছেড়ে উঠলো গ্যারেথ, পুরোপুরি সিধে হ’তে সময় নিচ্ছে সে—নোটগুলো তাড়াতাড়ি দু’হাত দিয়ে দু’পকেটে ভরছে।

ক্যাপটেনও তার ঢোলা জোকার নিচে গলিয়ে দিলো। হঠাৎ বেরিয়ে এলো অলংকৃত হাতলসহ লম্বা একটা ছুরি, মাথার দিকটা বিপজ্জনক আকৃতি নিয়ে বাঁকানো।

হাতের তালুতে ছুরিটা নিয়ে একচোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি ফেললো গ্যারেথের দিকে। ‘তাস বাঁটো,’ হিসহিস করে উঠলো সে।

নির্ভয়ে হাসলো গ্যারেথ, তবে ধপ্ করে আবার বসে পড়লো চেয়ারটায়। তাস তুলে নিয়ে সশব্দে ফাঁটতে শুরু করলো সে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো ছুরিটা, যদিও গ্যারেথের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে পাপাডোপোলাস।

‘সত্যি কথা বলতে কী, আরো দু’চার হাত খেলার ইচ্ছে রয়েছে আমার,’ বিড়বিড় করলো গ্যারেথ। ‘তুমি বোধহয় সামান্য উত্তেজিত হয়ে আছো, কি?’

কোর্স বদলে গালফ অব এডেনে ঢুকছে হীরনডেল। আরো পাঁচশো মাইল যেতে হবে ওদেরকে।

চেহারায় সন্তুষ্ট ভাব নিয়ে ভেতরে ঢুকলো হিন্দু একজন মেট, ক্যাপটেনের কানে ফিসফিস করলো সে।

‘ওর সমস্যাটা কী?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

‘ওর ভয়, আমরা না নৌ-টহলের সামনে পড়ে যাই।’

‘সে ভয়ে আমিও তো কাঁপছি,’ বললো গ্যারেথ। ‘আমাদের বোধহয় ডেকে যাওয়া উচিত।’

‘বাঁটো!’ চাপা গলায় গর্জে উঠলো অ্যারোনিকাস।

হঠাৎ করে এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেলো, খরখর করে কাঁপতে শুরু করলো জাহাজ। ফুলস্পীডে ছুটছে ওরা। সবগুলো পাল-ও তোলা হয়েছে, গালফ অব এডেন ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি লোহিত সাগরে ঢুকে পড়তে চায় মেট। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পশ্চিম আকাশে মেঘের ভেলাগুলো টকটকে লাল। বুদ্ধি করে গালফের ঠিক মাঝখান দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছে মেট, ডান দিক থেকে আরব জাহান ওদেরকে দেখতে পাবে না, বাম দিক থেকে আফ্রিকাও দেখতে পাবে না। আশাতীত অনুকূল বাতাস পাওয়ায় হীরনডেলের গতি এখন পঁচিশ নট। তার সেরা একজন লোককে টেলিস্কোপ ধরিয়ে দিয়ে মাস্তলের মাথায় তুলে দিলো মেট। মেয়ে পাচারের অভিজ্ঞতা আছে তার, জানে নৌ টহলের হাতে ধরা পড়লে কীভাবে ছাড়া পেতে হয় বা ছাড়া না পেলে কী শাস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু অস্ত্র পাচার সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ধরা পড়লে সাবধানের মার নেই ভেবে মাস্তলের মাথায় একজনকে পাহারায় বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

প্রায় নাক বরাবর সামনে সূর্য, ডুবতে যন্ত্রণাকর দীর্ঘ সময় নিচ্ছে। বাতাসের গতিবেগও বাড়তির দিকে, ডেউয়ের মাথা থেকে হীরনডেলকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে নিচের গভীর গহ্বরে।

হামাগুড়ি দিয়ে নিতম্বিনীর এঞ্জিন হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এলো জেক, ভিকি কেমবারওয়েলের চোকে চোখ রেখে হাসলো। আর্মারড্ কারের মাথায় বসে আছে সে, ঝুলে থাকা পা দুটো দোল খাচ্ছে অলসভঙ্গিতে, টানা বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে সোনালি চুল। গত ক’দিনের রোদে তার গায়ের রঙ আরো গাঢ় হয়েছে, চেহারার স্নান ভাবটুকুও এখন আর নেই। কিশোরী স্কুলছাত্রীর মতো লাগছে তাকে, হাসিখুশি আর ছটফটে, দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ এখনো যাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

‘সাধ্যমতো করলাম,’ বললো জেক, অ্যামোনিয়ায় ভেজানো বুরুশ দিয়ে হাত থেকে গ্রিজ পরিষ্কার করলো। ‘ভবিষ্যতের কথা জানি না, এখন তো বেশ ভালোই চলছে এঞ্জিনটা।’ ভিকির হাঁটু জেকের চোখের সাথে একই সরলরেখায় রয়েছে, দুখ-আলতা রঙের উঁকুর অনেকটা ওপরে উঠে গেছে তার স্কার্ট। সেদিকে চোখ পড়তে দম বন্ধ হয়ে এলো জেকের। ওর দৃষ্টি কোন দিকে টের পেয়ে গেলো ভিকি, ঝট করে দুই হাঁটু এক করলো সে, যদিও ক্ষীণ একটু হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। হালকা লাফ দিয়ে ডেকে নামলো সে, কাত হ’তে শুরু করা ডেকে স্থিরভাবে দাঁড়ানোর জন্যে জেকের হাতের শক্ত পেশিতে আঙুল পেঁচালো।

সুদর্শন একজন পুরুষের মুখ দৃষ্টি দারুণ উপভোগ করেছে ভিকি কেমবারওয়েল, একটানা পাঁচ দিন গ্যারেথ সোয়েলসের অনুপস্থিতিতে একঘেয়েমির শিকার হ’তে হয় নি তাকে। ধীর ভঙ্গিতে ঘাড় একটু বাঁকা করে জেকের দিকে ফিলে হাসলো সে। জেক লম্বা, তা সত্ত্বেও মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল কান দুটো প্রায় ঢেকে রাখায় চেহায়ায় বালকসুলভ একটা ভাব এনে দিয়েছে। সুগঠিত পুরুষালি চোয়াল, চোখের কোণে সূক্ষ্ম কুঞ্চনের সমষ্টি অবশ্য সে-ভাবটুকু মান করে দেয়।

একেবারে হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো ভিকি, চুমো খাওয়ার জন্যে ওর দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছে জেক। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করলো সে। তার জানা আছে, ক্ষীণতম উৎসাহ পেলে গ্যারেথ সোয়েলসের সাথে ঘোরতর সংঘর্ষের পথে ধাবিত হবে জেক, ফলে গোটা অভিযান এমনকি ভঙুলও হয়ে যেতে পারে, প্রাণ হারাতে হ’তে পারে দু’জনের একজনকে, কিংবা দু’জনকেই, সেই সাথে এতো ঝুঁকি নিয়ে এদের সাথে অভিযানে তার অংশগ্রহণের আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে জেকের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তার চোখে ধরা পড়লো। ঠোঁটের এমন নিখুঁত আকৃতি আর কোনো পুরুষের মধ্যে দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না সে। একদিন না কামানোতেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে সারা মুখে, দাড়ির গোড়াগুলো তামাটে চামড়ার গায়ে সবুজ হয়ে আছে। তার কোমল মসৃণ মুখে ওই দাড়িগুলোর প্রথম স্পর্শ কর্কশ আর বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতো লাগবে, সারা শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করলো সে। আচমকা তার ইচ্ছে হলো, ওই স্পর্শটুকু তার চাই। সামান্য চিবুক তুললো সে, জানে তার চোখে জ্বলতে থাকা বাসনার অস্থির আলোর ভেতর ইচ্ছেটা পড়তে পারবে জেক।

মাস্তলের মাথা খেতে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এলো, পরমুহূর্তে হীরনডেলের চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেলো। মাস্তলের মাথায় প্রহরী লোকটা মুসলমান, প্রথমে সে আল্লাহকে ডাকলো, তারপর আরবি ভাষায় হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করলো। কালো খুলির নিচে তার চোখ দুটো অক্ষিকোটরের ভেতর ঘুরছে, এতো বড় হাঁ করে আছে যে নিচে থেকেও তার আলাজিভ পরিষ্কার দেখতে শেলো জেক। ডেক থেকে তার সাথে সুর মিলিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো হিন্দু মেট।

‘কী ব্যাপার, জেক ? কী হয়েছে ?’ জানতে চাইলো ভিকি, এখনো তার একটা হাত জেকের বাহতে।

বাঁধনগুলো খুলতে শুরু করলো ক্রুরা। 'বিপদের সময় দাসগুলোকে নিয়েও এই করি আমরা, লোহার চেইন থাকায় ভারি পাথরের মতো ডুবে যায় তারা।'

'এক মিনিট, এক মিনিট! কার কার্গো ওগুলো যে ফেলে দিতে চাইছে পানিতে? এর জন্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

'ভাড়ায় টাকাটা এই মুহূর্তে কার কাছে, মেজর?' তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করলো পাপাডোপোলাস। 'আমার পকেটে কিছুই নেই-তোমার পকেট কী বলে?' নিজের লোকদের দিকে ফিরে তাড়া লাগালো সে।

ভারি ধাতব শব্দের সাথে হঠাৎ খুলে গেলো প্রিসিলার টারিট, ভেতর থেকে খাড়া হ'লো জেকের মাথা আর কাঁধ, ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে, দু'হাতে একটা ভিকার্স মেশিনগান। টারিটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে নিজেকে স্থির করলো ও, ভিকার্সটাকে বাঁ হতের ভাঁজে নিলো, অপর হাতে শক্ত করে ধরলো পিস্তল গ্রিপ। অ্যামুনিশনের ভারি বেল্ট-টা কাঁধ থেকে ঝুলছে।

এক পশলা গুলি ছুঁড়লো জেক, বুলেটগুলো সাদা অগ্নিশিখার মতো মাথার দশ ইঞ্চি ওপর দিয়ে সরলরেখা তৈরি করে ছুটে গেলো। ডাইভ দিয়ে ডেকের ওপর পড়লো ক্যাপটেন আঁৎকে গোঙাচ্ছে, তার ক্রুরা সন্ত্রস্ত মুরগিছানার মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। কৃত্রিম গাভীরের সাথে সবার ওপর একবার চোখ বুলালো জেক বারটন, একচোখো ক্যাপটেনের দিকে স্থির হ'লো সৃষ্টি। 'পরস্পকে এবার বোধহয় চিনতে পারছি আমরা, কী বলো, ক্যাপটেন? গাড়িগুলোকে ভুলেও কেউ ছুঁতে যেয়ো না। বিপদ এড়াতে চাইলে একটাই পথ খোলা আছে তোমার সামনে-লেজ তুলে দৌড় দাও, ডেস্ট্রয়ার যেনো ধরতে না পারে।'

'কিস্ত কীভাবে!' ডেকের ওপর বসলো পাপাডোপোলাস। 'ডেস্ট্রয়ারের স্পীড ত্রিশ নট!'

'কথা ব'লে সময় নষ্ট করো না, কাজে নেমে পড়ো,' পরামর্শ দিলো জেক। 'আর বিশ মিনিট পর সন্ধ্যা। কোর্স বদলাও, অঙ্ককার না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাও খেলাটা। লুকোচুরি তুমি ভালোই খেলতে জানো।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো পাপাডোপোলাস, চোখটা পিট পিট করছে, হাত কচলাচ্ছে ঘন ঘন।

ক্যাপটেনের মাথার ওপর দিয়ে আরো এক পশলা গুলি ছুঁড়লো ও। 'শুরু করো।'

আবার ডেকে শুয়ে পড়েছে ক্যাপটেন, শুয়ে শুয়েই তারশ্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে, কোর্স বদল করার নির্দেশ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো নাবিকরা। ডেস্ট্রয়ার আর হীরনডেলের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। হীরনডেল কোর্স বদলানোর পর দুটো জলযান বিপরীত দিকে ছুটছে এখন।

হাতছানি দিয়ে গ্যারেথকে কাছে ডাকলো জেক, মেশিনগানটা ধরিয়ে দিলো তার হাতে। 'শয়তান গ্রিকটর ওপর নজর রাখছি আমি, তুমি বাকিগুলোকে কাভার দাও। ভিকি আর শ্বেগোরিয়াসকে বলো, ক্ল্যাম্প লাগিয়ে সব ক'টা গাড়ির হ্যাচ কাভার বন্ধ করতে হবে।'

ওদের নির্দেশ মতো থামছে হীরনডেল, জানে না জাহাজটার ডিজেল এঞ্জিনও আছে। তবে একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, পাল নামিয়ে নেয়ায় ডেস্ট্রয়ার থেকে এখন আর হীরনডেলকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো জেক, তারপর যখন অন্ধকারে হারিয়ে গেলো ডেস্ট্রয়ার। দেখতে না দেখতে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। স্বর্গ জুড়ে জ্বলজ্বল করতে তারার অসংখ্য মালা। ক্রসট্রিতে দাঁড়িয়ে আছে জেক, অন্ধকারের ভেতর দৃষ্টি হেনে ডেস্ট্রয়ারটাকে খুঁজছে। ওর ভয় কাটে নি এখনো, জানা নেই ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন কী ভাবছে। লোকটা যদি সন্দেহ করে থাকে? সে ও যদি কোর্স বদলে ওদের পিছু নিয়ে থাকে? অন্ধকারের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে আকাশ ছোঁয়া ইস্পাতের খোল হীরনডেলের ওপর থেকে জ্বলে উঠতে পারে সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো সাদা আলো। কানের পর্দা ফাটিয়ে বেজে উঠতে পারে বুল হর্ন।

আরো বেশ কিছুক্ষণ পর, স্বস্তির একটা বিরাট ধাক্কার সাথে, সাদা আলোর দীর্ঘ আঙুল সাগরের গায়ে নড়ে উঠতে দেখলো জেক। অন্তত ছ'মাইল পিছনে, ঠিক যেখানে পাল নামিয়েছিল হীরনডেল। ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপটেন টোপ গিলেছে, তার নির্দেশে হীরনডেল থেমেছে ধ'রে নিয়ে অপেক্ষা করছে সে।

তবে ভুল ভাঙতে দেরি হবে না ক্যাপটেনের। নির্দিষ্ট একটা সময় পেরিয়ে যাবার পর সে বুঝতে পারবে, হীরনডেল ডেস্ট্রয়ারের দিকে আসছে না। তখনই শুরু হবে সার্চ।

আবার পাপাডোপোলাসকে নির্দেশ দিলো জেক। পাল তোলা, কোর্স ঠিক রাখো, ফুলস্পীডে ছোটো। মিনিট পনেরো পর ডেস্ট্রয়ারের সার্চলাইট আবার জ্বলে উঠতে দেখলো ওরা, ডেস্ট্রয়ার থেকে ওটার দৌড় মাত্র এক মাইল। নিয়মিত একটা ছক ধ'রে খোঁজার পালা শুরু হলো।

দু'ঘণ্টা পর নতুন একটা ভয় জেঁকে ধরলো জেককে। ডেস্ট্রয়ারও দিক বদলেছে, ধাওয়া করে ইতিমধ্যে হীরনডেলের অনেকটা কাছে চলে এসেছে। সার্চলাইটের আলোর ডগা আর মাত্র মাইল দূরে।

পরের বার আলোটাকে দেখা গেলো অনেক বাঁ দিকে, কোর্স বদলে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে ডেস্ট্রয়ার। মাস্টহেড থেকে তবু নামলো না জেক, অন্ধকারে দৃষ্টি হেনে অপেক্ষা করতে লাগলো। সময় গড়িয়ে চললো। এক সময় ক্ষীণ আলো ফুটলো পুব আকাশে। চোখে টেলিস্কোপ তুলে চারদিকের দিগন্তরেখায় দৃষ্টি বুলালো ও। অথৈ জলরাশির মাঝখানে কোথাও কোনো জাহাজ নেই।

রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ ধ'রে গেছে জেকের, মাস্তুলের মাথায় নড়াচড়া করার সুযোগ না থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশি, ধীরে ধীরে নিচে নামার সময় ভয় হ'তে লাগলো হাত ফসকে পড়ে না যায়।

পাপাডোপোলাস ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে অভ্যর্থনা জানালো, ওর নামে মুখে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো সে, রসুনের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো জেকের। ওকে নামতে দেখে আগেই স্টোভ জ্বেলেছে ভিকি কেমবারওয়েল, মগভর্তি গরম কফি

প্রায় ঘন্টাখানেক তীর ঘেঁষে সমান্তরাল রেখা ধরে এগুলো হীরনডেল, মাঝখানে এক হাজার ফুট ব্যবধান; রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে অজানা ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা। দলে শুধু জেক অনুপস্থিত, কার্গো আনলোড করার প্রস্তুতি নিতে গেছে ও। তবে একটু পরই ফিরে এলো আবার, ঠিক তখনই ওদের সামনে গভীর ভাবে একটা উপসাগর উন্মুক্ত হলো।

‘দ্য অব চেইনস,’ বললো থ্রেগোরিয়াস, সেই সাথে নামকরণের কারণটাও পরিষ্কার হয়ে গেলো। বে-র শেষ মাথায় দুদিকে উঁচু হয়ে রয়েছে উপকূল দুপাশের বাতাস থেকে রক্ষা করেছে তীরের খানিকটা অংশকে, পানির ওপর জেগে থাকা পাহাড় চূড়া ঠেকিয়ে রেখেছে সাদা ফেনা, নাক বরাবর সামনে প্রাচীন নগরী মন্দির ধ্বংসাবশেষ—এক সময় লোহার চেইন পরা ক্রীতদাসদের নিলামে তোলা হতো ওখানে।

বিধ্বস্ত শহরটা আবাস দেখিয়ে দেয়ায় চিনতে পারলো না ওরা। তীরের কিনারায় কিছু সমতল, মসৃণ পাথরের স্তূপ দেখে কার সাধি্যি বোঝে এখানে এক সময় একটা শহর ছিলো। আরো কাছে এসে জ্যামিতিক ধাঁচের ছক দেখে রাস্তা, ছাদহীন দেয়াল চিনতে পারলো ওরা।

নোঙর ফেললো হীরনডেল। কার্গো নামানোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে রেলিংয়ে গ্যারেথের কাছ থেকে চলে এলো জেক। ‘দু’জনের একজনকে লাইন নিয়ে সাতরাতে হবে।’

‘এসো টস করি, প্রস্তাব দিল গ্যারেথ, জেক প্রতিবাদ করার আগেই তার হাতে বেরিয়ে এলো শিলিংটা।

‘হেডস।’ হাল ছেড়ে দেয়ার সুরে বললো জেক।

‘মন্দ কপাল, ওল্ড চ্যাপ। হাঙরগুলোকে আমার স্নেহ জানিয়ে।’ সহাস্যে বললো গ্যারেথ, মোচর দিলো গৌফে।

ডেরিকে চড়িয়ে ভোলাটা নামিয়ে দেওয়া হ’লো পানিতে, ভেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টান টান রশি ধরে ভারসাম্য রক্ষা করলো জেক। গর্ভবতী জলহস্তীর মতো ভেটপ ভেলাটা চেউয়ের মাথায় দুলতে লাগলো। রেলিংয়ে ভর দিয়ে সাগ্রহে নিচে তাকিয়ে রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, মুখ তুলে হাসলো জেক।

‘যদি মনে করো চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, অন্যদিকে তাকাতে পারো।’ জেকের কথা এক মুহূর্ত বুঝলো না ভিকি। কিন্তু শার্ট খুলে জেক যখন ট্রাউজারের বোতামে হাত দিলো, নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে। কোমরে হালকা লাইন জড়িয়ে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, লাফ দিলো জেক ভেলা থেকে। শেষ পর্যন্ত অদম্য কৌতূহলের জয় হলো, চোখ নামিয়ে আবার জেকের দিকে তাকালো ভিকি। ট্রাউজার খোলা অবস্থায় একজন পুরুষকে ভারি অসহায় আর ছেলেমানুষ লাগে উপলব্ধি করলো সে। পানির নিচে ডুবে রয়েছে জেকের শরীর, মাঝে মধ্যে শুধু নিতম্ব আর কাঁধ দুটো জেগে উঠছে পানির ওপর, যদিও পানির নিচেও পুরো শরীরটা দেখতে পাচ্ছে ভিকি। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্, ঠোঁটের কোণে ঝলছে ব্যঙ্গাত্মক একটুকরো ধারালো হাসি, উঁচু হয়ে কপালে উঠে গেছে একটা ভুরু। গ্যারেথের হাত

দুটো অবশ্য থেমে নেই, জেক এগোবার সাথে সাথে জাহাজ থেকে লাইন ছাড়ছে সে। লজ্জায় লালচে হয়ে উঠলো ভিকি, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে রঙ্গিলার দিকে এগুলো-দেখে নেয়ার দরকার ওর ব্যাগ আর টাইপ-রাইটার গাড়িটার তোলা হয়েছে কিনা।

পানির নিচে মাটিতে পা পড়লো জেকের, হেঁটে তীরে উঠলো ও, লাইনটা একটা বড়সড় পাথরে জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধলো। ইতিমধ্যে ডেরিকের সাহায্যে বড় ভেলাটায় নামানো হয়েছে প্রথম আর্মারড্ কার। লাইন টেনে তীরে ভেরানো ভেলাটাকে, খুলে দেয়া হ'লো গাড়িটার বাঁধন। তীরের কিনারা থেকে বালিময় হলুদ সৈকত ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, সেদিকে একটা উদ্ভিগ্ন চোখ রেখে স্টার্ট দিলো জেক, ভেলা আর সৈকতের মাঝখানে শক্ত আর মোটা কাঠের তক্তা ফেলে সিধে হ'লো গ্রেগোরিয়াস। ভেলা বিপজ্জনকভাবে দুলছে, এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়লো একটু, ভেলা থেকে তক্তার ওপর উঠে এলো কার। প্রায় অনায়েসে সৈকত পৌছলো জেক, ওয়াটার মার্ক ছাড়িয়ে এসে দাঁড় করালো গাড়ি। গ্রেগোরিয়াসকে নিয়ে ফিরে গেলো ভেলা, দ্বিতীয় গাড়িটা নিয়ে আসবে।

প্রায় নিঃশব্দে, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ সারলো তুরা, তবু ফুয়েলের ড্রাম আর কাঠের বাস্ত্রগুলো নিয়ে ভেলাটা যখন শেষবারের মতো তীরে ভিড়লো, সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কিনারায় পৌঁছে গেছে। ভেলার শেষ আরোহী হিসেবে কাঠের একটা বাস্ত্রের ওপর একা ব'সে রয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল, মুখে স্থির হয়ে আছে আড়ষ্ট হাসিটুকু।

ভেলাটা হাজারের গা থেকে সরতে না সরতে ডিজেল এঞ্জিন জ্যাক্ত হয়ে উঠলো, নোঙর তোলার নির্দেশ দিলো পাপাডোপোলাস, ভেলার সাথে বাঁধা লাইনটা তুলে নেয়া হলো। ভেলা থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামলো ভিকি, ইতিমধ্যে নাক ঘুরিয়ে বে-র প্রবেশপথের দিকে ছুটেতে শুরু করেছে হীরনডেল, তুরা পাল তোলার কাজে ব্যস্ত সবাই। সন্ধ্যা নামছে, সৈকতে দাঁড়িয়ে চারজন ওরা তাকিয়ে আছে দ্রুতগতি হীরনডেলের দিকে। কেউ ওরা হাত নাড়লো না, তবু কী যেনো একটা হারানোর ব্যথা সবাই ওরা অনুভব করলো। জাহাজটা অবৈধ মালামাল পাচার করে, তুরা নোংরা, ক্যাপটেন লোকটা বিবেকহীন, তবু সভ্য দুনিয়ার সাথে হীরনডেলই ছিলো ওদের সর্বশেষ যোগসূত্র। সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

দেখতে দেখতে বে থেকে বেরিয়ে গেলো হীরনডেল, অদৃশ্য হয়ে গেলো সীমাহীন সাগরে।

নিস্তব্ধতা আর একাকীত্ব থেকে ওদেরকে উদ্ধার করলো জেক। 'মন খারাপ করে লাভ কী, এসো তাঁবু ফেলা যাক।'

বিধ্বস্ত শহরের মাঝখানে, একজোড়া নিচু দেয়ালের সামনে থামলো ও, তাঁবু ফেলার জন্যে জায়গাটা ওর পছন্দ হলো। একেবারে খোলা জায়গায় ফেলে না রেখে, এক এক করে গাড়িগুলোকেও সৈকত থেকে ধ্বংসাবশেষের ভেতর নিয়ে এলো ওরা। বাড়ি-ঘরের ভাঙাচোরা কাঠামোয় কাঁটাঝোপ গজিয়েছে, পাথরের স্তূপগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে আছে বালিতে। রাস্তাগুলো সরু, কর্কশ ঝোপ আর বালিতে ঢাকা গ্রেগোরিয়াসকে

সাথে নিয়ে গাড়িগুলোর চাকা আর ফুয়েল পরীক্ষা করছে জেক, একটা দেয়ালের গোড়ায় কিছু ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে গ্যারেথ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও, শহর দেখতে একাই বেরিয়ে পড়লো ভিকি।

খুব বেশি দূর গেলো না সে। হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে এলো তার, পা উঠতে চায় না। ক্রীতদাসদের হাত-পায়ে লোহার চেইন, ঝনঝন শব্দ করছে। বাতাসে চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ। রক্তাক্ত কালো মানুষদের আর্তনাদ। লাফ দিয়ে ঝলসে উঠলো আগুনের লেলিহান শিখা, গোটা শহর পুড়ছে। দেড়-দুশো বছর আগে ঠিক যা ঘটেছিল, সব যেনো জ্যান্ত হয়ে উঠলো ভিকি কেমবারওয়েলের চোখের সামনে। পোকার মতো কিলবিল করছে তার চামড়া, ভয়ে আর উত্তেজনায় পা উঠতে না চাইলেও কিসের এক দুর্নিবার টানে সন্মোহিতের মতো সামনে এগিয়ে চলেছে সে। সরু গলির মাথা থেকে চওড়া একটা উঠনের মতো জায়গায় বেরিয়ে এলো, আন্দাজ করলো প্রাচীন মন্ডি নগরীর এখানটাতেই মানুষ বেচাকেনার হাট বসতো। লোহার শেকল পরা অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ধুকছে, কল্পনা করে শিউরে উঠলো সে। পরমুহূর্তে তিরস্কার করলো নিজেকে, অতীতের কথা ভেবে এভাবে কাতর হয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না। বর্তমানকে নিয়েই তার কারবার, যেখানে যা দেখে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হলে সচেতন পাঠককে জানানোর জন্যে লিখে ফেলে। আজ আর মানুষ বেচাকেনা হয় না, ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে....কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনমনে মাথা নাড়লো ভিকি কেমবারওয়েল। আজো এক দাসত্বের শৃঙ্খলে একটা জাতিকে বন্দী করতে উঠে-পড়ে লেগেছে বিশ্বশক্তি। ইথিওপিয়ার যেখানে সে যাচ্ছে, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেখানে – অশুভ শক্তি দুর্বল মানুষের ওপর চড়াও হচ্ছে। নির্যাতিত আদিবাসীদের কথা অবশ্যই লিখবে ভিকি।

খসখস একটা শব্দে সম্বিত ফিরলো তার, চোখ নামিয়ে তাকাতেই আতংকে পিছিয়ে এলো এক পা। তিন ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁকড়া বিছে, সড়সড় করে তার পায়ের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হাঁটা ধরলো সে, ক্যাম্পের দিকে ফিরছে।

ভয়টা তখনো কাটে নি, কাজেই দেয়ালের গোড়ায় উজ্জ্বল আগুন জ্বলতে দেখে সোজা সেদিকেই এগোলো ভিকি, হাঁটু মুড়ে আগুনের পাশে বসার সময় তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো গ্যারেথ। হাত দুটো বাড়িয়ে আগুনের ওপর ধরলো ভিকি।

‘এক্ষুণি তোমাকে খুঁজতে বেরুচ্ছিলাম। একা কোথাও যাওয়া ঠিক না।’

‘নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা আছে,’ সাথে সাথে জবাব দিলো ভিকি, গলার ঝাঁঝটুকুর সাথে আগেই পরিচয় ঘটেছে গ্যারেথের।

‘আমি একমত,’ নরম হাসি ফুটলো গ্যারেথের মুখে। ‘মাঝে মধ্যে মনে হয়, কাজটায় অতিমাত্রায় দক্ষ তুমি।’ পকেটে হাত ভরলো সে। ‘আগুন জ্বালার জন্যে মাটি খুঁড়ছিলাম, জিনিসটা পেলাম।’ পকেট থেকে বের করে ভাঙা একটা ধাতব চাকতি ধরলো ভিকির সামনে, আগুনের আলোয় চকচক করছে। চাকতির গায়ে একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে, দেহটা কুণ্ডলী পাকানো।

অস্বস্তি আর অকারণ রাগ কর্পূরের মতো উবে গেলো, উত্তেজনা খাড়া হয়ে গেলো ভিকির শিরদাঁড়া। ‘ওহ, গ্যারি!’ প্রায় ছোঁ দিয়ে চাকতিটা তুলে নিলো সে। ‘ওমা, কি সুন্দর! সোনা, তাই না?’

‘সন্দেহ করছি,’ মুচকি হেসে গ্যারেথ ভাবলো, উপহারের জন্যে সবাই ওরা লালায়িত। ‘ওটা এক রাজকুমারীর ছিলো,’ হালকা সুরে বললো সে। ‘রাজকুমারীকে দিয়েছিল তার পাণিপ্রার্থী এক রাজকুমার। কাজেই আমার তরফ থেকে উপহার হিসেবে ওটা তোমাকে দিলে ব্যাপারটা বেশ মানানসই হবে, কি?’

‘ওহ!’ আনন্দের আতিশয্যে হাঁপিয়ে উঠলো ভিকি। ‘আমার জন্যে!’ আকস্মিক আবেগে ভেসে গেলো সে, গ্যারেথের কপালে চুমো খাওয়ার জন্যে ঝুঁকলো। কিন্তু খতমত খেয়ে গেলো, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছে গ্যারেথ, ভিকির ঠোঁট গ্যারেথের ঠোঁটের সাথে সঁটে গেলো। কী যায় আসে— আর তাছাড়া ব্রেসলেটটা সত্যিই সুন্দর।

প্রিসিলার এঞ্জিন বনেটের ওপর বড়সড় স্কেল ম্যাপ খুলেছে জেক, পাশে থ্রোগোরিয়াস; ল্যাম্পের আলোয় মরুভূমির গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে। ম্যাপ থেকে হঠাৎ মুখ তুলেই আগুনের আভায় দুটো মূর্তিকে সরে এসে এক হ’তে দেখলো জেক। ঘাড়ের পিছনে উত্তপ্ত রক্ত যেনো ছলকে উঠলো, বুকের খাঁচায় হাতুড়ির বাড়ি মারলো হৃৎপিণ্ড। ‘কফি বানাবে, থ্রোগোরিয়াস?’ ঘড়ঘড় করে উঠলো ওর গলা।

‘একটু পর, জেক!’ প্রতিবাদের সুরে বললো থ্রোগোরিয়াস। ‘স্যান্ড ডেজার্ট-টুকু ঠিক কোথায় পেরোবো আমরা সেটা আগে দেখাই আপনাকে.....’ সামনের দিকে ঝুঁকে একা আঙুল রাখলো ম্যাপে, জানে না কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে নেই। ওদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে আগুনের দিকে রওনা হয়ে গেছে জেক।

ভোরের ক্ষীণ আলো ইতস্তত করছে পূব দিগন্তে, ঘুম থেকে জেগে উঠে ভিকি বুঝতে পারলো, বাতাস থেমে গেছে। রাতে যতক্ষণ জেগে ছিলো সে, সক্রিয় বিলাপের মতো আওয়াজ শুনেছে, বাতাস নয়, যেনো বিধ্বস্ত নগরীর আনাচে-কানাচে ক্রীতদাসদের অতৃপ্ত আত্মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। গা থেকে চাদর সরাবার সময় চারদিকে চিকচিকে ধুলো-বালি উড়লো, কিচকিচ করে উঠলো দাঁত। উঠে ব’সে পুরুষ সঙ্গী তিনজনের দিকে তাকালো সে। চাদর ঢাকা তিনটে লম্বা বস্তার মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে রয়েছে ওরা, একজন নাক ডাকছে। কে, বুঝতে পারলো না ভিকি। মাথায় হাত দিয়ে আঙুলের ডগায় বালি পেলো সে। কারো ঘুম ভাঙার আগে গোসলটা সেরে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

টয়লেট ব্যাগ, তোয়ালে আর আভারঅয়্যার নিয়ে দেয়ালের ফাঁক গ’লে বেরিয়ে এলো ভিকি, বালিয়াড়ি উপকে নেমে এলো সৈকতে।

সুন্ধ ভোর, লুকিয়ে থাকা সূর্যের আভায় বে-র পানি লালচে সাটিনের মতো মসৃণ। চারদিকে জমাট নিস্তব্ধতা, এই নিস্তব্ধতা শুধু মরুভূমিতেই আশা করা যায়—পশু বা

গায়ে-গতরে বোঝা নিয়ে কিস্তুক্তিমাকার চেহারা পেয়েছে কারগুলো, পরস্পরের ধুলো এড়ানোর জন্যে প্রতিটির মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান, উপকূলীয় বালিয়াড়ি টপকে বেরিয়ে এলো খাঁ খাঁ মরুতে। একটানা অবিরাম তীব্র বাতাস বইলেও, হু-হু করে বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা, গাড়ির ভেতর দরদর করে ঘামছে ওরা।

কম্পাসে চোখ রেখে কলামের মুখ সামান্য দক্ষিণ দিকে তাক করেছে জেক, গ্রেনোরিয়াসের পরামর্শ না পেলেও তাই করতো ও। এই পথটা ধরায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সল্ল প্যানগুলোকে এড়ানো সম্ভব হবে। গ্রেনোরিয়াস ওকে জানিয়েছে, ভুল করে কেউ যদি ওদিকে গিয়ে পড়ে, অপেক্ষাকৃত ভালো পথে ফিরে আসতে তিন-চার দিন সময় লেগে যাবে।

প্রথম দু'ঘণ্টা মেশানো হলদেটে নরম মাটি তেমন গুরুতর কোনো সমস্যার সৃষ্টি করলো না, শুধু ভারি চাকা মাঝে মধ্যে ডেবে যাওয়ায় এগোনোর গতি ঘণ্টায় দশ মাইলের ওপরে তোলা গেলো না। লো গিয়ারে রয়েছে পুরনো এঞ্জিনগুলো, পরিশ্রমে ধুকছে।

তারপর ওরা শক্ত মাটিতে উঠে এলো, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে পাথর। বহুযুগ ধরে বাতাস ওগুলোকে পালিশ করেছে, আকৃতির বদলে দিয়ে প্রায় প্রতিটি পাথরকে গোল করে তুলেছে, আকারে পঁপের দানা থেকে শুরু করে রাজহাঁসের ডিম, সব ধরনেরই আছে। ঝাঁকি খেতে শুরু করলো গাড়ি, গতি আরো একটু কমলো। কালো পাথর থেকে অদৃশ্য তাপ ছটকে উঠে এসে পুড়িয়ে দিলো ওদের চোখ মুখ। জেকের নির্দেশে প্রতিটি গাড়ির সবগুলো হ্যাচ আর এঞ্জিন লুভর খুলে রাখলো ওরা। প্রত্যেকে গায়ের কাপড় খুলে শুধু আভারওয়ায়ার পরে আছে, ভিকি কেমবারওয়েলও ব্যতিক্রম নয়। তবু প্রতিমুহূর্তে ঘামছে ওরা, লোমকূপ থেকে বেরুবার সাথে সাথে আবার তা শুকিয়েও যাচ্ছে। গাড়ির ইম্পাতে, যেখানে রোদ লাগছে, সাদা রং থাকা সত্ত্বেও, ছুঁলেই ফোসকা পড়ে যাবে চামড়ায়। মাথার ওপর উঠে আসছে সূর্য, সেই সাথে এঞ্জিনের তাপ আর গরম তেলের গন্ধে ড্রাইভারের কমপার্টমেন্টে বসে থাকা অসহনীয় একটা শাস্তি হয়ে দাঁড়ালো।

দুপুরের ঘণ্টাখানের আগে প্রথম প্রতিবাদ জানালো প্রিসিলা দ্য পিগ, তার রেডিওটেরের ভালব বিস্ফোরিত হলো, সশব্দে আকাশে নিক্ষিপ্ত হ'লো গরম বাষ্প। ম্যাগনিটো নিউট্রাল করে সাথে সাথে প্রিসিলাকে থামালো জেক। অর্ধনগ্ন, ঘামে চকচক করেছে গা, টারিটের ওপর উঠে দাঁড়ালো ও, চোখে হাতের ছায়া ফেলে তাপ-তরঙ্গের ভেতর নৃত্যরত ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকালো। অস্পষ্টতার ভেতর দিগন্তরেখার কোনো অস্তিত্ব নেই, মাত্র কয়েকশো গজ সামনের দৃশ্যও পরিষ্কার নয়। এমনকি পিছনের আর্মারড কারগুলোকেও চেনা কঠিন, দানবীয় আর অবাস্তব লাগলো চোখে।

গাড়িগুলো কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো জেক, তারপর সবাইকে ডেকে বললো, 'এঞ্জিন বন্ধ করো। এই অবস্থায় এগোনো সম্ভব নয়—এঞ্জিন অয়েল পানির

মতো পাতলা হয়ে যাচ্ছে, চালালে সবগুলো বেয়ারিং নষ্ট হবে। একটু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।’

কৃতজ্ঞচিত্তে গাড়ি থেকে নেমে এলো ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে যে যার গাড়ির পাশে ছায়ায় পৌঁছুলো। দৌড়ে আসা কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে সবাই। ওদের সবার সামনে দিয়ে হেঁটে এলো জেক, প্রত্যেকের হাতে একবার করে ধরিয়ে দিলো পাঁচ গ্যালন পানি ভর্তি ক্যানটা। যার যতোটুকু খুশি পানি খেয়ে নেতিয়ে পড়লো ওরা। সবশেষে পানি খেলো ভিকি, তার হাত থেকে গ্যালনটা নিয়ে একপাশে নামিয়ে রাখলো জেক, তারপর চলে পড়লো ভিকির পাশে চাদরের ওপর। ‘এই গরমে আমার গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে হলে মারা পড়বো,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললোও। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো ভিকি, চেহারা য় বিরূপ কোনো ভাব ফুটলো না, আধ খোলা ব্লাউজের আরো একটা বোতাম লাগালো। পানিতে রুমাল ভিজিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো জেক। সেটা নিয়ে ঘাড় আর মুখ মুছলো ভিকি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ‘এই গরমে শুতে পারবো না,’ বিড়বিড় করে বললো সে। ‘আমাকে খানিকটা আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করো, জেক।’

‘শোনো মেয়ের কথা!’ জেকের হাসিতে কোনো শব্দ নেই, কিন্তু ভিকির হাসি ঠিকই শুনতে পাওয়া গেলো।

‘বললাম, বড় বেশি গরম। এসো গল্প করি।’

‘কী নিয়ে?’

‘তোমাকে নিয়ে। নিজের কথা বলো—টেক্সাসের কোন্ এলাকা থেকে আসছো তুমি?’

‘বলতে পারো, সবখান থেকে। প্রায় সব জায়গায়ই কাজ করতো বাবা।’

‘কী করতেন উনি?’

‘ক্যাটল ব্যবসা। রোডিও।’

‘ভালোই তো।’

কাঁধ ঝাঁকায় জেক। ‘আমার অবশ্য ঘোড়ার চেয়ে এঞ্জিন ভালো লাগে।’

‘তারপর?’

‘যুদ্ধ এসে গেলো, ট্যাঙ্ক চালানোর জন্যে মেকানিকের প্রয়োজন হ’লো সেনাবাহিনীর।’

‘বেশ তো। দেশে ফিরে গেলে না কেনো যুদ্ধ শেষে?’

‘বাবা মারা গেলেন— একটা ঝাঁড়ের গুঁতোই কাল হ’লো। পুরোনো স্যাডল আর ব্ল্যাক্লেটটা ফেরত আনার কোনো মানে হয় না ব’লে ফিরে যাই নি।’

বেশ কিছুসময় নীরব রইলো ওরা দুজন। তাপ-তরঙ্গ ঐক্যে-বৈক্যে আকাশপানে উড়ে যাচ্ছে।

‘তোমার স্বপ্নের কথা বলো, জেক,’ ম্লান হেসে প্রসঙ্গ পাল্টালো ভিকি
কেমবারওয়েল।

‘স্বপ্ন?’

একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, তবু চোখ ফেরানো সহজ হ'লো না। জেককে চিনতে এক সেকেন্ড সময় নিলো ভিকি, পরমুহূর্তে ছোট একটা লাফ দিয়ে ছুটে এলো সে, জেককে জড়িয়ে ধরার জন্যে সামনে বাড়িয়ে দিলো হাত দুটো। মুখে রক্ত নেই, সোনালি-সবুজ চোখে নগ্ন আতংক। 'জেক!' ফুঁপিয়ে উঠলো সে। 'ওহ গড, জেক!' এতোক্ষণে জেকের নজরে পড়লো নালার উল্টো দিকে কী একটা যেনো নড়ছে।

ক্ষতটা শক্ত হয়ে গেছে রাতের মধ্যে। সিংহের পিছন দিকটা এখন প্রায় পঙ্গুই বলা চলে, ছিন্‌ভিন্ন নাড়িভূঁড়ি থেকে পাজরের খাঁচার ভেতর বেরিয়ে আসা দূষিত তরল পদার্থ সারা শরীরে বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, শুরু হয়ে গেছে সংক্রমণ। মানুষের আকৃতি দেখামাত্র তার যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা তা হ'লো না-আক্রোশ আর রাগের ভাব কম, তারচেয়েও কম শক্তি-সামর্থ্য। তবু মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে শিকারীদের স্মৃতি ফিরে এলো মনে, তারাই তো তাঁর এই যন্ত্রণাকর অবস্থার জন্যে দায়ী, আর সেই সাথে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেলো আহত পশুরাজ।

তারপরই আরো একটা ঘণিত দু'পেয়েকে দেখতে পেলো সে। শরীরের দুর্বলতা আর আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্যে আর কিছুই দরকার হয় না, চায় পায়ে ভর দিয়ে উঠে হ'লো সে, গরগর করে উঠলো।

ভিকির আলিঙ্গন এড়িয়ে গেলো জেক, খপ্পু করে তার একটা বাহু চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো, ইচ্ছা তাকে ওর পিছন দিকে সরিয়ে দেয়া। হেঁচট খেতে খেতে কোনো রকমে নিজেই সামলে নিলো ভিকি, জেকের আচরণে অবাক হয়ে গেছে। তার পিঠে ধাক্কা দিলো জেক, ঢালের গা বেয়ে ঐক্যবৈক্যে উঠে যাওয়া শুরু পথটা দেখিয়ে চিৎকার করে বললো, 'দৌড়াও! দৌড়াতে থাকো!' ভিকিকে ছেড়ে দিয়ে ঝট করে নালার দিকে ফিরলো ও, দেখলো অপর দিকের ঢাল বেয়ে এরইমধ্যে নালার কিনারায় নেমে এসেছে সিংহটা। যমদূতের মতো ছুটে আসছে ওর দিকে।

এই প্রথম খেয়াল হ'লো জেকের, অ্যামোনিয়ার বোতলটা এখনো ওর হাতে। অগভীর নালায় নেমে পড়েছে সিংহ, দু'পাশে পানি চিটিয়ে তেড়ে আসছে ওর দিকে। আহত হলেও ওটার ছুটে আসার ভঙ্গিতে কোনো জড়তা নেই। এতো কাছে এসে পড়েছে, বাঁকা ওপরের ঠোঁটের গায়ে গৌফ জোড়া পরিষ্কার দেখতে পেলো জেক, গলার ভেতর খেতে বেরিয়ে আসা চাপা গরগর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেলো। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো ওর, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ছুটে পালাবে না, ওটাকে আসতে দেবে। কারণ এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছন দিকের বাতাসে হেলান দিলো জেক, মাথার পাশে উঠে গেলো বোতল ধরা হাতটা, গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ছুঁড়ে দিলো সেটা। নিরস্ত্র মানুষের শেষ চেষ্টা, জানে কাজ হবে না, তবু হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস।

সোজা ছুটে গিয়ে সিংহের মাথায় লাগলো বোতল, ঠিক কপালের মাঝখানে। পাথরের ওপর, ভিকি যেখানে দাঁড়িয়েছিলো, লাফ দিয়ে সেখানটায় পড়েছে ওটা, এই সময় বোতলটা লাগলো। বিস্ফোরিত হ'লো বোতল, কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়লো

মাথার চারপাশে, কটুগন্ধ তরল অ্যামোনিয়ায় ঢাকা পড়ে গেলো দুই চোখ আর নাক, হাঁ করা মুখের ভেতরও ঢুকলো খানিকটা। আগশক্তি হারালো সিংহ, চোখ আর গলার ভেতরটা এমন জ্বালা করে উঠলো যেনো আগুনের ছাঁকা দিয়ে ছাল তুলে নিয়েছে কেউ। গর্জে উঠলো পশুরাজ, তার গোটা অস্তিত্ব প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়েছে। পাথরটাকে নাগালের মধ্যে পেলো না, ভারি বস্তার মতো ঝপাৎ করে অগভীর পানিতে পড়লো, ডুবে থাকা পাথরে পিঠ দিয়ে ছটফট করতে লাগলো।

গড়াতে গড়াতে আরো কম পানিতে সরে এলো সিংহ। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়বার চেষ্টা করলো দু'বার, পারলো না। তবে তৃতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলো। ছুটলো জেক, থামলো, ঝুঁকে তুলে নিলো ফুটবল আকারের ভারি একটা পাথর। নালার কিনারায় দাঁড়িয়ে পাথরটা ছোঁড়ার জন্যে মাথার ওপর তুলেছে, দেখলো অন্ধ সিংহ সরাসরি ওর দিকে লাফ দিতে যাচ্ছে।

ভয়ে শিউরে উঠলো জেক। দু'হাতে ধরা পাথরটা সজোরে ছুঁড়ে দিলো ওপর থেকে। কামানের গোলার মতো ছুটে গেলো সেটা, পাথর আর সিংহ শূন্য থাকতেই পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ হলো। সিংহের ঘাড় আর শিরদাঁড়া যেখানে এক হয়েছে, ঠিক সেখানটায় চুরমার হয়ে গেলো হাড়। গতি রুদ্ধ হলো, ধপাস করে নালার কিনারায় পড়ে গেলো পশুরাজ, কাত হ'লো ধীরে ধীরে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো জেক, যতোটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি ভয়ে হাঁপাচ্ছে। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে আঙুলের ডগা দিয়ে ওটার স্নান চোখের পাতা সরালো। তরল গ্যাস এরইমধ্যে চোখের তারা বিবর্ণ করে তুলেছে, জেকের স্পর্শেও সেটা নড়লো না। মারা গেছে সিংহ।

ঘুরলো জেক, দেখলো ওর নির্দেশ অমান্য করে সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে ভিকি, নগ্ন আর অসহায়। মায়া লাগলো জেকের, ছুটে এলো তার পাশে।

চেহারায় কার প্রতি যেনো অকারণ অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিকি, হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লো জেকের বুকে।

জেক জানে, এই আলিঙ্গনের উৎস প্রেম নয়, আতংক। আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে। সমস্ত ভয় নিঃশেষে মুছে গেলো মন থেকে, ভুলে গেলো সিংহের কথা। বডি শ্যাম্পুর মিষ্টি গন্ধ পেলো ও। কোমল নারীদেহের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তুললো। ভিকি তাকে এখনো গায়ের জোরে চেপে ধ'রে রেখেছে।

‘ওহ, জেক!’ ভাঙা গলায় ফিসফিস করলো ভিকি, আর তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর জেককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো এই মুহূর্তে ভিকি ওর। ভিকি চাইছে এখানে, এই মুহূর্তে, নিজের অধিকার আদায় করে নিক জেক।

এখানে, এই খোলা নদীর ধারে, সদ্য নিহত সিংহের পাশে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকালো। মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো জেকের। দুটো মুখ পরস্পরের দিকে এগোলো। ভিকি মুখ তুললো, জেক নামালো। ওরা চুমো খাবে, ঠিক এই সময়ে বাধা।

‘নিচে তোমরা করছোটা কী শুনি? কী হচ্ছে ওখানে? খাদের মাথা থেকে হাঁক ছাড়লো গ্যারেথ, দাঁড়িয়ে রয়েছে একেবারে ঢালের কিনারায়, হাতের ভাঁজে লী এনফিল্ড বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল। তার ভাব দেখে মনে হলো, ঢাল বেয়ে নামতে যাচ্ছে।

ভিকিকে ধ'রে ঘোরালো জেক, নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করলো নগ্ন দেহটাকে, তারপর গা থেকে খুলে পরিয়ে দিলো লেদার জ্যাকেটটা। ভিকির উরুর মাত্র অর্ধেকটা ঢাকা পড়লো, আর বগলের কাছে ফুলে থাকলো বেটপ আকৃতি নিয়ে। এখনো সে একটু একটু কাঁপছে, যেনো ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে একটা অসহায় শিশু। নিঃশ্বাস ফেলছে ভাঙা ভাঙা।

‘আর শুনে কী হবে?’ ঢালের মাথায় দাঁড়ানো গ্যারেথের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো জেক। ‘যখন দরকার ছিলো তখন সুযোগ হারিয়েছো, এখন আর তোমাকে দরকার নেই।’ পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বের করে ভিকির দিকে বাড়িয়ে দিলো ও। আড়ষ্ট, কাঁপা কাঁপা হাসির সাথে সেটা নিলো ভিকি। ‘চোখ মুছে নাও,’ বললো জেক। ‘আমার ধারণা, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই ছুটে আসবে এখন, তার আগে প্যান্টটা পরে নাও!’

এ তোই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হ'লো যে কয়েক মিনিট কথাই বলতে পারলো না গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। কারো সাহায্য না নিয়ে একা কোনো হিংস্র পশুকে বধ করা ইথিওপিয়ায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যাপার, গোত্রের লোকেরা রাতারাতি শিকারীর অ্যুগ্ন ভক্ত হয়ে উঠবে। আর পূর্ণ-বয়স্ক একটা পুরুষসিংহকে খালি হাতে মেরে ফেলা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপ্রত্যাশিত, কেউ যদি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ শিকারী তখন বীরত্বের প্রতীকচিহ্ন হিসেবে নিহত সিংহের কেশর পরিধান করতে পারে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই তাকে শ্রদ্ধা জানায়। যে শিকারী বন্দুক ছুঁড়ে সিংহ মারে সে শ্রদ্ধার পাত্র, যে বর্শা দিয়ে মারে তার সম্মান আরা বেশি-কিন্তু একটা মাত্র পাথর আর এক বোতল অ্যামোনিয়া দিয়ে সিংহ মারা যায় এ-কথা জীবনে এই প্রথম শুনলো গ্রেগোরিয়াস।

ছালটা নিজের হাতে ছাড়ালো সে। কাজটা শেষ করার আগেই মাথার ওপর বৃত্ত রচনা করে চক্কর দিতে শুরু করলো কালো তীরচিহ্নের মতো শকুনের দল। লাশটা নদীর পাড়ে ফেলে এলো সে, ভিজে চামড়াটা নিয়ে উঠে এলো খাদের ওপর, ইতিমধ্যে আবার রওনা হবার প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছে জেক।

চামড়ার ব্যাপারে কারও কোনো আগ্রহ নেই শুনে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো গ্রেগোরিয়াস। ‘জেক, কী বলছেন আপনি? এটা সাথে থাকলে আমার গোত্রের লোকেরা আপনার পূজো করবে! যেখানেই যাবেন, লোকজন আপনার দিকে আঙুল তুলে পরস্পরকে দেখাবে।’

‘খুব ভালো কথা। এবার তৈরি হও.....।’

‘কেশর দিয়ে আমি আপনার জন্যে একটা পাগড়ি বানিয়ে দেবো, মাথার জড়িয়ে রাখবেন...’ চামড়াটা প্রিসিলার ওপর নামিয়ে রাখলো সে। ‘আপনাকে যা সুন্দর লাগবে না!’

শুকনো গলায় বললো গ্যারেথ, ‘তা পড়তে পারে, কিন্তু তাতে শুধু ওর চুলের এখনকার স্টাইল একটা উন্নত হবে, তার বেশি কিছু না। স্বীকার করছি, কেশরটার রঙ ভারি চমৎকার, আরো স্বীকার করছি, জেক ছেলে হিসেবে দারুণ-কিন্তু ওর কথার প্রতিধ্বনি তুলে আমিও বলতে চাই, অনেক হয়েছে, এবার তৈরি হয়ে নাও, কারণ তোমরা যা শুরু করেছো তাতে যে-কোনো মুহূর্তে আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।’

যে-যার গাড়ির দিকে এগোলো ওরা, লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত জেকের পাশে চলে এলো গ্রেগোরিয়াস। তামার জ্যাকেট পরানো বুলেটটা জেককে দেখালো সে, চ্যাপ্টা হয়ে আছে। ফিসফিস করে বললো, লাশটার ভেতর থেকে পেয়েছে সে।

বুলেটটা হাতের তালুতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো জেক, ভালো করে পরীক্ষা করলো। ‘নাইন মিলিমিটার কিংবা নাইন পয়েন্ট থ্রি,’ মৃদুকণ্ঠে বললো ও। ‘স্পোর্টিং ক্যালিবার-মিলিটারি নয়।

‘ইথিওপিয়ার এদিকে এমন কোনো রাইফেল আছে ব’লে আমি বিশ্বাস করি না যা দিয়ে এই বুলেট ছোঁড়া যেতে পারে।’ গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম গম্ভীর, তার চোখে উদ্বেগ। ‘রাইফেলটা অবশ্যই কোনো বিদেশীর।’

‘এখুনি ঢাক-ঢোল পেঁটাবার দরকার নেই,’ ব’লে বুলেটটা গ্রেগোরিয়াসকে ফিরিয়ে দিলো জেক। ‘তবে কথাটা আমরা মনে রাখবো।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলেই যাচ্ছিলো গ্রেগোরিয়াস, হঠাৎ জেকের একটা হাত আঁকড়ে দূরে নিজের দিকে টানলো ওকে, পরম শ্রদ্ধার সাথে আলিঙ্গন করলো। ‘জেক,’ পিছিয়ে গিয়ে বললো সে, ‘হোক আহত, তবু প্রায় খালিহাতে একটা সিংহকে মেরে ফেলা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বহুবীর চেষ্টা করেও একটা সিংহ শিকার করতে পারি নি।’ গ্রেগোরিয়াসের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে হাসলো জেক, ছেলেটার ভাবাবেগ ও উপলব্ধি ওর মনে দোলা দিয়ে গেলো। ‘দ্বিতীয় সিংহটা এলে তাকে বলবো, দাঁড়াও, গ্রেগোরিয়াসকে খবর দিই-কেমন?’

বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরের চারদিকে ঘাসে ঢাকা। অ্যাওয়াস নদীর আঁকাবাঁকা পাড় ধ’রে এগোলো ওরা। দূর দিগন্তে অসমান রেখাগুলো পাহাড়, প্রতি ঘণ্টায় দ্রুত কমে আসার সাথে সাথে আকাশের গায়ে উঁচু হ’তে শুরু করলো ওগুলো, ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পাথরের দীর্ঘ পাঁচিল আর ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা গভীর খাদগুলো অস্পষ্টভাবে চেনা গেলো।

নদীর পাড় ঘেঁষা এই পথ হাজার বছর ধ’রে মরুবাসীর ব্যবহার করে আসছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে একা এই পথে কেউ কোনো কালে আসে নি-ব্যবসা, যুদ্ধ বা দেশত্যাগের উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু কাফেলার সাথে আসা-যাওয়া করেছে। হঠাৎ করে সামনের পথে একটা ছেদচিহ্ন দেখতে পেলো ওরা, নদীর খাড়া পাড় খানিকটা সমতল

হয়ে রয়েছে ওখানটায়, ঢালও ততো খাড়াভাবে নেমে যায় নি। ঢালের গায়ে অসংখ্য সরু পথ দেখলো ওরা, বোঝাবাহী পশুদের এই সব পথ দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রতিটি পথ লাল মাটির গভীর নালার মতো, বড় বড় পাথর আর পাথরের পাঁচিলগুলোকে এড়িয়ে এঁবেবঁকে নেমে গেছে নদীর দিকে।

পাড় আরো সমতল করা দরকার, খালি গায়ে তিনজনই ওরা কাজে নেমে পড়লো। দেখতে দেখতে মিহি ধুলো লেগে লাল হয়ে উঠলো ওদের চুল আর গা। পথগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে চওড়াটা বেছে নিলো জেক, সেটাকে আরো চওড়া করার জন্যে গাধার খাটুনি খাটতে হলো। পথের মাঝখানে কোথাও গর্ত রয়েছে, আবার কোথাও ফুলে আছে মাটি, সেগুলো সমান করতে হলো। পথ চওড়া করতে গিয়ে কিছু বড় পাথর সরালো ওরা, ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে ফেলে দিলো নদীতে। সন্ধ্যার সময় কাজ বন্ধ করলো ওরা, সবাই এতো ক্লান্ত যে কথা বলারও শক্তি নেই। রাতে ওরা ঘুমালো মড়ার মতো।

ভোর অন্ধকারে আবার ওদেরকে কাজে ফিরিয়ে আনলো জেক। আরো প্রায় দু'ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ধারণা করা হলো, এবার বোধহয় গাড়িগুলো নিয়ে নিচে নামা যাবে। প্রথম গাড়িটায় গ্যারেথ থাকবে, টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, সারা গায়ে লাল ধুলো নিয়ে ভান করছে কায়িক পরিশ্রমে তার মর্যাদা বা ফুলবাবু ভাবটুকু মোটেও ক্ষুণ্ণ হয় নি। জেকের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসলো সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললো, 'দুর্ঘটনায় আমি মারা গেলে আমার ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তির মালিক তোমরা।'

পাড়ে উঠে গেলো আর্মারড কার, কিনারা থেকে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করবে এবার। সাধ্যমতো চওড়া করা হয়েছে পথটা, কিন্তু ঢালু ভাব কমিয়ে যথেষ্ট লেভেল করা যায় নি, দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। সে জন্যে অবশ্য সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছে। গ্যারেথের গাড়ি যদি হুমড়ি খেয়ে বা ডিগবাজি খেয়ে পড়তে শুরু করে, ওটাকে টেনে রাখবে প্রিসিলার সাথে বাঁধা মোটা একাধিক রশি। তবে না, কোনো অঘটন না ঘটিয়েই ঢাল বেয়ে নেমে গেলো গ্যারেথ।

নদীর ওপরের ঢাল বেয়ে ওঠা তেমন কঠিন হ'লো না, যদিও সময় লাগলো প্রচুর। ওদিকের ঢাল যথেষ্ট চওড়া, তেমন খাড়াও নয়। লাইন ব্যবহার করলো জেক, একটা গাড়ি আরেকটাকে টেনে তুলে নিলো। রোদে পোড়া ইথিওপিয়ান শক্ত মাটিতে যখন পা রাখলো ওরা, বিকেল প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। নিতম্বিনীর ফেলা ছায়ায় ব'সে হাঁপাতে লাগলো তিনজনই, ব্যস্তভাবে ওদেরকে মগভর্তি গরম চা পরিবেশন করলো ভিকি।

গরম চা খেয়ে জিভ পুড়ে গেলো থ্রোগোরিয়াসের। 'সামনে আর কোনো বাধা নেই,' বললো সে। 'ওয়েলস অব চান্ডি অর্থাৎ কুয়া পর্যন্ত খোলা মাঠ। হঠাৎ তিনজনের দিকে পালা করে তাকালো সে, ক্লান্ত চেহারায় উজ্জ্বল হাসি ফুটলো। 'ওয়েলকাম টু ইথিওপিয়া!'

'সত্যি কথা বলতে কি, ওল্ড বয়, তোমার এই রোদ আর বালির বদলে প্যারিসের একটা পানশালাই আমি বেশি পছন্দ করবো,' বললো গ্যারেথ, মিটিমিটি হাসলো।

‘আমার দুধ-সাদা অভিজাত হাতে চকলেট মিখায়েল সোনাভর্তি ঝোলাটা ধরিয়ে দিক, পরমুহূর্তে সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে তোমরা।’

আচমকা দাঁড়ালো জেক, কপালে হাত রেখে দূরে তাকালো। তাপ-তরঙ্গের ভেতর দূরের মাটি তরল পদার্থের মতো টলটল করছে। ছুটলো ও, প্রিসিলার কাছে পৌঁছে থামলো, লাফ দিয়ে উঠে পড়লো টারিটে। আবার যখন নেমে এলো, হাতে একটা বাইনোকুলার রয়েছে। সবাই ঘিরে দাঁড়ালো ওকে, দূরে কী যেনো দেখার চেষ্টা করছে ও।

‘ঘোড়সওয়ার!’ বললো জেক।

‘ক’ জন?’ দ্রুত জানতে চাইলো গ্যারেথ, মারমুখো চেহারা।

‘মাত্র একজন। এদিকেই আসছে।’

ছুটে গিয়ে লী এনফিল্ড রাইফেলটা তুলে নিলো গ্যারেথ, ব্রিচে কার্টিজ ভরলো।

খালি চোখে এতোক্ষণে ওরা তাকে দেখতে পেলো, তাপ-তরঙ্গের ভেতর লম্বা পতাকার মতো কাঁপছে, ঘোড়া আর তার সওয়ার যেনো মাটি স্পর্শ না করে উড়ে আসছে ওদের দিকে। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেলো, ঢাল বেয়ে আবার ওঠার পর আগের চেয়ে অনেক বড় হ’লো আকার-আকৃতি, ছুটন্ত ঘোড়ার পিছনে অলসগতি মেঘের মতো ধুলো ভাসছে। আরো অনেক কাছে চলে আসার পর ঘোড়সওয়ারের শুধু কাঠামোটা চেনা গেলো।

তীক্ষ্ণ একটা উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এলো গ্রেনোরিয়াসের গলা চিরে, রোদে বেরিয়ে এসে ছুটলো আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলো ঘোড়সওয়ার, দক্ষতার সাথে অকস্মাৎ বিশাল সাদা স্ট্যালিয়নের লাগাম টেনে ধরলো সে, সাথে সাথে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হ’লো ঘোড়া। ঘোড়া থেকে উড়াল দেয়ার ভঙ্গিতে শূন্য লাফিয়ে পড়লো, নামলো গ্রেনোরিয়াসের প্রসারিত দুই বাহুর মাঝখানে।

দুটো মূর্তি পরমানন্দে জোড়া লেগে থাকলো, দীর্ঘদেহী গ্রেনোরিয়াসের আলিঙ্গনের ভেতর আগন্তুককে হঠাৎ করে ছোটো আর ভঙ্গুর লাগলো, ওদের হাসি আর অভ্যর্থনা তীক্ষ্ণকণ্ঠ পাখির মতো।

পরস্পরের হাত ধরে, একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাড়ির পাশে অপেক্ষারত দলটার দিকে এগিয়ে এলো ওরা।

‘ঈশ্বরপুত্র বীশু আর মাতা মেরীর কিরে,’ কসম খেয়ে বললো গ্যারেথ, ‘আরেকটা মেয়ে!’ তার চোখে আনন্দ আর বিস্ময়ের ঢল নেমেছে, হাতের রাইফেল তাড়াতাড়ি একপাশে রেখে দিলো।

সবাই ওরা একহারা গড়নের সুশ্রী কমবয়সী শ্যামলা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সাদার ওপর কালো মণি ছটফট করছে, হাসি আর কৌতুকের একজোড়া প্রাণবন্ত উৎস। লম্বা পাতার ভেতর বড় বড় চোখে রাজ্যের দুষ্টামি। গায়ের চামড়া চকচকে সিল্ক, নাকটা প্রায় খাড়া, জড়তাহীন হাঁটার ভঙ্গিতে অপূর্ব একটা ছন্দ ফুটে ওঠে।

‘সারা সাগুদ-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি?’ আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞেস করলো গ্রেনোরিয়াস। ‘ও আমার কাজিন, আমার কাকার বড় মেয়ে, এবং কোনো সন্দেহ নেই, গোটা ইথিওপিয়ায় ও-ই সবচেয়ে সুন্দরী।’

‘কী বলছো বুঝতে পারছি,’ বললো গ্যারেথ। ‘ইথিওপিয়ার একটা দুর্লভ পাখি। সত্যি অত্যন্ত ভাগ্যবান আমরা।’

সবার নাম উচ্চারণ করে পরিচয় জানালো গ্রেগোরিয়াস, প্রত্যেকের চোখে সরাসরি তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো সারা, প্রাচীন মিশরীয় রাজকুমারী নেফারতিতি’র মতো অভিজাত লম্বাটে চেহারা শান্ত সমাহিত ভাবটুকু ওদের দৃষ্টি কাড়লো। তার হাবভাব আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হ’লো ওরা যেনো তার কতোদিনের পরিচিত। ‘আমি জানতাম, ঠিক এখানটায় তোমরা অ্যাওয়াস পেরোবে, এটাই তো একমাত্র জায়গা-তাই দেখা করার জন্যে চলে এলাম।’

‘ওর ইংরেজি শুনে অবাক হচ্ছেন?’ সগর্বে বললো গ্রেগোরিয়াস। ‘কৃতিত্বটা আমার দাদার, তাঁর পরিবারের সবাইকে তিনি ইংরেজি শিখতে বাধ্য করেছেন। ইংরেজির দারুণ ভক্ত তিনি।’

‘বাহ,’ প্রশংসা করলো ভিকি কেমবারওয়েল, ‘তোমার ইংরেজি উচ্চারণ তো দারুণ ভালো।’

‘মিশনারি স্কুলে পড়েছি, এগিয়ে এসে ভিকির হাত ধ’রে তার পাশে দাঁড়ালো সারা, যেনো এতোক্ষণে সে তার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পেলো। ‘ওখানকার সিস্টাররা আমাকে শিখিয়েছে।’ ঘাড় ঘুরিয়ে নানাভাবে ভিকিকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো সে, যেনো প্রিয় কোনো উপহার নেড়েচেড়ে দেখছে, কোনোরকম রাখ-ঢাক না করে খোলাখুলি বললো, ‘তুমি সাংঘাতিক সুন্দরী, মিস কেমবারওয়েল। শীতের সময় হাইল্যান্ডের ঘাসের মতো চুল তোমার।’

এ-ধরনের অকপট প্রশংসা শুনে অভ্যস্ত নয় ভিকি, পুরুষদের চোখের সামনে বেচারি লজ্জায় পড়ে গেলো। অস্বস্তি দূর করার জন্যে হাসলো বটে, কিন্তু তার চেহারা সামান্য লালচে হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে সাগুদ সারা’র চঞ্চল দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে আর্মারড কারগুলো। ‘ওগুলোও ভারি সুন্দর। সবাই জেনে আসছে, কাজেই কারো মুখে অন্য কোনো কথা নেই।’ কোমরের ফিতে খুলে ঢোলা আলখাল্লাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেললো সে, গ্রেগোরিয়াসের হাতে ধরিয়ে দিলো। তার পড়নে এখন স্কাট আর খাটো ব্লাউজ। প্রাণচঞ্চল কিশোরের মতো গাড়িগুলোর দিকে ছুটে গেলো সে, রঙ্গিলার গায়ে হাত রেখে দাঁড়ালো। ‘আর কোনো চিন্তা নেই, এগুলো পাওয়ায় এখন আমরা ইতালিয়দের এক হাত দেখে নেবো। আমাদের গোত্রের বীরের কোনো অভাব নেই, অভাব ছিলো অস্ত্র আর ও অর মেশিনের।’ পালা করে গ্যারেথ আর জেকের দিকে মনোযোগ দিলো সে। ‘আমার গোত্রের তরফ থেকে আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এই উপকারের কথা আমরা কখনো ভুলবো না।’

‘বাদ দাও মাই ডিয়ার গার্ল,’ বিড়বিড় করে বললো গ্যারেথ। ‘গোটা ব্যাপরটাই আনন্দময় অভিজ্ঞতা। তার ইচ্ছে হ’লো জিজ্ঞেস করে, তার বাবা কি মনে করে নগদ টাকা সাথে করে এনেছে? লোভী বা নির্লজ্জের মতো শোনাতে ভেবে প্রশ্নটা করলো না সে। ‘তোমার গোত্রের লোকজন কি আমাদের জন্যে কুয়ার কাছে অপেক্ষা করছে?’

‘বাবার সাথে আমার সব কাকা আর দাদাও এসেছেন—ওদের সাথে কয়েকশো হারারি আছে। মেয়ে-বউ আর পশুদেরও নিয়ে এসেছে তারা।’

‘লে বাবা,’ হেসে ফেললো জেক। ‘এ-ধরনের রিসেপশন কমিটির কথা জীবনে শুনি নি।’

অভিযানের শেষ রাতটায় একটা কাঁটাগাছের প্রসারিত ডালের নিচে ক্যাম্প ফেললো ওরা, অ্যাওয়ার্স নদীর কিনারায়। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলো সারা, আগুনটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসলো দুর্গ প্রাচীরের মতো ওদেরকে ঘিরে থাকলো চারটে আর্মারড্ কার। গভীর রাতে থামলো গল্প, শান্ত নিশ্চিন্তা নেমে এলো আগুনের ধারে, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ভিকি কেমবারওয়েল। ‘একটু হাঁটা-হাঁটি করে শুতে যাবো আমি।’

তার সাথে উঠে দাঁড়ালো সারাও। ‘আমিও তোমার সাথে হাঁটবো।’ এরইমধ্যে রীতিমতো ভক্ত হয়ে উঠেছে সে ভিকির।

ক্যাম্পের বাইরে এসে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো ওরা, মাথার ওপর আকাশ ভর্তি তারা জ্বলজ্বল করছে। আলতোভাবে ভিকির কজি ধরে মৃদু চাপ দিলো সারা।

‘কিছু বলবে?’ জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

ভিকির দিকে গম্ভীর মুখে তাকালো সারা, তারার আলোয় ঝিক করে উঠলো তার চোখের মণি। ‘ওরা দু’জনেই তোমাকে মারাত্মকভাবে কামনা করে—জেক আর গ্যারেথ।’

আড়ষ্ট কণ্ঠে হেসে উঠলো ভিকি, সারার সরাসরি কথা বলার ধরন দ্বিতীয় বার তাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিলো। ‘কি যা-তা বলছো।’

‘যা-তা নয়, খাঁটি সত্যি কথা। যখনই তুমি ওদের কাছাকাছি হও একজোড়া কুকুরের মতো হয়ে যায় ওরা—আড়ষ্ট পিঠ বাঁকা করে পরস্পরকে ঘিরে ঘরতে থাকে, যেনো পরস্পরের লেজ গুঁকতে চাইছে। চাপা গলায় খিকখিক করে হেসে উঠলো সারা, তার সাথে ভিকিকেও হাসতে হলো।

‘না, মনে, ব্যাপারটাকে এভাবে না দেখে....,’ শুরু করলো ভিকি, কিন্তু বাধা দিলো সারা।

‘দু’জনের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ, ভিকি?’ সিরিয়াস হয়ে জানতে চাইলো সে।

‘গড, পছন্দ করতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?’ ভিকির মুখে এখনো হাসি।

‘না, বাছ-বিচার না করলেও পারো,’ তাকে আশ্বস্ত করলো সারা। ‘ইচ্ছে হলে দু’জনের সাথেই তুমি চালিয়ে যেতে পারো। আমি হলে তাই চালাতাম।’

‘চালিয়ে যেতে পারি....মানে?’

‘মানে প্রেম! এই সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে নাকি। আর শোনো, না বোঝার ভান করো না। ভান জিনিসটা আমি একদম সহিতে পারি না।’

হাসি গোপন করে ভিকি জানতে চাইলো, ‘তুমি হলে তাই করতে? দু’জনের সাথেই চালিয়ে যেতে?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। তা না হলে, তুমিই বলো, কাকে তুমি বেশি পছন্দ করো সেটা বোঝার উপায় কী?’

‘তা সত্যি।’ হাসি চেপে রাখায় দম বন্ধ হয়ে এলো ভিকির, তবে সারার অদ্ভুত যুক্তি রীতিমতো নাড়া দিয়েছে তাকে। ধারণাটির মধ্যে নগ্ন সত্য আর প্রচুর আবেদন রয়েছে, অস্বীকার করা যায় না।

‘গ্রেগোরিয়াসকে বিয়ে করার আগে বিশজনের সাথে প্রেম করবো আমি। শুধু এভাবেই জানা সম্ভব কোনো কিছু থেকে নিজেকে আমি বঞ্চিত করি নি, বুড়ো বয়সে সেজনে আপসোস করতে হবে না,’ ঘোষণার সুরে জানালো সারা।

‘বিশজন কেনো, সারা?’ ভিকিও সারার মতো গলার সুরে গুরুত্ব আর গাষ্ট্রীয় ফোটানোর চেষ্টা করলো। ‘তেইশ বা ছাব্বিশ জন নয় কেনো?’

‘ধ্যৈ, কী যে বলো না!’ সাথে সাথে তিরস্কার করলো সারা। ‘লোকে তাহলে আমাকে খারাপ মেয়ে বলবে যে!’ এরপর আর হাসি চেপে রাখা ভিকির পক্ষে সম্ভব হ’লো না।

‘কিন্তু... তুমি...,’ বর্তমানের জরুরি সমস্যায় ফিরে এলো সারা, ‘কাকে আগে পরীক্ষা করার কথা ভাবছো?’

‘তুমিই না হয় আমার হয়ে একজনকে বাছো,’ আমন্ত্রণ জানালো ভিকি।

‘কাজটা কঠিন,’ স্বীকার করলো সারা। ‘একজন শক্তিমান, আমুদে। অপরজন খুবই সুদর্শন, দারুণ পটু’ মাথা নাড়তে নাড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। ‘না, সত্যিই ভারি কঠিন। উঁহু, না ভাই, এ-কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি শুধু কামনা করতে পারি, তুমি সুখী হও।’

যতোটুকু বুঝতে পারলো, আলোচনাটা তারচেয়ে বেশি নাড়া দিয়ে গেছে ভিকিকে। সারাটা দিন পথে থাকায় চরম ক্লান্ত হলেও, ঘুমোতে পারলো না সে। পাথরের মতো শক্ত মাটিতে একটা মাত্র চাদর বিছিয়ে শুয়েছে, শুধু এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকলো—নিষিদ্ধ, চিন্তারও অতীত ধারণাটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারছে না। আস্তে আস্তে গা থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসলো সাগুদ সারা। সাবধানে দাঁড়ালো, তার ধারণা কেউ জেগে নেই। নিঃশব্দ পায়ে গ্রেগোরিয়াসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসলো সে, গ্রেগোরিয়াসের বুকে হাত রেখে মৃদু ধাক্কা দিলো। বোধহয় অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রেগোরিয়াস, একবার ধাক্কা খেয়েই উঠে বসলো সে। ভিকি দেখলো, আলখাল্লা খুলে ফেলেছে মেয়েটা, পড়নে এখন শুধু অন্তর্বাস। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো দু’জন। চাঁদের আলোয় পালিশ করা মূর্তির মতো চকচকে সারা’র নগ্ন শরীর। ছোটো ছোটো উদ্ধত বুক, সরু কোমড়। তার কাঁধে একটা হাত রাখলো গ্রেগোরিয়াস, দু’জন বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প থেকে।

ওদেরকে এভাবে যেতে দেখে আরো অস্থির হয়ে উঠলো ভিকির মন। রাতের মরুতে অচেনা কতো রকম শব্দ, কান পেতে শুনতে লাগলো সে। একবার মনে হ’লো মানুষের নরম গলা শুনছে, কে যেনো ফুঁপিয়ে উঠলো কোথাও। তবে দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকও হ’তে পারে। ওরা দু’জন ফিরে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়লো ভিকি কেঁমবারওয়েল।

সপ্তম দিনে জেনারেল ডি বোনো'র পাঠানো জরুরি রেডিও মেসেজ পেয়ে যার-পর-নাই রাগত হ'লো কাউন্ট আলদো বেলিনি। 'ব্যাটা আমাকে অধীনস্ত মনে করেছে,' নিজের অফিসারদের কাছে বললো সে। লম্বা কাগজের টুকরোটা রুদ্ধ গলায় প'ড়ে চললো কাউন্ট, 'এই মুহূর্তে আপনাকে সরাসরি নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে,' কপট অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো বেলিনি। 'কোনো অনুরোধ নেই, কোনো "দয়া করে" নেই।' কাগজের টুকরোটা দলা পাকিয়ে, অভিজাত ভঙ্গিতে তাঁবুর এ মাথা, ও মাথা বরারব পায়চারি করতে লাগলো সে। একহাত পিস্তলের বাঁটে, অপর হাত ছোরার হাতলে।

'মনে হচ্ছে, আমার বার্তা তার কানে পৌঁছে নি। সশরীরে গিয়ে পরিস্থিতি বুঝিয়ে আসতে হবে তাকে।' আরামদায়ক রোলস রয়েসে করে আসমারায় ফিরে যেতে কোনো সমস্যা হবে না। একটা মার্বেল গোসল, পরিষ্কার কাপড়-চোপড়, ঠাণ্ডা কফি, উঁচু ছাদ আর বৈদ্যুতিক পাখা এবং রোম থেকে আসা নতুন পত্রিকা আর শুভানুধ্যায়ী আর ক্যাসিনো হঠাৎ করেই দারুণ লোভনীয় মনে হ'তে লাগলো কাউন্টের কাছে। এছাড়াও, কাগজে মুড়ে রাখা সিংহের চামড়াগুলোর অবস্থা নিয়েও শক্তিত সে। জেনারেল ব্যাটাকে নিজের পারিবারিক প্রতিপত্তি আর রাজনৈতিক ক্ষমতার কথাটাও মনে হচ্ছে আবার মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন।

'জিনো,' গর্জে উঠলো কাউন্ট। সাথে সাথে ক্যামেরা ফোকাস করে তাঁবুর উদ্দেশ্যে ছুটে এলো জিনো।

'এখন নয়, এখন নয়!' এক হাতের ঝাঁপটায় ক্যামেরা সরিয়ে দিলো কাউন্ট। 'জেনারেলের সাথে সাক্ষাতের জন্যে আসমারায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। আমার ড্রাইভারকে বলো।'

চব্বিশ ঘণ্টা পর তিভুমনে আসমারা থেকে ফিরে এলো কাউন্ট। সারাজীবনেও এতো খারাপ আচরণ করে নি কেউ তার সাথে। তাকে রোমে ফেরত পাঠানোর হুমকিটা বড়ো লেগেছে কাউন্টের বুকে।

সেই ঝুঁকি এখনো আছে। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে ওয়েলস অব চান্ডি পৌঁছে ওটা কজা করতে হবে তাকে। নয়তো, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটে গ্যারিবোল্ডি জাহাজে করে নেপোলি ফিরে যেতে হবে।

জেনারেল ডি বোনো'র ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে বেশ ক' পাতা লিখে বেনিটো মুসোলিনিকে কেবল করলো কাউন্ট। তার জানা নেই, আগে ভাগে এটা অনুমান করে সেই কেবল ইন্টারসেপ্ট করে বাতিল করেছেন জেনারেল বোনো।

সামনে বাড়ার নির্দেশকে খুব একটা পান্ডা দিলো না মেজর ক্যাস্তেলানি। তার জানা আছে, যে কোনো মুহূর্তে উল্টো ঘোষণা আসতে পারে। পড়ন্ত বিকেলে সবচেয়ে সামনের ট্রাকে চেপে চান্ডির কুয়োর উদ্দেশ্যে এগোতে লাগলো মেজর, পিছনে ইতালিয় বাহিনী।

ইথিওপিয়ার বিশাল পার্বত্য এলাকা জুড়ে প্রতি বছর তুমুল বৃষ্টিপাত হয়, সেই পাহাড়ী ঢল লক্ষ লক্ষ জলপ্রপাত আর নালা বেয়ে নেমে আসে উপত্যকা আর নিম্নভূমিতে। মাটির ওপর পানির এই প্রবাহ বেশিরভাগটাই অবশেষে সাড জলাভূমির নিষ্কাশন ধারার সাথে মিশে যায়, সেখান থেকে গিয়ে পড়ে নীল নদে, তারপর উত্তরে এগিয়ে মিশর হয়ে বিলীন হয়ে যায় ভূমধ্যসাগরে।

সামান্য কিছু পানি পথ ভুলে চোরা বা একমুখো নদীতে গিয়ে পড়ে, তারই একটা হ'লো অ্যাওয়াস। কিছু পানি পথ ভুল করলেও, শেষ পর্যন্ত কোনো নদীর সাথে মিলিত হ'তে পারে না-নরম মাটি, বৃক্ষহীন প্রান্তর বা মরুভূমি শুষে নেয়।

স্বতন্ত্র কিছু ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতির কারণে এই সাধারণ নিয়ম লংঘিত হয়, এর জন্যে দায়ী স্ফটিক শিলার একটা স্তর। স্তরটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে বিস্তৃত হয়ে সমতলভূমির লাল মাটির তলায় পৌঁছে একটা অগভীর পিরিচের আকৃতি নিয়েছে। পাহাড়ী ঢলের একটা অংশ এই স্তরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তৈরি করেছে সরু আর লম্বা একটা আভারখাউন্ড রিজারভয়ার, সারডি গিরিসংকটের গোড়া থেকে শুকনো উত্তপ্ত বৃক্ষহীন প্রান্তরের নিচে বিস্তৃত হয়ে আছে একটা আঙুলের মতো।

পাহাড়ের কাছাকাছি পানির গভীরতা বেশি, মাটি থেকে কয়েক শো ফুট নিচে। কিন্তু তারপর, মাটি যেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে তেমনি ঐ শিলাস্তর ও ক্রমশ উঁচু হয়েছে, ফলে পানির স্তর উঠে এসেছে-মাটি থেকে মাত্র চল্লিশ ফুটের মধ্যে।

হাজার হাজার বছর আগে দলবদ্ধ বুনো হাতিদের বিচরণক্ষেত্র ছিলো এলাকাটা। কীভাবে যেনো পাতাল লেকের সন্ধান পেয়ে যায় ওরা। পা আর দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে পৌঁছে যায় পানির সারফেসে। শিকারীরা হাতির বংশ প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে, কিন্তু তাদের কুয়া আজও খোলা রেখেছে অন্যান্য পশুরা-বুনো গাধা, হরিণ, উট আর হাতি নিধনযজ্ঞের হোতা মানুষ।

কুয়াগুলো, দু'তিন মাইলের মধ্যে বারা-তেরোটা হবে, লাল মাটিতে গভীর গর্তের মতো। প্রতিটি কুয়ার গা বেয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ নেমে গেছে, এতো খাড়াভাবে যে পানির ওপর সূর্যের আলো পৌঁছায় না বললেই চলে।

পাতাল লেকের পানিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি, দেখতে সবুজ দুধের মতো, খেতেও বিস্বাদ লাগে, তবু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিপুল সংখ্যক প্রাণীকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে। বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তরের এই একটামাত্র এলাকাতেই ঘন হয়ে গাছপালা জন্মেছে, চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি।

কুয়াগুলো ছাড়িয়ে, পাহাড়ের দিকে এগোলে যে এলাকাটা সামনে পড়বে, সেটা ভাঙাচোরা আর এলোমেলো-অসংখ্য চৌকো টিলা আর নদী-নালায় ভর্তি। টিলাগুলো একেবারে নিচু, আর বৃষ্টি না হলে শুকনো থাকে নদীনালা। যুগ যুগ ধ'রে যেসব রাখাল পশুর পাল নিয়ে কুয়ার উদ্দেশ্যে এসেছে, ওই টিলা আর নালায় পাড়ে গুহার ভেতর বিশ্রাম নিয়েছে বা রাত কাটিয়েছে তারা। এলাকা জুড়ে গুহা আর সুড়ঙ্গই শুধু দেখা যায়।

প্রকৃতি যেনো কুয়াগুলোকে শান্তিপূর্ণ এলাকা ব'লে ঘোষণা করেছে। মানুষ আর পশু এখানে সতর্কতার সাথে শান্তিচুক্তি মেনে চলে, আক্ষরিক অর্থেই এক ঘাটে পানি খায়, প্রায় কখনোই শান্তি ভঙ্গ করে না। তামাটে সবুজ ঘন কাঁটাগাছের ফাঁকে বিভিন্ন জাতের হরিণ, ছাগল, গাধা, উট ইত্যাদি অবাধে বিচরণ করে।

স্ক্রু দুপুরে পূব থেকে এগিয়ে এলো চারটে আর্মারড্ কারের কলাম, অপেক্ষারত জনগোষ্ঠীর কানে দূর থেকে ভেসে এলো এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন।

কলামের সামনে রয়েছে জেক, আগের মতোই তার ঠিক পিছনে রঙ্গিলাতে রয়েছে ভিকি, তারপর গ্রেগোরিয়াস আর সারা, ওদের গাড়ির সাথে সাথে সারা'র স্ট্যালিয়নও আসছে। সবার পিছনে রয়েছে গ্যারেথ। হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো সারা যে, সব ক'টা এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো আওয়াজটা, সবুজ ঝোপ আর কাঁটাগাছ ঢাকা নিচু উপত্যকার দিকে হাত তুললো সে। কলাম দাঁড় করালো জেক, টারিটের ওপর উঠে দাঁড়ালো।

চোখে বাইনোকুলার তুলে খোলা বনভূমিটা দেখলো জেক। হঠাৎ অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়তে প্রায় আঁতকে উঠলো। যেনো ধুলোর ডানায় ভর করে ছুটে আসছে ঝাঁক ঝাঁক ঘোড়সওয়ার। 'মাই গড!' বিস্ময় ধ'রে রাখতে পারলো না ও। 'কয়েক শো মানুষ!' অস্বস্তি বোধ করছে, তার কারণও আছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওদেরকে কচুকাটা করতে আসছে।

পরমুহূর্তে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ ওর মনোযোগ কেড়ে নিলো। ঝট করে তাকাতেই দেখলো, তীরবেগে ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেলো স্ট্যালিয়নটা, শির দাঁড়া খাড়া করে ওটার খালি পিঠে ব'সে রয়েছে সাগুদ সারা, রোদের' ভেতর তীব্র বাতাসে ফুলে আছে তার সাদা আলখাল্লা। আগন্তুক ঘোড়সওয়ারদের দিকে ছুটে যাচ্ছে সারা, বিরতিহীন তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, যেনো একটা উন্মাদিনী খেপে গেছে। তার আচরণ খানিকটা আশঙ্ক করলো জেককে। কলামটাকে এগোবার সংকেত দিলো ও।

প্রথম সারির লোকগুলো পৌঁছুলো ঘোড়া আর উটের পিঠে চড়ে। কালো চেহারা সবার, কুৎসিতই বলা যায়, হিংস্র আর নির্দয় ভাব স্থায়ী ছাপ ফেলে রেখেছে মুখে। প্রত্যেকের পড়নে নোংরা ঢোলা পোশাক, গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা-সাদা, কালো, লাল সব রঙেরই আছে। কারো হাতে তলোয়ার আর ঢাল, কেউ মাথার ওপর তুলে ধরেছে বর্শা, অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখা গেলো। প্রায় সবার মাথায় কিছু না কিছু আছে-হয় পাগড়ি, নয় হেলমেট, অথবা বহুবর্ণ টুপি। পিতলের চাকতি দিয়ে তৈরি করা মালা পরেছে অনেকে, কারো গলা থেকে রঙচঙে কাপড়ের তৈরি অসংখ্য ফিতে ঝুলছে। অনেকের হাতে লাল কাপড়ের পট্রিও দেখা গেলো। কাছাকাছি এসে প্রথম সারির লোকগুলো ঘিরে ধরলো আর্মারড্ কারের ড্রাইভারদের। চারদিকে ধুলোর পাহাড় সৃষ্টি হলো। মানুষ আর পশুর ভিড়ে দম আটকে মারা যাওয়ার অবস্থা।

বেশিরভাগ লোকের দাড়ি রয়েছে, মাথাতেও কেউ কেউ লাল কাপড়ের পট্রি বেঁধেছে, দু'একজন মাথায় জড়িয়েছে সিংহের কেশর। উলুবনে শিয়াল যেমন রাজা,

ইথিওপিয়ার এদিকটার জংলী এই লোকগুলো তেমনি বীরযোদ্ধা। জেক আর ওর সঙ্গী-সাথীদের ঘিরে সত্য শুরু করে দিলো তারা, লু-লু চিৎকারে কাঁপিয়ে তুললো আকাশ-বাতাস।

আর্মস স্মাগলিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে গ্যারেথের, অস্ত্র আর গোলাবারুদ সম্পর্কে রয়েছে ভালো ধারণা, জংলী যোদ্ধাদের সংগ্রহ দেখে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলো সে। প্রতিটি অস্ত্র অত্যন্ত পুরনো হলেও, অন্তত বিশ রকমের আগ্নেয়াস্ত্র বহন করেছে তারা। কয়েক ধরনের মাটিনি হেনরি কারসারান থেকে শুরু করে লম্বা মাজল্ টাওয়ার, কী নেই। মাইজার, লী-মেটফোর্ডস-ও সংখ্যায় কম নয়। নৃত্য-গীত খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসার সাথে সাথে শুরু হ'লো ফাঁকা গুলিবর্ষণের উদ্দাম প্রতিযোগিতা। কালো ধোঁয়ার রেখা দাগ কাটলো সন্ধ্যার ম্লান আকাশে, বিস্ফোরণের অবিরাম আওয়াজের সাথে আবার শুরু হ'লো অভ্যর্থনাসূচক লু-লু চিৎকার।

দ্বিতীয় সারির লোকজন এলো গাধা, উট আর খচ্চরের পিঠে চড়ে। তারা ধীরগতিতে এলেও, কর্ণপীড়ন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকলো না। তাদের ঠিক পিছু পিছু এলো পদাতিক বাহিনী, ভিড়ের সাথে মিশে আছে মেয়েলোক, শিশু-কিশোর আর কয়েক ডজন সরব কুকুর।

ছুটন্ত মিছিলের পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হ'লো এক মহিলা, তারপর তার পেটে উটের পা পড়লো। মহিলার কোল থেকে আগেই ছিটকে পড়েছে দুধের বাচ্চাটা। সেদিকে ছুটে যাওয়ার সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লো জেকের, নিরেট পাঁচিলের মতো সচল ভিড় বাচ্চা আর তার মাকে কোথায় যে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো তাও জানার কোনো উপায় থাকলো না। বিপদটা টের পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো সাগুদ সারা। প্রথম সারির সামনে থেকে স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণস্বরে নির্দেশ দিলো সে, আবার রওনা হ'লো কলাম। প্রিসিলার সামনে থাকলো আদিবাসীদের নৃত্যরত মিছিল, নেতৃত্ব দিয়ে কুয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বীরাস্ননা সাগুদ সারা। সামনে ঘন বনভূমি, কুয়াগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বনভূমি ভেদ করে বেরিয়ে এলো মিছিল, এবার পথ করে নিতে হবে একটা অগভীর পাথুরে নালার ভেতর দিয়ে-নিচটা শুকনো খটখটে, দু'পাশে প্রায় খাড়া তার গা।

এখানে পৌঁছে সামনে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। গোটা নালা মানুষের নিরেট আবরণে ঢাকা পড়ে গেলো, এমনকি মাটি আর পাথরের খাড়া গায়ে ও মাথার ওপর সরু কার্নিসে এমন গিজগিজ করছে মানুষ যে কম ভাগ্যশালী তারা ঠেলাঠেলি সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিচে। যন্ত্রণাকাতর চিৎকার আর প্রতিবাদের কঠিন ভাষা মহা শোরগোলের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

প্রতিটি টারিট থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলো ড্রাইভাররা, যেনো গর্ত থেকে সন্ত্রস্ত ইঁদুর ঝাঁপা তুলছে। পরস্পরের সাথে অসহায় সংকেত বিনিময় করলো ওরা, এই হাস্যমার মধ্যে অন্য কোনোভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আবারও উদ্ধারকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লো সাগুদ সারা। ইতিমধ্যে জেকের একটা ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। স্ট্যালিয়ন থেকে লাফ দিয়ে জেকের গাড়ির

সামনের বনেটে নামলো সারা, আদিবাসীদের মধ্যে যারা গাড়ির গায়ে ঝুলছে বা ওপরে উঠতে চাইছে, তাদের উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ি কিল-খুসি চালালো সে। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটা দারুণ উপভোগ করছে সারা। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে, সেখানে নগ্ন রণোদ্ধাদনা ঝিলিক মারছে। ইতিমধ্যে ভোজবাজির মতো তার হাতে একটা চাবুক চলে এসেছে, অক্লান্ত উৎসাহের সাথে উত্তেজিত জনতার পিঠে হরদম চালাচ্ছে সেটা। জেকের একবার ইচ্ছে হ'লো সারাকে বাধা দেয়, কিন্তু তারপর অত্যন্ত বিপজ্জনক ভেবে বাতিল করে দিলো ধারণাটা। তার বদলে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার হাত থেকে বাঁচার অন্য কী বিকল্প উপায় করা যায় ভাবতে লাগলো। এদিক-ওদিক তাকাতে এই প্রথম নালায় গায়ে গুহাগুলো দেখতে পেলো ও।

অনেকগুলো গুহা থেকে ছড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে আদিবাসীরা। কেউ অশ্বারোহীর আঁটসাঁট পোশাক পরে আছে, কারো পড়নে খাকি হাফ প্যান্ট, প্রায় সবারই বুকে ঝুলছে অ্যামুনিশন বেল্ট, খালি পা। দু'হাতে ধ'রে মাথার ওপর মাউজার রাইফেল ঘোরাচ্ছে বন বন করে। এদের সবার মাথাতে পাগড়ি দেখলো জেক। উৎসাহের সাথে উপভোগে এরাও সারার চেয়ে কম যাচ্ছে না, তবে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার কাজে অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

‘ওরা আমার দাদার রক্ষী,’ জেকের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করলো সারা, শরীরের ওপর দিয়ে এইমাত্র বিরাট ধকল যাওয়ায় হাঁপাচ্ছে সে, কিন্তু আনন্দঘন হাতিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। ‘সত্যি আমি দুঃখিত, জেক,’ আবার বললো সে, জেক যেনো তার কতোদিনের পুরনো আর সমবয়সী বন্ধু। ‘আমার লোকজন মাঝে-মধ্যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।’

‘হ্যাঁ,’ বললো জেক। ‘আমিও তাই লক্ষ্য করছি।’

উল্টো করা রাইফেল হাতে গার্ডরা তেড়ে আসায় গাড়িগুলোর সামনে থেকে ভিড় খানিকটা কমলো। শোরগোলের মাত্রা কমে যা দাঁড়ালো তার সাথে মাঝারি ধরনের পাহাড় ধসের তুলনা করা চলে। ক্লান্ত চারজন ড্রাইভার নেমে এলো গাড়ি থেকে, গুহাগুলোর সামনে খোলা একটা জায়গার দিকে সতর্কতার সাথে নিরেট স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে এগোলো তারা। প্রতিরক্ষা জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে জেক আর গ্যারেথের মাঝখানে থাকলো ভিকি, তার পিছনে দুর্গপ্রাচীরের মতো রয়েছে থ্রেগোরিয়াস। পুরুষদের বগলের তলা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে তার পাশে এসে হাত ধরলো সারা, নিজেকে আরো খানিক নিরাপদ মনে হ'লো ভিকির।

‘প্লিজ, ঘাবড়িয়ে না,’ ফিসফিস করে অভয় দিলো সারা। ‘আমরা সবাই তোমার বন্ধু।’

‘উল্টোটা ব'লে অনায়াসে আমাকে বোকা বানাতে পারতে, সারা!’ সারার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে পাল্টা হাসলো ভিকি। ঠিক এই সময় একটা গুহা থেকে ছোট্ট মিছিলটা বেরিয়ে এলো।

মিছিলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তালগাছের মতো সরু আর লম্বা এক বৃদ্ধ, ঠিক যেনো মানুষের আকৃতি নিয়ে একটা ক্যারিকেচার। শক্ত, হাড়সর্বস্ব কাঠামোয় লাল হলুদ ঢোলা

আলখান্না বুলছে। তার হাঁটার সাথে আলখান্নার গায়ে ফুটে উঠছে পায়ের আকৃতি, এতটাই সরু যে হাড়ের ওপর কোনো মাংস আছে কিনা সন্দেহ। গাঢ় রঙের মাথায় কোনো চুল নেই, মুখে নেই কোনো দাড়ি-গোঁফ বা ভুরু।

বুলে থাকা কোঁচকানো আর বিবর্ণ চামড়ায় তার চোখ দুটো প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। মুখের ভেতর একটা দাঁতও অবশিষ্ট নেই, ফলে দু'দিকের চোয়াল ভেতর দিকে সোঁধিয়ে গেছে, ভাঁজ করে রেখেছে গোটা মুখটাকে। সব মিলিয়ে যে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হ'লো অশীতিপর্য বৃদ্ধ তিনি, কিন্তু পরমুহূর্তে ধারণাটা মিথ্যে হয়ে যায় তাঁর হাঁটার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলে। বুক ফুলিয়ে হাঁটছেন, প্রাণ-চঞ্চল যুবকের মতো দীর্ঘ পদক্ষেপে, কারুকাজ করা বাঁটসহ রাইফেলটা অনায়াসে বহন করছেন কাঁধে, চামড়া ঢাকা লম্বাটে গর্তের ভেতর থেকে শকুনের দৃষ্টি হানছেন চারপাশে। অথচ তবু জেকের মনে হলো, ভদ্রলোকের বয়স আশির কম তো হতেই পারে না।

ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে বৃদ্ধের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, সালাম করলো পায়ে হাত দিয়ে।

ফিসফিস করে ওদেরকে জানালো সারা, 'উনি আমার দাদা, রাস গোলাম। দাদা ইংরেজি জানেন না। আজও তিনি বীরযোদ্ধা হিসেবে নিজের খ্যাতি ধরে রেখেছেন—শুধু যে গোত্রপ্রধান তাই নয়, গোত্রের মধ্যে সবেচেয়ে সাহসীও বটে।'

'ড্রাইভার চারজনের ওপর চোখ বুলালেন বৃদ্ধ রাস গোলাম, ধুলো আর কাঁটাবিহীন টুইডের স্যুট পরা গ্যারেথ সোয়েলসকে তার পছন্দ হলো। সামনের দিকে লাফ দিলেন তিনি, গ্যারেথ এগিয়ে যাবার আগেই তাকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের ভেতর নিয়ে পিষতে শুরু করলেন, গ্যারেথের নাকে পিঁয়াজ-রসুন আর তামাক থেকে শুরু করে ঘাম ও ধুলোময়লার বিভিন্ন পদের গন্ধ ঢুকলো। 'হাউ ডু ইউ ডু?' সিংহের মতো গর্জে উঠলেন তিনি, তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এই একটি মাত্র বাক্যে সীমিত।

'আগেই শুনেছো, আমার দাদা ইংরেজির ভারি ভক্ত,' সগর্বে ওদেরকে জানালো গ্রেগোরিয়াস। 'সেজন্যেই তো ছেলে আর নাতি-নাতনিদের ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন।'

'দাদার বুকে যে পদকগুলো দেখছো ওগুলো তাকে ইংরেজ লর্ডের মতো অভিজাত্য দিয়েছে।' বললো সারা। বেশির ভাগই সোনার চাকতি, দু'একটা পিতলও রয়েছে।

গ্যারেথের সংগ্রাম চলছে, বৃদ্ধ রাস গোলামের আলিঙ্গন থেকে এখনো সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। সারার হাবভাব থেকে আলোচ্য বিষয় আন্দাজ করতে পারলেন বৃদ্ধ, গ্যারেথকে ছেড়ে দিলেন, ওরা সবাহী যাতে তাঁর বুকে লটকানো পদকগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে পারে। ওদেরকে গাইডও করলেন—প্রতিটি পদকের দিকে সগর্বে আঙুল তাক করলেন তিনি।

'অদ্ভুত সুন্দর, ওল্ড বয়, সত্যি অদ্ভুত সুন্দর,' ঐকমত্য ঘোষণা করলো গ্যারেথ, হাত দুটো জ্যাকেট আর মাথার চুল ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধের বক্তব্য ভাষান্তর করে ওদেরকে শোনালো সারা। 'দাদা অল্প বয়সে রানী ভিক্টোরিয়ার সেবা করেছেন, সে জন্যেই ওই পদক। তোমাদেরকে ইথিওপিয়ায় উষ্ণ

অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। বলছেন, যদিও ইংরেজরা বীর, কীর্তিমান একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে আলিঙ্গন করার সুযোগ পেয়ে তিনি ভারি গর্ববোধ করছেন। বাবার মুখে তোমার কথা আগেই শুনেছেন দাদা, জানেন তুমি একজন বীরযোদ্ধা...।’

ঠিক সেই মুহূর্তে সারার কাকাদের সাথে প্রিন্স লিজ মিখায়েল বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। ‘আমার বাবা জানতে চাইছেন,’ সহাস্যে গ্যারেথকে বললো লিজ মিখায়েল, ‘ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থাকার সময় তুমি যে পদকগুলো পেয়েছো সেগুলো সাথে করে এনেছো কিনা। বাবা চান ওগুলো পরেই তুমি তার পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।’

গ্যারেথের চেহারা এক নিমেষে কালো হয়ে গেলো। ‘খামো, ব্যস করো।’ চাপা স্বরে হিসহিস করে উঠলো সে। বিস্তর টাকা কামানো ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ভাবতেই পারে না গ্যারেথ। সংকটময় মুহূর্তটি অবশ্য কেটে গেলো, গোত্রপ্রধান রাস গোলাম গলা চড়িয়ে কাদের যেনো ডাকাডাকি শুরু করলেন।

তার নির্দেশে আরমার্ড করে চড়লো দলে দলে সৈনিক। গাড়ি থেকে অস্ত্রভর্তি কাঠের বাস্তুগুলো একের পর এক নামিয়ে আনতে লাগলো গুহার সামনে।

এবারে পুরোহিতেরা এসে গাড়ি এবং অস্ত্রগুলোকে আশীর্বাদ করতে লাগলো একে একে।

এই সুযোগটা কাজে লাগালো সারা, ভিকির হাত ধরে একটা গুহার ভেতর চলে গেলো সে। ‘আমার চাকর তোমার জন্যে গোসলের পানি নিয়ে আসবে,’ বললো সে। ‘উৎসব অনুষ্ঠানে তোমাকে সাংঘাতিক সুন্দর দেখানো চাই। আমরা হয়তো আজ রাতেই ঠিক করে ফেলবো তোমার জন্যে ওদের মধ্যে কাকে বাছা যায়।’

গাড় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে রাস গোলামের অনুসারীরা মূল নালায় শৃংখলা বজায় রেখে জড়ো হলো। যারা গোত্রপ্রধানের প্রিয় বা সম্মানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী অথবা যারা ভিড়ের গায়ে ঠ্যালা-গুঁতো দিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে পারলো তাদের জায়গা হ’লো মাঝখানের সবচেয়ে বড় গুহাটায়। বাকি সবাই উপত্যকা জুড়ে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে বসলো। চারদিকে আলখাল্লা পরা কালো মূর্তি গিজগিজ করছে। গোল হয়ে ব’সে আগুন জ্বালালো প্রতিটি দল, একশোরও বেশি অগ্নিকুণ্ডের আলো প্রতিফলিত হ’লো রাতের আকাশে ভাসমান সাদা মেঘের গায়ে।

রাতের আকাশে হালকা গোলাপি আভা, বিশ কিলোমিটার দূর থেকে সেটা দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো মেজর লুইগি।

থার্ড ব্যাটালিয়ানকে থামার নির্দেশ দিলো সে, একটা ট্রাকের ছাদে উঠে রহস্যটা কী বোঝার চেষ্টা করলো, সন্দেহ হচ্ছে সদ্য অস্ত্র যাওয়া সূর্যের অলস কোনো আভা কিনা। কিন্তু না, ব্যাপারটা সে রকম মনে হ’লো না।

লাফ দিয়ে নিচে নামলো সে, ড্রাইভারের দিকে আঙুল তাক করে বললো, ‘অপেক্ষা করো।’ ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকগুলোকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোলো সে, কমান্ড কারের দিকে যাচ্ছে।

‘মাই কর্নেল।’ রোলস-রয়েসের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভেতরে তাকালো সে।

গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে রয়েছে কাউন্ট আলদো বেলিনি, চোখ দুটো বন্ধ। ভঙ্গিটা মস্কো ফেরত পরাজিত নেপোলিয়নের মতো। জেনারেল ডি বোনোর শীতল আচরণ তার আহমিকা, আভজাত্য আর গর্বে আঘাত করেছে, সেটা এখনো ভুলতে পারছে না সে। মেজর র উপস্থিতি টের পেলেও এমন কোনো ভাব দেখালো না যাতে বোঝা যায় জেগে আছে। তবে মেজরের কথা শেষ হ’তে নিস্তেজ গলায় বললো, ‘পরিস্থিতি বুঝে যা ভালো মনে হয় করো। শুধু একটা ব্যাপারে লক্ষ্য রেখো, সকালের আগেই ওয়েলস অব চান্ডি যেনো আমাদের দখলে চলে আসে।’ ভাবছেন, মুসেলিনি কি পেয়েছে তার বার্তাটা।

পরিস্থিতি বুঝে মেজর থার্ড ব্যাটালিয়ানকে সেই মুহূর্তে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দিলো। কোনো অবস্থাতেই আলো জ্বালা চলবে না, এমনকি জোরে কথাও বলা নিষেধ। এরপর সামনে বাড়ার নির্দেশ দিলো সে, তবে আন্তে-ধীরে। ট্রাক বহর শম্বুক গতিতে এগোলো, এঞ্জিনের আওয়াজ যতোটা সম্ভব কমিয়ে রাখা হলো। সৈনিকরা সবাই যে যা অস্ত্র নিয়ে তৈরি অবস্থায় থাকলো।

দশ মিনিট পর রণকৌশল স্থির করে ফেললো মেজর। কোথায় মোটরপুল থাকবে, কোথায় রাত কাটাবে সৈনিকরা, মেশিনগান বসানোর জায়গা, রাইফেল ট্রেঞ্চের নির্দিষ্ট স্পট, এক এক করে সব ঠিক করে ফেললো সে। ভালো করে কিছু না দেখেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাকে সমর্থন জানালো কাউন্ট আলদো। শান্তভাবে কয়েকটা নির্দেশ দিলো মেজর, ফলে পরিষ্কার হয়ে গেলো রাতে আর সৈনিকরা গুমানোর সময় পাবে না। ‘আর যদি কারো হাত থেকে শাবল পড়ে যায় বা কেউ যদি হাঁচি দেয়, তাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবো-তারই নাড়ি গলায় বেঁধে।’ নিচের আলোর দিকে তাকিয়ে নিজের বাহিনীকে সতর্ক করে দিলো মেজর ক্যান্ডেলানি।

বড় গুহাটার ভেতর বাতাস এতো ভারি আর গরম, যেনো ভিজে একটা উলেন কম্বলের নিচে চাপা পড়েছে ওরা। আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, যতোদূর দেখা যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। দানবীয় ছায়া ফেলে ছুটোছুটি করছে চাকরবাকররা। অভিযাত্রী, অতিথি বা সৈনিকরা মুহূর্তের জন্যেও মুখের কামাই দিচ্ছে না, অনর্গল বকবক করে চলেছে, সেই সাথে সবজান্তার ঢঙে মাথা ঝাঁকানোর কোনো বিরাম নেই। খানিক পরপরই আতংকিত ঘাঁড়ের ডাক ভেসে আসছে। হঠাৎ করে থামছে সেই ডাক, বুঝতে অসুবিধে হয় না কসাই তার ছোরাটা এতোক্ষণে ঠিকমতো চালাতে পেরেছে ওটার গলায়। তারপরই আরেকটাকে মাটিতে ফেলার আওয়াজ ভেসে আসছে, গুহার অদৃশ্য দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে

আওয়াজটা। পশু ধরাশায়ী হওয়ায় উল্লাসে মাতামাতি করছে দর্শকরা। ঝাঁড় জবাই হলেই দশ-বারো জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাল ছাড়াতে লেগে যাচ্ছে, রক্তাক্ত মাংসের ফালি মাটির বড় বড় পাত্রে তোলা হচ্ছে।

পাত্রগুলো নিয়ে হাঁচট থেকে খেতে গুহার ঢুকছে চাকররা, মাংসের ফালি তখনো কাঁপছে একটু একটু, ধোঁয়াটে তাপও উঠছে সামান্য। প্রতিটি পাত্র নামাতে যা দেরি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেটার দিকে। রক্তা ঝরা ফালি হোঁ দিয়ে তুলে নিচ্ছে তারা, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে একটা প্রান্ত আটকাচ্ছে, অপর প্রান্ত টা টান টান করে এক হাতে ধরে থাকছে, আরেক হাতে ধরা ছুরি দিয়ে নাকের ডগার কাছাকাছি থেকে কেটে নিচ্ছে ফালিটা। উষ্ণ রক্ত ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, টুকরোটা একটা মাত্র ঢোকের সাহায্যে নেমে যাচ্ছে গলা দিয়ে।

আদিবাসীদের গ্রাম থেকে তৈরি করে আনা মদ খাচ্ছে, স্থানীয় ভাষায় ওরা সেটাকে তেজ বলে।

যারা শ্রদ্ধার পাত্র তাদের সাথে বসার সুযোগ হয়েছে গ্যারেথের, বৃদ্ধ রাস গোলাম আর প্রিন্স লিজ মিখায়েলের মাঝখানে। অপেক্ষাকৃত কম সম্মান যাদের তাদের সাথে বসেছে জেক আর ভিকি, গ্যারেথ আর ওদের মাঝখানে বিভিন্ন সম্মানের আরো পাঁচ-ছয়টা দল রয়েছে। ওরা বিদেশী ব'লে কাটা মাংসের বদলে রান্না করা খাসী আর মুরগি পরিবেশন করা হলো, সাথে শুকরের মাংসও প্রচুর। প্রতিটি মাংসের পাত্রে এতো বেশি মশলাবহুল ঝোল যে, কেউ পড়ে গেলে তাকে বোধহয় ডুবের মরতে হবে।

খেতে বসার আগে বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর টাকমাথা সিংহের কেশর দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন। কেশরটার চেহারা খুব করুণ, যেনো পোকার খেয়েছে, তার কারণ প্রথমবার ওটা মাথায় পরার পর পেরিয়ে গেছে চল্লিশটা বছর।

হঠাৎ করে দাঁতহীন মাড়ি বের করে আপনমনে হাসতে শুরু করলেন রাস গোলাম। হাতে পাকানো রুটিতে শুকরের লম্বা মাংস ভরে রুটিটা গোল, পাকালেন তিনি, আকারে সেটা হাভানা চুরুটের মতো হলো, ঝর ঝর করে ঝোল ঝরছে, হঠাৎ সেটা গ্যারেথের অপ্রস্তুত মুখের ভেতর সঁধিয়ে দিলেন।

‘তোমাকে ওটা হাতের সাহায্য না নিয়ে গিলতে হবে,’ তাড়াতাড়ি প্রথটা ব্যাখ্যা করলো প্রিন্স মিখায়েল। ‘এটা একটা খেলা, বাবা খুব পছন্দ করেন।’

গ্যারেথের চোখ ফুলে উঠলো, দম নিতে না পারায় টকটকে লাল হয়ে হয়ে উঠলো তার মুখ, মরিচের অসম্ভব ঝাল জিভের চামড়া পুড়িয়ে দিলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোক গিললো সে, চিবালো-এতোকিছুর মাঝেও চেহায়ায় ধরে রাখার চেষ্টা করছে হাসিখুশি অভিজাত ভাবটা।

রাস গোলাম সপ্রশংসদৃষ্টিতে অবলোকন করছেন, তাঁর ফোকলা মুখ থেকে ঝোল গড়াচ্ছে, বলিরেখাগুলো কুঁচকে সরু আর গভীর হয়ে উঠলো অর্থাৎ নিঃশব্দে হাসছেন তিনি, আর মাঝে মাঝে বিপুল উৎসাহের সাথে একই কথা বারবার উচ্চারণ করে প্রেরণা যোগান দিচ্ছেন গ্যারেথকে, ‘হাউ ডু ইউ ডু? হাউ ডু ইউ ডু?’

অবশেষে অভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রেখে মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলতে পারলো গ্যারেথ। ঘেমে গোছল হয়ে গেছে সে। বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান আবার একবার তাকে বন্ধুসুলভ

আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো। ঠোঁটে সহানুভূতিসূচক হাসি নিয়ে গ্যারেথের জন্যে তার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢাললো প্রিন্স মিখায়েল।

কিন্তু কারো কৌতুকের শিকার হওয়া গ্যারেথের ধাতে নয়। গোল্ডপ্রধানের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো সে, ঠেলে স্ক্রিয়ে দিলো গ্লাসটা, হাতছানি দিয়ে একজন চাকরকে কাছে ডাকলো। মাটির চওড়া মাত্র থেকে কাঁচা মাংসের একটা ফালি তুলে নিলো সে। ফালিটা প্রায় তার কজির মতো মোটা, লম্বায় তার হাতের চেয়ে সামান্য একটু যদি ছোটো হয়। বিনা নোটিসে ফালির একটা প্রান্ত গোল্ডপ্রধানের দাঁতহীন মাড়ির মাঝখানে ঠেসে ধরলো সে। শান্ত গলায়, হাসতে হাসতে বললো, ‘খাও বাপ, দেখ কেমন লাগে!’

বিস্ফারিত রক্তচক্ষু মেলে গ্যারেথের দিকে তাকিয়ে থাকলো বুদ্ধ। তারপর, যদিও মাংসের ফালিটা ফুলে ওঠা বিশাল জিভের মতো মুখে ঝুলে থাকায় গোল্ডপ্রধান হাসতে পারলেন না, তাঁর চোখের চারপাশে আরো কুঁচকে উঠলো চামড়া, দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো উল্লাস। তাঁর চোয়ালের কাজ দেখার মতো হলো, যেনো একটা অজগর গোটা একটা ছাগল গেলার চেষ্টা করছে। ঢোক গিললেন তিনি, ফালির এক ইঞ্চি অদৃশ্য হ’লো মুখের ভেতর। আরেকটা ঢোক গিললেন, আরেক ইঞ্চি মাংস ভেতরে ঢুকলো। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো গ্যারেথ, প্রতিটি ঢোকের সাথে মাংসের ফালিটা আকারে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোল্ডপ্রধানের মুখ খালি হয়ে গেলো, চোখ বুজে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি, চায়ের মগটা ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করলেন। ঠাণ্ডা চায়ের সাথে সেটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললেন রাস গোলাম, ঠোঁট আর মুখ থেকে কাঁচা রক্ত মুছলেন। তারপর দড়াম করে চাপড় মারলেন গ্যারেথের পিঠে। পরস্পরের হাত থেকে খেয়েছে ওরা, কাজেই ওদের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

ওদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো থ্রেগোরিয়াস মারিয়াম। বিদেশীদের পেয়ে দাদা যে খানিকটা বাড়াবাড়ি করবেন তা সে আগেই আন্দাজ করেছিল। তবে কল্পনাও করে নি একা শুধু শ্বেতাঙ্গ গ্যারেথই তাঁর দৃষ্টি কাড়বে। যাকে যার পছন্দ, এ-ব্যাপারে করার কিছু নেই। কিন্তু এ-কথাও তো সত্যি যে মাত্র ক’দিনের পরিচয়ে তারও পছন্দ হয়ে গেছে জেক বারটনকে। তার হিরোকে অবহেলা করা হবে, আর সে তা মুখ বুজে সহ্য করবে? কক্ষনো না! বেশি চিন্তা-ভাবনা করতে হ’লো না, দাদার সম্পূর্ণ মনোযোগ কাড়ার উপায় পেয়ে গেলো থ্রেগোরিয়াস। লোকে লোকারণ্য গুহা থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এলো সে, আবার যখন ফিরে এলো তখন তার হাতে সিংহের ছালটা রয়েছে। মরুর গরম বাতাস পেয়ে ইতিমধ্যে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে সেটা।

ছালটা মাথার ওপর তুলে ধ’রে গুহার ঢুকলো সে, তারপরও মেঝের একদিকে ঘষা খেলো নাকের দিক, আরেক দিকে লেজের দিক। গ্যারেথের কাঁধে হাত রেখে খোশগল্পে মেতে ছিলেন রাস গোলাম, ছালটা দেখে আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করলেন তিনি। তাঁর সামনে চামড়াটা বিছিয়ে দিলো থ্রেগোরিয়াস।

উত্তর শুনে এতোই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, নাতির হাত ধরে ঘন ঘন ঝাঁকি দিলেন বিস্তারিত আরো তথ্যের জন্যে। দাদার মেজাজ বুঝে রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা বর্ণনা করলো গ্রেগোরিয়াস, অঙ্গভঙ্গি করে দেখালো ঠিক কীভাবে আক্রমণ করেছিল সিংহটা, কীভাবে পাথর ছুঁড়ে তার ঘাড় চুরমার করা হয়।

গুহার ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা। কাছ থেকে ভালো করে শোনার জন্যে লোকজন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। গ্রেগোরিয়াস থামতে উঠে দাঁড়ালেন গোত্রপ্রধান, সরাসরি জেকের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। যাবার পথে কোথায় পা ফেলছেন দেখলেন না, ফলে তাঁর পায়ের ধাক্কায় উল্টে পড়লো ঝোল আর মাংসসহ কয়েকটা পাত্র, তেল ভর্তি মাটির একটা কলস লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন। জেকের মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল ধরে টান দিলেন তিনি, ব্যথা পাবার আগেই তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো জেক।

‘হাউ ডু ইউ ডু?’ জিজ্ঞেস করলেন রাস গোলাম, প্রচণ্ড ভাবাবেগে কাঁপছেন-খালি হাতে একজন লোক একটা সিংহকে মেরে ফেলেছে শুনে মুগ্ধ বিস্ময় আর আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। চল্লিশ বছর আগে চওড়া ফলা লাগানো তিনটা বর্ষা ভাঙার পর চতুর্থটা তিনি হারামজাদা সিংহের হৃৎপিণ্ডে গাঁথতে পেরেছিলেন।

‘দারুণ,’ মৃদু কণ্ঠে বললো জেক, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, আনাড়ির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপরই যন্ত্রণাকাতর চাপা শব্দ বেরিয়ে এলো ওর গলা থেকে, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ওকে বুকে টেনে নিয়ে পিষতে শুরু করেছেন।

ভাগ্য ভালো, প্রায় সাথে সাথেই ওকে মুক্তি দিলেন রাস গোলাম। ওর হাত ধরে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাসূচক বসার জায়গাটির দিকে এগোলেন। তাঁর এক কনিষ্ঠ সন্তানের পাঁজরে লাথি মারলেন মৃদু, সরে গিয়ে জেককে বসার জায়গা করে দিলো সে।

ঘাড় ফিরিয়ে ভিকির দিকে একবার তাকালো জেক, অসহায় ভঙ্গিতে ভুরু নাচালো। ইতিমধ্যে রুটির ওপর রান্না করা মস্ত এক টুকলো খাসির মাংস ফেলে সেটা গোল পাকিয়ে ফেলেছেন রাস গোলাম। সেটা দেখতে হ’লো হুবহু একটা টর্পেডোর মতো, অনায়াসে একটা যুদ্ধ-জাহাজকে ঘায়েল করতে পারবে। গভীর শ্বাস টেনে যতোটা সম্ভব হাঁ করলো জেক, নিজের হাতে তৈরি টর্পেডো তলোয়ারের মতো মাথার ওপর উঁচু করে ধরলেন রাস গোলাম।

‘হাউ ডু ইউ ডু?’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি, একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে জেকের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন সেটা।

একটানা দীর্ঘ সময় সতর্ক প্রহরা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে কাউন্টের বাহিনী। ওয়েলস অব চান্ডিতে পৌঁছে নিজেদের তাঁবু ফেলে বিশ্রামে যেতে উদ্বেল তারা।

মেজর তার বারোটা মিশনগান লাগলো উপত্যকার ঢালু গায়ে, যেখান থেকে বিশাল জায়গা জুড়ে তিনদিকেই গুলিবর্ষণ করা যাবে। তার একটু নিচে তৈরি করা

হ'লো রাইফেল ট্রেঞ্চ। বালি মেশানো বুরবুরে মাটি, গর্তের ভেতর পজিশন নিয়ে থাকলো রাইফেলম্যানরা। ইতিমধ্যে মেশিনগান আর ট্রেঞ্চগুলোকে রক্ষার জন্যে বালির বস্তা ফেলে পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। মর্টার কোম্পানিকে অনেকটা পিছনে রাখলো সে, রাইফেল ট্রেঞ্চ আর মেশিনগান নেস্ট ওটাকে রক্ষা করবে। সুরক্ষিত অবস্থান থেকে ওয়েলস অব চান্ডির গোটা এলাকার ওপর মর্টার বোমা ফেলতে পারবে তারা।

পেশাদার সৈনিক বলেই আক্রমণের প্রস্তুতিতে কোনো ক্রটি রাখার পক্ষপাতী নয় মেজর। তার লোকজন কাজ করছে, মেজর ব্যক্তিগতভাবে ডিফেন্সের সামনে দিয়ে বার কয়েক হেঁটে গেলো, লক্ষ্য করলো রঙ করা মেটাল মার্কারগুলোর পজিশন। কেবলমাত্র তারপরেই খাবার-দাবারের অনুমতি দিলো সে।

মদ এবং মাংস দুটোই বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, ফলে গ্যারেথের পেটটাই যে শুধু অসভ্যের মতো ফুলে উঠলো তাই নয়, চোখেও সে খানিকটা ঝাপসা দেখছে।

ওদিকে জেক আর রাস গোলামের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, ভাষার ব্যবধান কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। আর তাছাড়া, জেক যেহেতু খালি হাতে একটা সিংহকে বধ করতে পেরেছে, বিদেশী হলেও, সে তার বন্ধু বীর।

পরিবেশে উত্তেজনা আর আনন্দের খোঁরাক এতো বেশি যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলতে গ্যারেথও লজ্জা পেলো। কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেকগুলো প্রশ্ন জুলন্ত অঙ্গারের মতো তার জিভ পুড়িয়ে দিচ্ছে। শেষমেশ ব'লে ফেললো, 'চকলেট, ওন্ড বয়, আমাদের জন্যে টাকা-পয়সা সব রেডি করে রেখেছো তা?'

মনে হ'লো গ্যারেথের কথা শুনতে পায় নি প্রিন্স মিখায়েল, তবে তার গ্লাসটা শ্যাম্পেনে ভরে দিলো সে, তারপর জেকের একটা কৌতুক অনুবাদ করে শোনানোর জন্যে ঝুঁকে পড়লো তার বাবার দিকে। অগত্যা বাধ্য হয়ে তার একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরতে হ'লো গ্যারেথকে।

হিসহিস করে বললো সে, 'টাকার কথা বলছি, চকলেট। সব বুঝে পেলো আর তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না। কাল ভোরে নাচগানের মাধ্যমে তোমরা আমাদের বিদায় দেবে, ঠিক আছে?'

'প্রসঙ্গটা তোলায় সত্যি আমি খুশি হলাম,' চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকালো প্রিন্স মিখায়েল, খুশির ভাবটুকু ছাড়া আর সবকিছুই রয়েছে তার চেহারায়ে। 'কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা দরকার।'

'দেখো, চকলেট, ওন্ড বয়, এটা আলোচনার কোনো ব্যাপার নয়। আলোচনা যা হবার তা অনেক আগেই হয়ে গেছে।'

'মাথা গরম করো না, প্লিজ। আমি তোমাকে উদ্বিগ্ন হতেও নিষেধ করছি।'

দেনাদার টাকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে উদ্বিগ্ন বোধ করা গ্যারেথের একটা স্বভাব। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলোচনার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে টাকা শোধ না

দিয়ে পারা যায়। কঠিন ভাষায়, চড়া গলায় প্রতিবাদ করতে যাবে গ্যারেথ, এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করলেন রাস গোলাম।

উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু তাঁর পা কাঁপতে লাগলো, মনে হ'লো টলে পড়ে যাবেন।

দু'জন গার্ড শক্ত করে ধ'রে রাখলো রাস গোলামকে। তিনি কাঁপছেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে কথা ব'লে গেলেন। অবশ্য শেষ দিকে তার গলা ভাবাবেগে বুজে এলো। তাঁর ভাষণ বিদেশী অতিথিদের জন্যে ইংরেজিতে অনুবাদ করলো প্রিন্স মিখায়েল।

প্রথম দিকে, জেকের মনে হলো, বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান তাঁর বক্তব্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন। প্রথম সূর্য-রশ্মির পাহাড়চূড়া স্পর্শ করার কথা বললেন তিনি বললেন, ভরদুপুরে মরু-বাতাসের একখানি পা যখন একজন মানুষের মুখে পড়ে তার কী অনুভূতি হয়, তারপর তিনি ওদেরকে মনে করিয়ে দিলেন ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই প্রথম সন্তানের কান্না তার বাপের কানে কী রকম শোনায়, আরো স্মরণ করতে বললেন, লাঙ্গলের আঘাতে এলোমেলো হওয়া মাটির গন্ধ। ধীরে ধীরে অবিশ্বাস্য নিস্তব্ধতা নেমে এলো গুহার ভেতর, সবাই শ্রদ্ধার সাথে তাঁর বক্তব্য শুনছে।

এই পর্যায়ে আপন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন রাস গোলাম, ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিলেন গার্ডদের হাত, এখন আর তিনি টলছেনও না। তাঁর কণ্ঠস্বর আবেদন আর আবেগে ভরে উঠলো। প্রিন্স মিখায়েল অনুবাদ না করলেও জেকের বুঝতে অসুবিধে হতো না যে, গোত্রপ্রধান পুরুষমানুষের গর্ব এবং তার স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার নিয়ে কথা বলছেন। তিনি প্রশ্ন করছেন, একজন সত্যিকার পুরুষ কি তার সেই স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে প্রাণ দেবে না? প্রাণ দেবে না তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়বন্ধু, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্যে?

‘খবর এসেছে বিদেশী শক্তি আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে আসছে। ভীষণ শক্তিশালী তারা, সঙ্গে আছে আধুনিক মারণাস্ত্র, শোয়া’ গোত্রের বীরদের মতো হৃদয় তাদের নেই বটে, কিন্তু অত্যন্ত সাহসী।’

হাঁপাচ্ছেন বৃদ্ধ। ‘কিন্তু বাছারা, আমার প্রিয় শিষ্যরা, আমরাও অসহায় বা শক্তিহীন নই। খোদার অপার মেহেরবাণী, বিদেশী সাহায্য আমরাও পেয়েছি। তারাও আমাদের জন্যে আধুনিক যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে এসেছেন, আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবেন। শত্রুদের দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে....।’

কী? ভুরু কুঁচকে উঠলো জেকের। হঠাৎ করে একটা অপরাধবোধ জাগলো মনে। অস্ত্রের যে চালান ওরা আদিবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছে সে-সব ওদের প্রায় কোনো কাজেই আসবে না। জানে, ওরা চলে যাবার এক হণ্ডার মধ্যে অচল হয়ে পড়বে আর্মারড্ কারগুলো, রাস গোলামের অনুসারীরা লৌহমানবীদের মেজাজের সাথে কোনোভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে না নিজেদের। তাছাড়া, ট্যাংক বা মর্টারের সাথে পাল্লা দেয়া ওগুলোর কর্ম নয়।

শংকিত বোধ করলো জেক। বোকার মতো এ কোথায় এসে পড়েছে ও, যেখানে প্রায় নিরস্ত্র একটা গোষ্ঠী অশুভ শক্তির কাছে মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হ'তে চলেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এটাই হবে রাস গোলাম আর তাঁর প্রজাদের শেষ যুদ্ধ।

তারপর জেক নিজেকে বুদ্ধি দিলো, ভুলে যাও। এটা ওদের যুদ্ধ, ওরাই সামলাক। টাকা নিয়ে কেটে প'ড়ে। এই সময় ওর চোখ পড়লো দূরে বসা ভিকি কেমবারওয়েলের দিকে। গভীর মনোযোগের সাথে, চেহারা উত্তেজনা নিয়ে, রাস গোলামের ভাষণ যেনো গিলছে সে, পাশে বসা সাগুদ সারার একটা কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধ'রে আছে।

ভিকিও বুঝতে পারলো, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেক। ঘাড় ফেরালো সে, চোখাচোখি হ'লো দু'জনের। মৃদু হেসে, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো সে, যেনো বলতে চাইলো জেক কী ভাবছে বুঝতে পেরেছে।

ভিকিকেও ফেলে রেখে চলে যাবে? নিজেকে প্রশ্ন করলো জেক। জানা কথা, ওদের সাথে ভিকিকে ফিরে যেতে বাধ্য করা যাবে না। তাঁর জন্যে এখানে একটা রিপোর্ট তৈরি হ'তে যাচ্ছে, এরইমধ্যে তার জড়িয়ে পড়া সম্পূর্ণ হয়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে সে। আর শেষটা যে কী রকম হবে ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারছে জেক।

বুদ্ধিমানের কাজ হবে ফিরে যাওয়া, বোকামি হবে আরেকজনের যুদ্ধ নিজের কাঁধে তুলে নেয়া, শুরু হবার আগেই যে যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারচেয়ে নিজের ভাগের বিশ হাজার ডলার দিয়ে বারটন এঞ্জিন আর ফ্যাক্টরির কাজ শুরু করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এর বিপরীতে রইলো একটি মাত্র প্রলোভন— এমন এক নারীর ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা, যে সারা জীবন কেবল জ্বালিয়েই মারবে।

'জীবনেও সঠিক কাজটি কখনো করতে পারি নি,' আপন মনেই বললো জেক, এরপর ভিকির উদ্দেশ্যে হাসলো।

হঠাৎ থামলেন বুদ্ধি রাস গোলাম, মৃদু হাঁপাচ্ছেন তিনি, ঘামে চকচক করছে তাঁর মুখ। শ্রোতারা এখনো তাঁর দিকে সম্মোহিতের মতো নিম্পলক তাকিয়ে আছে। গলা চড়িয়ে একটা নির্দেশ দিলেন গোত্রপ্রধান, দু'ধারী একটা তলোয়ার চলে এলো তাঁর হাতে, ফলাটা লম্বা আর নগ্ন। পরমুহূর্তে কোথেকে যেনো অনেকগুলো ড্রাম নিয়ে আসা হলো, বেজে উঠলো রণডঙ্কা। প্রথমে এলো রাস গোলামের পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী ড্রাম, শুধু বড় ধরনের যুদ্ধ বা উৎসবের সময় বের করা হয় ওটা, শতো শতো বছর ধ'রে বংশপরম্পরায় হাত বদল হয়ে রাস গোলামের হাতে পড়েছে। মাগডালা-য় নেপিয়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বাজানো হয়েছে এই ড্রাম, বাজানো হয়েছে আদোয়ায় ইতালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসহ আরো কয়েক শো যুদ্ধের সময়।

একেকটা ড্রাম কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ড্রামাররা ড্রামের ব্যারেল নিজেদের দুই হাঁটুর মাঝখানে নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবচেয়ে গভীর আর ভরাট আওয়াজ যে ড্রামের সেটা মন্তরগতি একটা ছন্দের সাথে বাজতে লাগলো, বাকি ড্রামগুলো এক জোড়া ভরাট শব্দের মাঝখানে গুড়গুড় আওয়াজ তুললো। ক্রমেই দ্রুত হ'লো ছন্দ, সেই সাথে আরো ভরাট হয়ে উঠলো আওয়াজ। কাঁপতে শুরু করলো মাটি, ধাক্কা লাগলো বুকে। তারপর মনে হ'লো গোটা দুনিয়া উন্মাদ করা গর্জনে ঝাঁকি খাচ্ছে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো জেকের। লক্ষ্য করলো, ড্রামের তালে তালে দুলতে শুরু করেছে আদিবাসীদের মাথা আর কাঁধ।

তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন রাস গোলাম। তাঁর মাথাটাও নুয়ে পড়েছে তলোয়ারের হাতলের ওপর। ড্রামের ছন্দ এক সময় তাঁকে নাড়া দিলো, ঝাঁকি খেতে শুরু করলো তাঁর কাঁধ, তারপর হঠাৎ তিনি এক ঝটকায় উঁচু করলেন মাথা। সাদা একটা পাখি যে ভঙ্গিতে উড়াল দেয়, ঠিক সেভাবে লাফ দিয়ে ড্রামারদের সামনে পড়লেন, বিশাল তলোয়ারটা মাথার ওপর বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে নাচতে শুরু করলেন।

প্রিন্স মিখায়েলের একটা কজি চেপে ধরলো গ্যারেথ, ড্রামের বজ্রনিবাদের সাথে পাল্লা দেয়ার জন্যে গলা চড়ালো, ফিরে গেলো ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায়। ‘চকলেট, তুমি আমাকে টাকা প্রসঙ্গে কী যেনো বলছিলে।’

তার কথা শুনতে পেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো জেক, প্রিন্স মিখায়েল কী ব’লে শুনতে চায়। কিন্তু প্রিন্স মিখায়েল চুপ করেই থাকলো, বাবার লক্ষ্যবস্তু তার মনোযোগ ধরে রেখেছে।

‘অক্ষত অবস্থায় আমরা তোমাকে মাল ডেলিভারি দিয়েছি, ওল্ড বয়। চুক্তি চুক্তিই, তাই না?’

‘পনেরো হাজার পাউন্ড,’ থমথমে চেহারা নিয়ে বিড়বিড় করে বললো প্রিন্স মিখায়েল।

‘হ্যাঁ,’ একমত হ’লো গ্যারেথ।

‘বিপজ্জনক একটা অংক,’ প্রিন্স মিখায়েলের গলা আরো খাদে নেমে গেলো।

‘এরচেয়ে আরো অনেক কম টাকার জন্যে কতো মানুষ খুন হয়েছে।’

ওরা কোনো মন্তব্য করলো না।

‘বুঝতেই পারছো আমি তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি,’ ব’লে চললো লিজ মিখায়েল। ‘তোমাদের নিরাপত্তা আর আমার গোত্রের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা। দেখাশোনার জন্যে একজন এঞ্জিনিয়ার না থাকলে, কী দাম গাড়িগুলোর? নতুন অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয় যদি আমার লোকদের শেখানোর জন্যে কেউ না থাকে, কী হবে ওগুলো দিয়ে? পুরো টাকাটাই কি পানিতে ফেলা হবে না?’

‘তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে—সত্যি হচ্ছে, ওল্ড বয়,’ নিশ্চয়তা দিয়ে বললো গ্যারেথ। ‘কাফে রয়্যালের ব’সে ডিনার খাওয়ার সময় তোমার জন্যে চাই কি দু’ফোঁটা চোখের পানি ফেলতেও আমি রাজি আছি। তবে কি জানো, এ-সব কথা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিলো।’

‘আরে, কী বলা, ভাবি নি মানে? মাই ডিয়ার গ্যারেথ, বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ সময় গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছি আমি।’ এই প্রথম গ্যারেথের দিকে ফিরলো প্রিন্স মিখায়েল, হাসলো নিঃশব্দে। ‘ভেবেছি, দুনিয়ার কোথাও এমন বোকা নেই যে ইথিওপিয়ার বন-জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ী এলাকায় এসে, সাথে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নিরাপদে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারে—রাস গোলামের ব্যক্তিগত অনুমতি এবং প্রোটেকশন ছাড়া।

দু’জনেই ওরা তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

টাকা নিয়ে কোন দিকে যেতে চাও তোমরা? পথে পর্বত-দস্যু শিফটাদেরও ছোটো ছোটো দল আছে, ওরা যদি জেনে যায়, এতো টাকা নিয়ে পথে আছে তোমরা...।’

‘ওরা জানবে, অবশ্যই, তাই না?’ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জেক।

‘আমার ভয় হচ্ছে, অজ্ঞাত সূত্র থেকে খবরটা ওরা পেয়েও যেতে পারে,’ জেকের দিকে ফিরলো প্রিন্স মিখায়েল।

‘আর আমরা যদি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে যেতে চাই?’

‘পায়ে হেঁটে মরু পেরোনো কি সম্ভব?’ হাসলো লিজ মিখায়েল।

‘পাওনা টাকা পেলে তা থেকে উট কেনার জন্যে খরচ করতে পারবো,’ সম্ভাবনার কথা বললো জেক।

‘আমার সন্দেহ হচ্ছে, গ্যারেথ,’ কলেজ জীবনের বন্ধুর দিকে ফিরলো প্রিন্স, ‘উট কেনা তোমাদের জন্যে সাংঘাতিক কঠিন হবে। আমার আরো সন্দেহ হচ্ছে, ইতালিয় বা ফ্রেঙ্করাও তোমাদের খবর জেনে যাবে।’

ওরা দেখলো বৃদ্ধ রাস গোলাম এখনো বিপুল বিক্রমে ড্রামারদের মাথার ছ’ইঞ্চি ওপরে বনবন করে তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন।

‘গড!’ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো গ্যারেথ। ‘তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম, চকলেট। মানে কথার মূল্য আর মর্যাদা, পুরনো বন্ধুর ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি...।’

‘মাই ডিয়ার গ্যারেথ, অত্যন্ত দুঃখের সাথে তোমাকে আমি মনে রাখতে বলছি, এটা ইটনের খেলার মাঠ নয়।’

‘তবু, ঘৃণাক্ষরেও আমি ভাবি নি তুমি আমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করবে।’

‘ওহ্ ডিয়ার, কি লজ্জা! গ্যারেথ, আমি তোমার টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করছি না। যদি চাও এখন, এই মুহূর্তে তোমার টাকা তুমি পেতে পারো।’

‘ঠিক আছে, প্রিন্স,’ বাধা দিলো জেক, ‘বলো আর কী চাও তুমি আমাদের কাছে? খোলাখুলি বলো, টাকা নিয়ে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার নিরাপদ কোনো উপায় সত্যি আছে কি?’

স্মিত হেসে জেকের হাতে মৃদু চাপড় মারলো প্রিন্স। ‘হুজুত-হাস্লামা পছন্দ করো না, সত্যিকার কাজের মানুষ, তোমাকে আমার ভারি পছন্দ...।’

‘আমি একটা প্রশ্ন করেছি,’ বিরক্তবোধ করলো জেক।

‘তোমরা যদি ছ’মাসের একটা চুক্তিতে আমাদের সাথে কাজ করো, আমার বাবা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।’

‘ছ’মাস কেনো?’ কারণটা কী শুনতে চাইলো গ্যারেথ।

‘ততোদিনে হয় আমরা হারবো, নয়তো জিতবো।’

‘বলে যাও,’ জেকের তাগাদা।

‘এই ছ’মাস তোমরা তোমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে ব্যবহার করবে-শেখাবে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটা বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে কীভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। গাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং চালানোর দায়িত্ব নেবে...।’

‘তার বদলে?’ জিজ্ঞেস করলো জেক।

‘রাজকীয় বেতন, ইথিওপিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে যেতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি। টাকাগুলো আগেই লন্ডনের একটা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমাদের নামে।’

‘রাজকীয় বেতন বলতে কী বোঝাতে চাও?’ তিজ্জকণ্ঠে জানতে চাইলো গ্যারেথ। ‘জল্পাদের ছোরার নিচে মাথা পেতে দেবো, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ কী হ’তে পারে?’

‘দুই গুণ বেতন,’ হাসলো প্রিন্স। ‘বেতন পাবে নগদ-প্রতিজন সাত হাজার পাউন্ড।’

টিল পড়লো দু’জনের পেশিতে, নিজেদের মধ্যে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় হলো।

‘প্রত্যেকে?’ রুদ্ধশ্বাস গ্যারেথের প্রশ্ন।

‘প্রত্যেকে,’ বললো লিজ মিখায়েল।

‘চুক্তিপত্র তৈরি করার জন্যে আমার ল’ইয়ারকে পাওয়া গেলে ভালো হতো,’ খেদ প্রকাশ করলো গ্যারেথ।

‘তার দরকার নেই,’ হেসে উঠলো প্রিন্স মিখায়েল, মাথা নাড়লো, আলখাল্লার ভেতর হাত গলিয়ে বের করে আনলো দুটো এনভেলোপ। ‘ব্যাংকের গ্যারান্টি দেয়া চেক-লন্ডনের লয়েডস ব্যাংক। ডিজঅনার হওয়ার কোনো আশংকাই নেই, তবে তারিখ দেয়া আছে দু’মাস পরের।’

কৌতূহলের সাথে চেক দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো গ্যারেথ। সত্যি তাই, আজ থেকে দু’মাস পরের তারিখ লেখা রয়েছে, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সাল। এরপর সে টাকার অংকটা দেখলো। প্রতিটি সাত হাজার পাউন্ডের চেক।

সবিস্ময়ে জেকের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। ‘নির্দিষ্ট তারিখ, নির্দিষ্ট টাকার অংক-বুঝতে পারছো, ওল্ড চ্যাপ? চকলেট মিখায়েল সব আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছিল। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে কয়েক হপ্তা এগিয়ে ছিলো আমাদের চেয়ে। এ-সম্পর্কে তোমার বিচক্ষণ মন্তব্য শুনতে পেলো খুশি হভাম।’

‘আমি বলবো, এভাবে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের পথ না ধরলেও চলতো,’ শান্তকণ্ঠে বললো জেক। ‘প্রিন্সের উচিত ছিলো মানবিকতার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া। অন্তত আবেদন জানিয়ে দেখতে পারতো আমরা কী করি।’

প্রিন্সের দিকে ফিরলো গ্যারেথ। ‘গুড গড, চকলেট!’ তার বিস্ময় এখনো কাটে নি। ‘আমি আতংকিত ও হতভম্ব! আমি স্তম্ভিত!’

‘তার মানে কি তুমি প্রত্যাখান করছো, মেজর সোয়েলস?’

চট করে আরেকবার জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ, সম্মতির একটা নিঃশব্দ বার্তা বিনিময় হলো। নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো গ্যারেথ। ‘বলতে বাধ্য হচ্ছি, মাদ্রিদে আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সময় মতো পৌঁছুতে না পারলে বিজনেস-টা হারাবো। কিন্তু...,’ থেকে ব্যাংকের চেকগুলোর ওপর আবার একবার চোখ বুলালো সে, ‘...কিন্তু বিজনেস আর যুদ্ধ দুটো প্রায় একই ব্যাপার-আরো কথা হলো, তুমি আমাকে শক্তিশালী কিছু হেতু দিয়েছো থেকে যাওয়ার পক্ষে।’ মানিব্যাগটা পকেট থেকে বের করে চেকগুলো সময়ে রাখলো তাতে। ‘তার মানে কিন্তু এই নয় যে, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আমার বিস্ময় আর আতংক তিল পরিমাণ কমলো।’

‘আর তুমি, মি: জেক?’ জানতে চাইলো প্রিন্স।

ম্লান, বিষণ্ণ একটু হেসে শুধু মাথা ঝাঁকালো ও, বললো, ‘আমার পাটনার যা বললো আমি তার সাথে একমত।’

মাথা ঝাঁকালো প্রিন্স, আর তারপরই তার হাবভাব বদলে গেলো, চেহায়ায় ফুটে উঠলো ঠাণ্ডা নিষ্ঠুর একটা ভাব। ‘আমি তোমাদেরকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, দয়া করে বোকার মতো চুক্তির সময় পেরোনোর আগেই ইথিওপিয়া ত্যাগ করার চেষ্টা করো না। আমার বাবার প্রশাসন সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণা নেই।’

ঠিক সেই মুহূর্তে আলোচ্য ভদ্রলোক মাথার অনেক ওপরে তুলে ধরলেন তাঁর তলোয়ার, তারপর সবেগে নামিয়ে এসে দু’পায়ের মাঝখানে নরম মাটিতে ঘাঁচ করে গাঁথলেন ডগাটা। তলোয়ারের হাতল ছেড়ে দিলেন তিনি, গায়ে আগুনের প্রতিফলন নিয়ে কাঁপতে লাগলো লম্বা ফলাটা, হোঁচট খেতে খেতে তাঁর নিজের জায়গায় অর্থাৎ জেক আর গ্যারেথের মাঝখানে ফিরে এলেন।

দু’জনের কাঁধে হাডিসার হাত রেখে নিজের পাজরের সাথে ওদেরকে চেপে ধরলেন রাস গোলাম, চিৎকার করে বললেন, ‘হাউ ডু ইউ ডু?’

দম ফেলার ফুরসত পেয়েই চোখ কুঁচকে বৃদ্ধের দিকে তাকালো গ্যারেথ। ‘রামি খেলায় আপনার ভাগ্য খুলে যেতে পারে, শিখবেন নাকি, ওল্ড বয়?’ দু’মাস যথেষ্ট লম্বা সময়, একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা দরকার, আর সেটা থেকে যদি কিছু লাভের মুখ দেখা যায়, মন্দ কি?

গুরুগণ্ডীর ড্রাম পেটানোর শব্দে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছে কাউন্ট আলদো বেলিনি। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে পাশ ফিরলো সে, শুনলো কিছুক্ষণ, ভরাট একঘেষে আওয়াজ আর মৃদু কাঁপুনি তার কাছে পৃথিবীর পালস্ ব’লে ভ্রম হ’তে লাগলো। পুরোপুরি সজাগ হ’লো অকস্মাৎ, একলাপে বিছানা থেকে নেমে তাঁবুর ভেতর সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি শুরু করলো। ড্রাম পেটানোর এই বিশেষ ছন্দটা তার অত্যন্ত পরিচিত, আদিবাসীরা যুদ্ধযাত্রার সময় বাজায়।

কাউন্টের আত্ননাদ শুনে আশপাশে যারা ছিলো তাদের সবার ঘুম ভেঙে গেলো। সারানটা জিনো তাঁবুর ভেতর ঢুকে যতো না লজ্জা পেলো তারচেয়ে বেশি পেলো ভয়। তাকে দোষ দেয়া যায় না, অধরনের একটা দৃশ্য দেখে যে-কেউ লজ্জা আর ভয় দুটোই পাবে। জিনো দেখলো তার প্রভু সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তাঁবুর মাঝখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চোখ বিস্ফারিত, এক হাতে হাতির দাঁতের তৈরি বাঁটসহ বেরেটা, অপর হাতে অলংকৃত ছোরা।

ড্রামের শব্দ শুরু হওয়ামাত্র দেরি করে নি মেজর লুইগি, কাউন্টের তাঁবুর দিকে রওনা হয়ে গেছে, কারণ তার জানা আছে ভাঁড়টার কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা যায়। তাঁবুতে ঢুকে কর্নেল আলদোকে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পেলো সে। কাউন্ট ইতিমধ্যে পঞ্চাশজন বডিগার্ডকে ঘুম থেকে তুলে নিজের

পাহারায় নিয়োগ করেছে। রোলস-রয়েস স্টার্ট দেয়া হয়েছে, যেকোনো মুহূর্তে তাতে চড়ে বসবে কাউন্ট।

মেজরকে দেখে মোটেও খুশি হ'তে পারলো না সে, তার ইচ্ছে ছিলো লোকটা বাধা দেয়ার জন্যে এসে পৌঁছানোর আগেই বিপজ্জনক এলাকা ছেড়ে কেটে পড়বে। ইচ্ছেটা আগের মতোই জোরালো থাকলো, দু'সেকেন্ড চিন্তা করে একটা অজুহাত খাড়া করতে হ'লো তাকে, এই যা। 'মেজর, তুমি এসে ভালোই করেছো। শোনো, কমান্ড করার অধিকার তোমার ওপর ছেড়ে যাচ্ছি আমি। সশরীরে উপস্থিত হয়ে জেনারেল ডি বোনোকে রিপোর্ট করতে আসমারায় যাচ্ছি আমি।' কথা শেষ করার আগেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো সে, অপেক্ষারত গাড়ির দিকে এগোলো।

তার পথরোধ করলো মেজর, ঠকাস করে স্যালুট ঠুকে গোপন করার চেষ্টা করলো তার উদ্দেশ্য। 'মাই কর্নেল, ওয়েলস অব চান্ডির ডিফেন্স আমরা সম্পূর্ণ করেছি,' রিপোর্ট করলো সে। 'গোটা এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আমরা সবাই এখানে নিরাপদ।'।

'জেনারেল ডি বোনোকে আমি রিপোর্ট করবো, আমাদের চেয়ে বিশগুণ সৈন্য নিয়ে হামলা করেছে শত্রুপক্ষ,' গর্জে উঠলো কাউন্ট, মেজরের বগলের তলা দিয়ে বাড়িলি কেটে গাড়ির দিকে এগোতে চেষ্টা করলো সে।

দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে কাউন্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিলো মেজর। তারপর এক পা সামনে বাড়লো সে। 'আপনার বাহিনী নিরাপদ পজিশন নিয়ে রয়েছে, সবাই সুস্থ এবং উৎসাহী...।'।

'আমার অনুমতি দেয়া থাকলো, যখন দেখবে রক্তপিপাসা নিয়ে শত্রুপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, দেরি না করে প্রত্যাহার করে নিয়ো বাহিনীকে।' কাউন্টের তরফ থেকে এটা একটা ঘুষ বা টোপ, যুদ্ধ না করে পালানোর লোভ দেখাচ্ছে। তারপরই সে মেজরকে পাশ কাটিয়ে রোলস-রয়েসের নাগাল পাবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু মেজর মামবার মতোই ক্ষিপ্তগতি, এক লাফে আবার কাউন্টের সামনে চলে এলো। এভাবেই গুরু হ'লো ব্যাপারটা। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা অফিসার আর সৈনিকরা অবাক বিস্ময়ে দেখলো কাউন্ট আর মেজর পালা করে লাফ দিয়ে একবার সামনে বাড়ছে, একবার পিছু হটছে, ঠিক যেনো একজোড়া শিকারী মোরগের লড়াই চলছে দু'জনের মধ্যে। জনসমর্থন অবশ্য কাউন্টের তরফেই ভারি, কারণ ভাড়াটে সৈনিকরা যুদ্ধ না করলেও বেতন পাবে। কাউন্ট গাড়ি নিয়ে পালাতে সমর্থ হলে, তার পিছু নিয়ে তারাও ভেগে যেতে পারে।

'আমার মনে হয় না, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে আমরা,' বললো মেজর। কাউন্টের হস্তিত্ব তার ধমকে চাপা পড়ে গেলো। 'সে যাই হোক, এই মুহূর্তে আমার কর্নেলকে আমি বাহিনী ছেড়ে কোথাও যেতে দিতে পারি না। আপনার বীরত্বের প্রতি সৈনিকেরা শ্রদ্ধাশীল। শত্রু হামলা করুক বা না করুক, বিজয় আমাদেরকে ছিনিয়ে আনতে হবে, কাজেই আপনার শারীরিক উপস্থিতি এবং কমান্ড একান্ত দরকার আমাদের।' কথা বলছে, সেই সাথে এক এক পা কর সামনে বাড়ছে মেজর। 'সত্যি



যদি আক্রমণ হয়ই, কাউন্ট তথা নেতৃত্ববিহীন থার্ড ব্যাটালিয়ান এতিম হয়ে পড়বে, তখন কে তাদেরকে পথ দেখাবে?’ পিছু হটেতে হটেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কাউন্ট, ফলে বিশালদেহী মেজরের পেট তার পেটের সাথে এক হলো, প্রায় এক হ’লো দুটো নাকও। ‘ভুলে গেলে চলবে না, এটা ফরম্যাল কোনো যুদ্ধ নয়। আপনার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যিক।’

এবারে আর কোনো ফাঁক নেই কাউন্টের পালিয়ে যাবার জন্যে।

‘আর এক ঘণ্টা পর ভোর। দিনের আলো ফুটলে পরিস্থিতি আঁচ করা সম্ভব হবে।’

এই সময় ড্রামের আওয়াজ থেমে গেলো। উপত্যকার ওপরদিকে গোত্রপ্রধান বৃদ্ধ রাস গোলাম প্রতিরক্ষাসূচক নৃত্য থামিয়েছেন। নিস্তব্ধতা নেমে আসার সাথে সাথে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কাউন্ট আলদোর চেহারা, শিরদাঁড়া খাড়া করে সিঁধে হলো। রক্তচক্ষু মেলে মেজরের দিকে তাকালো সে। ‘মেজর। বিনায়ুদ্ধে এক ইঞ্চিও পিছু হঠবো না আমরা। থার্ড ব্যাটালিয়ানকে নির্দেশ দাও, সামনের সমস্ত বাধা খড়-কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হ’তে হবে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী! মেজর ভিটো, এখানে উপস্থিত ডিটাচমেন্টের কমান্ড তোমার হাতে তুলে দেয়া হলো। বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে ওদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হও তুমি। বাকি সবাই আমার চারপাশে থাকো। সবাই দেখো, আমার যুদ্ধযাত্রা শুরু হলো।’

সশস্ত্র সৈনিকদের তৈরি ঘেরের মধ্যে অবস্থান নিয়ে উপত্যকা থেকে নামতে শুরু করলো কাউন্ট। নিচের দিকে আগেই মেজরের তত্ত্বাবধানে মেশিনগান আর মর্টার বসানো হয়েছে।

রাস গোলামর অসংখ্য সহিসের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোটার বয়স মাত্র পনেরো। আগের দিন গোত্রপ্রধানের প্রিয় একটা ঘোড়কে পানি খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছিলো সে, রশি ছিঁড়ে ছুট দেয় ঘোড়া, গিয়ে পড়ে খাঁ খাঁ মরুতে। পুরোটা দিন আর রাতের অর্ধেকটা ঘোড়ার পিছু পিছু চক্কর খায় ছেলোটো, অবশেষে ক্লান্ত ঘোড়ার লম্বা রশিটা নাগালের মধ্যে পায় সে।

সারাদিন খাওয়া নেই, রোদের মধ্যে ছুটোছুটি করেছে, তার ওপর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেচারা একেবারে নেতিয়ে পড়লো। বাহনের কেশর ধ’রে ঘাড়ের ওপর মাথা রাখলো সে, ঘুম এসে গেলো চোখে। জানে একবার যখন ধরা দিয়েছে, পথ চিনে নিজেই পানির কাছে পৌঁছে যাবে তার ঘোড়াটা। কিন্তু ওটা যে হাঁটতে হাঁটতে শত্রুঘাঁটির ভেতর ঢুকে পড়বে তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি।

নার্ভাস একজন সেন্ত্রি হেঁড়ে গলায় চ্যালেঞ্জ করলো, চমকে উঠে ছুট দিলো ঘোড়া, সেই সাথে ঘুম ভেঙে গেলো সহিসের। অন্ধকারের ভেতর সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক আর সামরিক তাঁবুগুলোকে চিনতে পেরে ছানাবড়া হয়ে গেলো তার চোখ। ঘোড়ার পিঠে লম্বা হয়ে সঁটে থাকলো সে, আল্লাহ আল্লাহ করছে। তারার আলোয় চকচকে একটা স্তূপ দেখতে পেলো। স্তূপটার একেবারে গা ঘেঁষে ছুটলো ঘোড়া। জিনিসগুলো

চিনতে পেরে দম বন্ধ হয়ে এলো তার। একসাথে এতোগুলো রাইফেল এই প্রথম দেখলো সে। ঘাঁটি থেকে বেরুবার মুখে হেলমেট পরা আরেকজন সেন্ত্রি চ্যালেঞ্জ করলো তাকে। হাতের ফাঁক দিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই বলসে উঠতে দেখলো রাইফেলের মাজল। সহিসের নিচু করা মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেলো বুলেট। পা আর হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পিঠে গুঁতো মারলো সে।

গভীর নালায় সহিস যখন ফিরে এলো, রাস গোলামের বেশিরভাগ অনুসারী রাতব্যাপী উৎসব শেষে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাদের অনেকে এদিকে সেদিক বেরিয়ে পড়েছে ঘুমানোর একটা জায়গা পাবার আশায়, বাকিরা যেখানে বসে খেয়েছে সেখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। অল্প কয়েকজন যুবক অবশ্য তখনো সমানে চালিয়ে যাচ্ছে, মাংস আর মদ দুটোই।

গুহামুখের কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে একজন প্রহরীর ঘাড়ে চড়াও হ'লো কিশোর সহিস। দু'জনেই ধরাশায়ী হ'লো সশব্দে। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ গলায় প্রলাপ বকতে শুরু করলো সহিস। ভাগ্যিস উপস্থিত রয়েছে প্রিন্স লিজ মিখায়েল, কাজ হ'লো তার ধমকে।

ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মধ্যে মহা শোরগোল পড়ে গেছে। ঠিক কী দেখেছে সহিস তা একমাত্র প্রিন্স বুঝতে পারলো, বাকিরা যতোটুকু শুনলো তারচেয়ে বেশি নিজেদের মনমতো সাজালো। একদল আদিবাসী চিৎকার করে আরেক দলকে জানালো, এভাবে সবগুলো গুহা আর গোটা নালা জুড়ে শুরু হয়ে গেলো অবিশ্বাস্য ছুটোছুটি।

ঘুম থেকে জেগে উঠলো সবাই, প্রতিটি পুরুষ যে যার অস্ত্রে সজ্জিত হলো। তাদের সাথে মেয়েরাও কৌতূহলী, এমনকি শিশুরাও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো। ছোটো বড় সব কটা গুহা থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এলো তারা, বেরিয়ে এলো তাড়াহুড়োর সাথে খাড়া করা তাঁবুগুলো থেকে। এমন একজন কেউ নেই, যে ওদেরকে বুদ্ধি দেবে বা সতর্ক করবে, ভালো-মন্দ বিবেচনাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, ঝাঁক ঝাঁক মছের মতো সবাই একদিকে ছুটলো।

ছড়িয়ে পড়া খবরটা সম্পর্কে সবাই যে যার বিজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করছে, তর্কেরও বিরাম নেই, এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত শত্রুকে কীভাবে নিধন করবে অঙ্গভঙ্গি সহকারে বর্ণনা করতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বোধবুদ্ধিহীন জনতার ঢল এগিয়ে চলেছে, হাঁটতে হাঁটতেই তারা বর্শার ফলায় আঙুল ঠেকিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছে দার, মাক্কাতা আমলের আগ্নেয়াস্ত্রে বুলেট ভরছে। মায়ের কোলে খিলখিল করে হাসছে শিশুরা, যারা হাঁটতে পারে তারা বড়দের চরদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মশগুল, বুকে কাল্পনিক বর্শা নিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। এভাবেই তারা ভাঙাচোরা এবড়োথেবড়ো নালা থেকে বেরিয়ে নেমে লো ওয়েলস অব চান্ডির পিরিচ আকৃতির উপত্যকার।

বড় গুহাটায় প্রিন্স লিজ মিখায়েল এখনো বিদেশীদের উদ্দেশ্যে সহিসের গল্পটা ব্যাখ্যা করছে, উত্তর দিচ্ছে তাদের প্রশ্নের। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো একা শুধু জেক।



‘ইতালিয়ানরা যদি কুয়া দখল করতে এসে থাকে, ধ’রে নিতে হয় ওরা তৈরি হয়ে আছে। ওরা হামলা করার অজুহাত খুঁজছে, প্রিন্স। তোমার লোকদের কড়া নির্দেশ দাও, ভুলেও যেনো ওদিকে কেউ না যায়। প্রথমে পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের...।’

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভোরের প্রথম আভাস এখনো অস্পষ্ট, এ-সময়ের ক্ষীণ আলো মানুষের চোখের সাথে ভৌতিক চাতুর্য নিয়ে খেলা করে—প্যারাপেটের কিনারায় উঁকি দিয়ে থাকা থার্ড ব্যাটালিয়ানের সেক্ট্রিরা দেখলো অন্ধকারের ভেতর মানুষের একটা সচল পাঁচিল অসমান নালা থেকে উপত্যকার বেরিয়ে আসছে। এখনো অস্পষ্ট, তবু শতো শতো মানুষের সম্মিলিত হৈ-হল্লাও শুনতে পেলো তারা।

রাতে ড্রামের শব্দ যখন শুরু হয়, কালো শার্ট পরা অনেক সৈনিক যে যার ট্রেন্কেস ফায়ারিং স্টেপ-এর নিচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ তার আগে সারাটা দিন মার্চ করে এখানে পৌঁছেছে তারা, তারপর গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। লাথি মেরে ইতালিয় সৈনিকদের ঘুম ভাঙালো তারা, ঠালা-গুঁতো দিয়ে সবাইকে দাঁড় করালো প্যারাপেট বরাবর সার সার পজিশনে। চোখে ঘুম নিয়ে নিচে উপত্যকার দিকে তাকালো মিলিশিয়ারা।

মেজর ক্যাস্তেলানি ছাড়া আর কারো থার্ড ব্যাটালিয়ানে পুরোদস্তুর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। সদ্য ঘুম থেকে ওঠার পর সৈনিকেরা হতচকিত, তাছাড়া এমনিতেও তো রাতের শেষ প্রহরে মানুষের দেহ ও মনে সবচেয়ে বেশি জড়তার ভাব থাকে, তার ওপর মরু থেকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করছে ওরা। ভোরের অনিশ্চিত উপকত্যকার আলোয় বেরিয়ে আসা লোকগুলোকে মরুর বালির মতো অগুণতি ব’লে মনে হলো, প্রতিটি লোক ওদের চোখে ধরা পড়লো একেকটা দানব হিসেবে।

ঠিক এই সময় উত্তেজনা আর পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে, সরু কমিউনিকেশন ট্রেন্স থেকে উদয় হ’লো কাউন্ট আলদো। কামান বসানো মঞ্চ হোঁচট থেকে খেতে উঠলো সে, দাঁড়ালো ফায়ারিং প্র্যাটফর্মে। সার্জেন্ট-ইন-কমান্ড তাকে চিনতে পেরেই স্বস্তিসূচক একটা চিৎকার ছাড়লো। ‘মাই কর্নেল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসেছেন।’ পদ আর সম্মানের কথা ভুলে কাউন্টের একটা কবজি চেপে ধরলো সে।

সার্জেন্টের নোংরা ঘর্মাক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো কাউন্ট। বিশ সেকেন্ড পর আংশিক সফল হয়েছে সে, এই সময় তার নজর পড়লো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়া জনারণ্যের দিকে। ‘দয়াবতী ঈশ্বরের মা!’ আঁতকে উঠলো সে। হাঁটুতে একদম জোর পাচ্ছে না, পেটের ভেতর নাড়িভুড়ি সব যেনো তরল পদার্থে পরিণত হলো। ‘সব শেষ! আমরা হেরে গেছি। ওরা চড়াও হয়েছে আমাদের ওপর!’ কাঁপা হাতে হোলস্টারের ফ্ল্যাপ খুললো সে, পিস্তল হাতে চলে আসার আগেই মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে নিচু হলো, এক হাতে সার্জেন্টের ইউনিফর্ম ধ’রে থাকলো। ‘ফায়ার!’ নির্দেশ দিলো। ‘ওপেন ফায়ার!’ প্যারাপেটের কিনারা থেকে অনেক নিচে মাথা নামিয়ে গুলি করলো সে, সরাসরি ভোরের আকাশে।

প্যারাপেট বা নিচু পাঁচিলের পিছনে ইতালিয়দের মোট সংখ্যা চারশোরও বেশি, তাদের মধ্যে সাড়ে তিনশো রাইফেল চালাতে জানে, প্রত্যেকের হাতে রয়েছে ম্যাগাজিন ভরা বোল্ট-অ্যাকশন আগ্নেয়াস্ত্র। আরো ষাটজন রয়েছে মেশিনগানের দায়িত্বে, পাঁচজন করে বারোটো দলে ভাগ হয়ে।

শুধু যে পরিশ্রমে তা নয়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে এবং নানা ধরনের অবিশ্বাস্য গুজব কানে আসায় সবাই ওরা টেনশনে ভুগছে। রাতে ড্রামের শব্দ ওদেরকে প্রায় অবশ্য করে তুলেছিল। যে যার অস্ত্রের পিছনে হুমড়ি খেয়ে থাকলো ওরা, ট্রিগারে আঙুল, বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই।

কাউন্টের আর্চিটেকচার আর পিস্তলের আওয়াজটাই যেনো দরকার ছিলো ওদের, সাথে সাথে ছিড়ে গেলো ভয়ের যে বাঁধনটা ওদেরকে পঙ্গু করে রেখেছিল। গুলিবর্ষণ শুরু হ'লো কাউন্টের চারধার থেকে, কারণ আশপাশে যারা রয়েছে তারাই শুধু শুনতে পেয়েছে কর্নেলের নির্দেশ। উপত্যকার সামনের ঢালে দীর্ঘ একটা রেখা ধ'রে ঝলসে উঠলো মাজলুগুলো, তারই সাথে গর্জে উঠলো তিনটে মেশিনগান। কাপড় ছেঁড়ার একটানা শব্দ তুলে তির্যক পথ ধ'রে ঠুটলো মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, রাইফেল বা অন্যান্য ছোটো আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ চাপা পড়ে গেলো, ট্রেসার বুলেটগুলো সাঁ সাঁ করে উঠে গেলো উপত্যকার মাথায়, বিক্ষোবিত হয়ে আলোকমালায় পরিণত হলো।

পাশের ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ হ'তে দেখে জনতার ঢলে ভাঙন ধরলো, আহত সঙ্গী-সাথীদের মাড়িয়ে উপত্যকার দূরবর্তী অন্ধকার নিস্তব্ধ ঢালের দিকে স্রোতের মতো ধাবিত হ'লো তারা-চোখ ধাঁধানো ট্রেসার আর রাইফেল ফায়ারের লাল সারি থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে। পিছনে পড়ে থাকলো নিহত ও আহতরা, যারা জীবিত তারা ছড়িয়ে পড়লো উপত্যকার চওড়া মেঝেতে।

দূরবর্তী ঢালে গানাররা চুপচাপ রয়েছে, তাদের দিশেহারা ও বিমূঢ় ভাব আরো কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো, তারপর যখন দেখলো আদিবাসীরা এবার সরাসরি তাদের জন্যে হুমকি হয়ে ছুটে আসছে, কোনো নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তারাও ফায়ার ওপেন করলো।

শুরু হ'লো খোলা উপত্যকায় পাইকারী নিধনযজ্ঞ। পিছনের মেশিনগানগুলো এখনো রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছে আদিবাসীদের, তারা সামনের মেশিনগানের রেঞ্জের ভেতরও চলে এসেছে। সামনে থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়লো সবাই, জানে না কোথায় যাবে, কোথায় গেলে নিরাপদ আশ্রয় পাবে। শিশুদের বুকের সাথে আঁকড়ে ধ'রে ছোটোছুটি শুরু করলো মায়েরা, অল্প কয়েকজন আদিবাসী যোদ্ধা মাটিরতে হাঁটু ঠেকিয়ে পাল্টা গুলি করলো ঢাল লক্ষ্য করে, কিন্তু ট্রেন্সের ভেতর পজিশন দিয়ে থাকায় তাদের একটা বুলেটও শত্রুপক্ষের কারো গায়ে লাগলো না। লাভ হ'লো শুধু এই যে ইতালিয়রা গুলিবর্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো।

নিয়ন্ত্রণহীন জনতার ঢল নিজেদের চারদিকে চক্র দিতে শুরু করলো। দ্রুত মহুর হয়ে এলো তাদের গতি। এক সময় থেমে গেলো তারা। নিরস্ত্র মায়েরা এখনো যারা

বেঁচে আছে, যার যার নিজের বাচ্চাকে মাটিতে গুইয়ে পড়নের ঢোলা কাপড় দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলো, নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখলো বুকের মাণিককে। পুরুষরাও লম্বা হয়ে গুয়ে পড়লো, গুলি করলো এলোপাতাড়ি ঢালের গায়ে লাল হয়ে ফুটে থাকা ঝলসানো মাজল্ লক্ষ্য করে। অবশ্য লাল আগুনের ঝলক আগের চেয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দিগন্তরেখার কাছে উঁকি দিতে যাচ্ছে দিনের প্রথম সূর্য।

বারোটা মেশিনগান, একেকটা প্রতি মিনিটে সাতশো করে বুলেট ছুঁড়ছে, তার সাথে তিনশো পঞ্চাশটা রাইফেল বুলেটের চাদর বিছিয়ে দিলো উপত্যকার ওপর। মিনিটের পর মিনিট ধ'রে অব্যাহত থাকলো তুমুল গুলিবর্ষণ, উপত্যকার নিচে এখনো যারা বেঁচে আছে, ক্রমশ উজ্জ্বল হ'তে থাকা দিনের আলো তাদের নড়াচড়া ফাঁস করে দিতে থাকলো নিষ্ঠুরের মতো।

আক্রমণকারীদের মেজাজ বদলে গেলো। এতো সহজে, ট্রিগার টিপলেই, এতোগুলো লোককে একসাথে মেরে ফেলতে পারে দেখে ভয় কেটে গেলো তাদের। বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়লো ইতালিয়রা, আরো নির্দয় হয়ে উঠলো। নিচের খোলা উপত্যকায় মাস্কাতা আমালের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এখনো যারা পাল্টা গুলিবর্ষণের চেষ্টা করছে তারা সংখ্যায় এতোই কম যে, ইতালিয়দের মধ্যে একজনও এতোটুকু ভয় পেলো না। এমনকি কাউন্ট আলদো পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিস্তল নেড়ে চিৎকার করছে সে, 'শত্রুদের আমি শেষ দেখতে চাই! ফায়ার!' সতর্কতার সাথে প্যারাপেটের কিনারা দিয়ে উঁকি দিলো সে। 'খুন করো ব্যাটারদের। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।'

সূর্যের প্রথম রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে, ধরাশায়ী অসাড় মানুষ আর লাশে ফুলে উঠেছে উপত্যকার মেঝে। এদিক সেদিক নিঃসঙ্গভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তারা, যেনো জিস্মন মার্কেটে এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা পুরনো কাপড়ের একেকটা স্থূপ।

উপত্যকার মাঝখানে এখনো বেঁচে আছে কিছু মানুষ। মাঝে মধ্যে হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হ'লো দু'একজন, পিছনে ঢোলা কাপড় উড়িয়ে খিঁচে দৌড় দিলো। সাথে সাথে তার পিছু দিলো মেশিনগান, ধুলোর বিস্ফোরণ দ্রুত বৃত্ত রচনা করলো তার ছুটন্ত পায়ের চারদিকে, বুলেটের আঘাতে সেই ধুলোর মধ্যে আছাড় খেলো লোকটা, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত আর ধুলো মিশে একাকার হয়ে গেলো, ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেলো এক সময়।

আদিবাসী যোদ্ধারা, যারা এখনো পুরনো রাইফেল আঁকড়ে ধ'রে গুয়ে আছে, কালো মুখ ঢালের দিকে তোলা, হাত পাকানোর জন্যে ইতালিয় রাইফেলধারীদের আদর্শ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। ক্যাপটেন বা সার্জেন্টের তীক্ষ্ণকণ্ঠ নির্দেশ পেয়ে রাইফেলধারীরা টার্গেটের ওপর নিশানা স্থির করলো যথেষ্ট সময় নিয়ে। একেকবার একেকজন রাইফেলধারীকে সুযোগ দেয়া হলো, লক্ষ্যভেদের সাথে সাথে উল্লাসে ফেটে পড়লো সৈনিকরা।

প্রথম গুলিবর্ষণের পর প্রায় বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, যাকে গুলি করা যায় এমন কেউ উপত্যকায় নেই বললেই চলে। মেশিনগানের মাজল্ আগ্রহ আর প্রত্যাশা নিয়ে

বিস্ফোরিত হ'লো ওটা। ধোঁয়া আর ধুলো লাফিয়ে উঠলো, তীক্ষ্ণ শব্দের সাথে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেলো বোমার টুকরোগুলো। দ্বিতীয় বোমাটা নিখুঁতভাবে গভীর গোলাকৃতি গর্তের ভেতর পড়লো, বিস্ফোরিত হ'লো দৃষ্টিপথের বাইরে। কুয়ার ভেতর থেকে উথলে উঠলো কাদা আর ধোঁয়া, ভেতরের গায়ে আশ্রয় নিয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধারা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো খোলা মাটিতে, তাদের নোংরা সাদা আলখাল্লা পতাকার মতো উড়ছে বাতাসে।

সাথে সাথে মেশিনগান আর রাইফেল একসাথে গর্জে উঠলো, তাদের চারদিকে বিস্ফোরিত ধুলোর ঘূর্ণি সৃষ্টি হলো, ধুলো শান্ত হবার পর কাউকে নড়তে দেখা গেলো না।

চারদিকে থুথু ছিটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলো কাউন্ট আলদো। যুদ্ধ জেতা পানির মতো সহজ আর আনন্দদায়ক। 'বাকি গর্তগুলোয়, লুইগি!' নির্দেশ দিলো সে। 'বের করো শালাদের! সব ক'টাকে!'

প্রতিবার একটা করে কুয়া লক্ষ্য করে কামান দাগা হলো। দু'একটা কুয়া থেকে কেউ বেরলো না, ভেতরে পড়ে লোকজনের ওপরই বিস্ফোরিত হ'লো গোলা। বাকি প্রায় সবগুলো থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো অসহায় আদিবাসীরা, বোমার টুকরো অর্থাৎ ধারালো ছোটো ছোটো ইস্পাত তাদের সারা শরীরে গেঁথে আছে। বেরিয়ে এসে পাঁচ গজও এগোতে পারলো না কেউ, অপেক্ষারত রাইফেল আর মেশিনগান ঝাঁঝরা করে দিলো তাদের।

সাহস বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছলো, উপত্যকা আর কুয়াগুলো ভালো করে দেখার জন্যে প্যারাপেটের ওপর উঠে দাঁড়লো কাউন্ট আলদো, বাকি কুয়াগুলোর দিকে হাত তুলে গানারদের দিক-নির্দেশ দিচ্ছে।

পরবর্তী টার্গেট নালার কাছাকাছি, অসমান মাটির সামনে, উপত্যকার একেবারে শেষ মাথায়। প্রথম বোমাটা বিস্ফোরিত হলো, স্তম্ভের মতো উঁচু হয়ে উঠলো স্মান অগ্নিশিখা আর ধুলো। দ্বিতীয় বোমাটা পড়ার আগে, কুয়ার ঠোঁট থেকে লাফ দিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো এক যুবতী, ছুটলো, জানে নালার মুখে একবার পৌঁছতে পারলে নিরাপদ আড়াল পেয়ে যাবে।

তার পিছনে দুই কি তিন বছরের একটা নগ্ন বাচ্চা। বাচ্চাটার পা দুটো বাঁকা, সম্ভবত জন্ম থেকেই, আর পেটটা ধূসর রঙের বেলুনের মতো ফোলা। তার হাত ধ'রে ছুটছে মা, সাথে করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মায়ের সাথে সমান তালে অতোটুকু বাচ্চা ছুটতে পারবে কেনো, হাঁচট খেয়ে পড়ে গেলো সে মাটিতে, কিন্তু তার মা তাকে ছাড়লো না।

বাচ্চাটা যন্ত্রণাকাতর চিৎকার জুড়ে দিলো, তার মা তাকে একটা বস্তার মতো মাটির সাথে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে। যুবতী মায়ের কোমর দু'পায়ে জড়িয়ে আরেকটা দুধের বাচ্চা সঁটে রয়েছে বুকুর সাথে। সে-ও নগ্ন, সে-ও তারস্বরে চিৎকার করছে।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ভারবাহী ছুঁস্ত ময়ের দিকে কোনো বুলেট ছুটে এলো না। যখন এলো তখন বাঁক বেঁধে এলো, আর লাগলো মাত্র একটা, প্রথম বাচ্চা কবজি ধ'রে

থাকা হাতের কনুই চুরমার হয়ে গেলো। হাড় গুঁড়িয়ে গেলো, কনুইয়ের কাছ থেকে নিচের দিকে হাতটা ঝুলে থাকলো শুধু চামড়া আর শিরার সাথে। পরবর্তী ঝাঁকটা এলো সাথে সাথেই, অনেকগুলো ঝাঁকি খেলো যুবতী, একটা বুলেট দ্বিতীয় শিশু আর মায়ের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেলো।

আবার শুরু হয়ে গেলো মেশিনগান আর রাইফেল। মায়ের লাশের পাশে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে প্রথম বাচ্চাটা।

আবার তার কান্না শুরু হলো, বাঁকা পা নিয়ে টলতে টলতে দাঁড়লো সে, শক্তভাবে ফুলে থাকা পেটে মুক্তোর মতো দু'ফোঁটা পানি, গলা থেকে পেটে নেমে এসেছে নীল পুঁতির মালা।

নালার মুখ থেকে ভোজবাজির মতো উদয় হ'লো ছুটন্ত একটা ঘোড়া। মেদহীন, পেশিবহুল সাদা স্ট্যালিয়ন, বারি মেশানো অসমান মাটির ওপর দিয়ে তীরবেগে উড়ে গেলো সেটা, তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে পিঠে লম্বা হয়ে প্রায় শূন্যে রয়েছে এক নারীমূর্তি। পিছনে পতপত করে উড়ছে কালো একটা আলখাল্লার দীর্ঘ প্রান্ত। ঘোড়সওয়ার তার স্ট্যালিয়ন নিয়ে ছেলেটা যেদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সেদিকে ছুটে চলেছে। কী ঘটছে গানাররা ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই খোলা জায়গাটুকু পেরিয়ে গেলো সে।

প্রথম মেশিনগান বিস্ফোরিত হলো, কিন্তু বুলেটগুলো উড়ে গেলো স্ট্যালিয়নের মাথার অনেকটা ওপর দিয়ে, একটাও লাগলো না। এই সময় বাচ্চাটার কাছে পৌছে গেলো ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার হ্যাঁচকা টান দিলো লাগামে, অকস্মাৎ বাধা পেয়ে পিছনের পায়ে খাড়া হ'লো স্ট্যালিয়ন, আর ঘোড়সওয়ার স্যাঁৎ করে নিচু হ'লো ছেলেটাকে ছোঁ দিয়ে তোলার জন্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্থির টার্গেট লক্ষ্য করে একসাথে গর্জে উঠলো আরো দুটো মেশিনগান।

সমস্ত উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে নিঃশব্দে কুয়ার কাছে চলে এসেছে ইতালিয় বাহিনী, এটা উপলব্ধি করার সাথে সাথে বিচলিত হয়ে উঠলো জেক। আদিবাসীরা শুধু যে আনাড়ি তাই নয়, তাদের শৃংখলাঙ্কন বলতেও কিছু নেই। ইতালিয়দের সামনে পড়লে সব কচু-কাটা হয়ে যাবে। এই আত্মহত্যার পথ থেকে ওদেরকে সরিয়ে আনার একটাই মাত্র পথ আছে।

অস্ত্র আর গোলাগুলির যুদ্ধ কখন শুরু হবে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এদিকে কথার যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। মহা শোরগোলের মধ্যে যতোই গলা ফাটাক জেক, কেউ ওর কথা শুনতে পাবে না। রাস গোলামের পঞ্চাশজন সশস্ত্র সহচর যোদ্ধা ভাবাবেগে আপ্ত হয়ে পড়েছে, অ্যামহারিক ভাষায় একযোগে চিৎকার করছে তারা, উদ্দেশ্য আশু করণীয় সম্পর্কে গোত্রপ্রধানকে পরামর্শদান। আশ্চর্য, এই কণ্ঠশক্তি প্রতিযোগিতার মধ্যে রাস গোলামের গলাও শোনা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে, তিনিও নির্দেশ দিচ্ছেন কাকে কি করতে হবে। সমস্যা একটাই, কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না।

জেকের একজন দোভাষী দরকার। ভিড় ঠেলে সামনে এগোলো ও, খপ্ করে গ্রেগোরিয়াস মারিয়ামের কবজি ধরলো, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো গুহার বাইরে। যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতে হ'লো জেককে, কারণ আর সবার মতো গ্রেগোরিয়াসও নিজের কথা বাতাসে ছুঁড়ে দেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো, ভয়ানক, উত্তেজনায় পাথুরে স্তম্ভের মতো নিরেট আর শক্ত হয়ে আছে তার শরীর।

গুহার বাইরে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেলো জেক, ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগলো, এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলো রাতটা! ভোর হ'তে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। গুহার বাইরে মরুর ঠাণ্ডা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিলো ও।

ম্লান আকাশ আর ক্যাম্প ফায়ারের আলোয় দেখতে পেলো, জনতার ঢল নালা থেকে নেমে কুয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই এতো হাসিখুশি আর উত্তেজিত, যেনো সামনে কোথাও মেলা বসেছে।

'ওদের থামাও, গ্রেগোরিয়াস,' জরুরি ভঙ্গিতে বললো জেক। 'এসো, ওদের বাধা দিই।' গ্রেগোরিয়াসের হাত ধ'রে ছুটলো ও।

'কী ব্যাপার, জেক ভাই?'

'নালা থেকে নেমে কোথায় ওরা গিয়ে পড়বে, বুঝতে পারছো না?' ছুটতে ছুটতেই বললো জেক। 'ইতালিয়রা শ্রেষ্ট কচু-কাটা করবে ওদের।'

লোকারণ্যের পিছনে পৌঁছুলো ওরা, ভিড়ের নিরেট পাঁচিল ভেদ করে ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কনুই আর হাঁটু চাললো ওরা, যাকে সামনে পেলো তারই চুল বা জামার মুঠো মধ্যে নিয়ে টান দিলো হ্যাঁচকা। 'পিছোও, পিছু হটো, ফেরত যাও!' অ্যামহারিক ভাষা কিছুই জানে না জেক, ও শুধু গ্রেগোরিয়াসের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

গ্রেগোরিয়াসকে পাশে নিয়ে নালায় সরু মুখে পৌঁছুলো ও। মুখটা লম্বা, শেষ মাথায় কুয়াগুলোকে বুকে নিয়ে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা। পরস্পরের একটা করে হাত ধ'রে পাঁচিল তৈরি করলো ওরা, জনস্রোত ঠেকানোর এটাই একমাত্র উপায়। বিশ কি ত্রিশ সেকেন্ড থেমে থাকলো মিছিলের গতি। বাধা পেয়ে যারা দাঁড়িয়ে পড়লো, পিছন থেকে জনতার নিরেট চাপ পড়লো তাদের পিঠে। ইতিমধ্যে আদিবাসীদের মেজাজ বদলে গেছে, হাসিখুশি মানুষগুলো খেপে গিয়ে একবাক্যে রায় দিলো সামনের বাধা উপড়ে ফেলো। কয়েকশো আদিবাসী ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে উপত্যকায়, বাকি সবাই তাদের সাথে মিলিত হ'তে চায়।

জনতার চাপ ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হ'লো ওরা, পিছু হটছে। যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে দু'জনেই, অসংখ্য পায়ের তলায় পিষে মারা যাবে। ঠিক এই সময় উপত্যকার উঁচু ঢাল থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো, সাথে সাথে স্থির হয়ে গেলো মানুষের ঢল, থেমে গেলো চোঁচামেচি।

ঘুরে দাঁড়ালো জেক, নালায় খাড়া গা বেয়ে খানিকটা উঠলো উপত্যকায় কী ঘটছে ভালো করে দেখার জন্যে।

নালায় সরু মুখের কিনারায় শুয়ে আদিবাসীদের নিধনযজ্ঞ চাক্ষুষ করলো ও। মিনিটের পর মিনিট ধ'রে চললো অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ড, চোখের সামনে দ্রুত বদলে

সাংঘাতিক একটা বোকামি করে ফেলেছে সারা, যে বোকামির কোনো সংশোধন হয় না—চিন্তাটা ভিকির মাথায় যেনো আগুন ধরিয়ে দিলো। তবে জেকের মতো দৃশ্যটার সৌন্দর্য তাকেও অভিভূত করলো, কি অপরূপ সাহসের সাথে নিজের মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে কিশোরী মেয়েটা। আবেগে আর কান্নায় কাঁপতে লাগলো ভিকির শরীর। এমন কি এই মুহূর্তে যখন সারার অকুতোভয় আচরণে একজন নারী হিসেবে সে-ও গর্বিত, তিন্ত বিস্ময়ের সাথে উপলব্ধি করলো, তারা দ্বারা এই আত্মত্যাগ কখনোই সম্ভব হবে না।

দেখলো পিছনের পায়ে ভয় দিয়ে খাড়া হ'লো স্ট্যালিয়ন, বাচ্চাটাকে হেঁ দিয়ে তোলার জন্যে নিচের দিকে ঝুঁকলো সারা। দেখলো মেশিনগানের বুলেট অবশেষে ভেদ করেছে লক্ষ্য, চিহ্নি-হিঁ করে উঠে শূন্য ডিগবাজি খেলো, স্ট্যালিয়ন, চার পা আকাশের দিকে তুলে ধরাশায়ী হলো, তার নিচে চাপা পড়লো সারা আর বাচ্চা। দেখলো তারপরও ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ওদের চারপাশে ধুলো ওড়াচ্ছে, সশব্দে ঢুকে যাচ্ছে স্ট্যালিয়নের নিখর গায়ে।

ইতিমধ্যে আবার নালার খাড়া গা বেয়ে ওঠার জন্যে মোচড় খেতে শুরু করেছে গ্রেগোরিয়াস, জেকের আরেকটা চড় খেয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললো সে। 'স্টপ দ্যাট।' খেঁকিয়ে উঠলো জেক। 'বুঝতে পারছো না, একবার বেরুলে আর ফেরা সম্ভব নয়?'

'কিন্তু সারাকে....,' কথা বলতে পারছে না ভিকি, হাঁপিয়ে উঠছে... সারাকে ফেরত আনতে হবে না, জেক? প্লিজ, জেক। আমাকে বাধা দিয়ো না, প্লিজ!'

ধমক দিলো জেক, 'আগে দেখো আমি কী করি।' হ্যাঁচকা টানে গ্রেগোরিয়াসকে দাঁড় করালো ও, তার পিঠে কনুইয়ের নিষ্ঠুর গুঁতো দিয়ে নামিয়ে আনলো নালার গা থেকে, এক হাতে কবজি ধ'রে টেনে আনছে ভিকিকে। বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো ভিকি, জেকের হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইছে, ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে আছে উপত্যকার দিকে, বুরবুরে মাটিতে বারবার পিছনে যাচ্ছে অনিচ্ছুক পা। 'জেক, ছাড়ো আমাকে। চাডো, প্লিজ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে? কী করতে চাও তুমি?'

'তোমরা সাহায্য করবে,' বললো জেক, 'তাহলে সময় খুব কম লাগবে—কারে ভিকার্স তুলবো। গুহাগুলোর সামনে রয়েছে আর্মারড কারগুলো, রাগ আর আক্রোশ ঝেড়ে ফেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি করছে ও। 'ভিকি, আমার গাড়িটা তুমি চালাবে, মেশিনগানের দায়িত্ব আমার। গ্রেগোরিয়াস, গ্যারেথের গাড়িটা তুমি চালাবে।'

ওর কথা শুনে পিছন থেকে পাশে চলে এলো ভিকি, তিনজনই ওরা ছুটতে শুরু করলো।

'তোমরা দু'জন ছাড়া আমাদের ড্রাইভার নেই—একটা গাড়ি ড্রাইভারশন হিসেবে ব্যবহার করবো। গ্যারেথকে নিয়ে তুমি যাবে দক্ষিণ দিকে, রিজ-এর পিছন দিয়ে। তোমাদের নিয়ে ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে, সেই সুযোগে আমি আর ভিকি সান্নাসহ আরো যারা বেঁচে আছে তাদের যে-ক' জনকে পারি তুলে নেবো।'

কোনো প্রশ্ন নয়, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সমর্থন করলো ওরা। নালার অনেকটা ভেতর চলে এসেছে, এই সময় আবার এক পশলা মেশিনগানের গুলি হ'লো উপত্যকায়, পরমুহূর্তে দু'তিনবার গর্জে উঠলো ইতালিয়দের কামান। কাউকে লক্ষ্য করে নয়, সম্ভবত সমাপ্তিসূচক বা সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার করা হলো।

নালার শেষ বাঁকটা ঘুরলো তিনজন, সেই সাথে যেনো কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করলো। গোটা নালা আদিবাসীদের ভিড়ে গিজগিজ করছে। এরা সবাই ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে আক্রমণের হাত থেকে। ভয়ানক ব্যস্ত তারা, কারো দিকে তাকানোর এক মুহূর্ত সময় নেই কারো। যে-যার জিনিসপত্র বেঁধে-হেঁদে জড়ো করছে এক জায়গায়, গাধা আর খচ্চরের পিঠে তুলছে। গুটানো তাঁবু কাঁধে করে নিয়ে আসছে কিছু লোক, কিছু লোক এরইমধ্যে ঘোড়া ছুটির রওনা হয়ে গেছে গ্রামের পথে। উটের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সদ্য বিধবারা, চারদিক থেকে তারস্বরে চিৎকার করছে গাধা আর খচ্চরগুলো, ভয় পেয়ে ব্যা ব্যা করছে ছাগলের পাল, পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে বাচ্চা কোলে ছুটোছুটি করছে মায়েরা, স্বামীদের খুঁজে পাচ্ছে না। আর এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এখনো এখানে-সেখানে কাল রাতের আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে গোটা নালা।

ভিড়ের ফাঁকে চকচকে সাদা গাড়িগুলো দেখতে পেলো ওরা, সাদার ওপর জ্বলজ্বল করছে লাল ক্রস-চিহ্ন।

কনুই চালিয়ে, ধমক দিয়ে ভিড়ের ভেতর পথ করে নিলো ওরা। সবচেয়ে কাছের গাড়ির পাশে পৌঁছে ভিকির কোমরে দুই হাত রাখলো জেক, তুলে দিলো গাড়ির ওপর। এক মুহূর্তের জন্যে নরম হ'লো ওর চেহারা। 'তুমি ইচ্ছে করলে না গেলেও পারো, ভিকি। তখন কিছু না ভেবেই চাইছিলাম তুমিও যাবে। তোমাকে গাড়ি চালাতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, গ্যারেথ আর আমি একটা গাড়ি নিয়েও কাজটা করতে পারবো।'

রাত জেগেছে ভিকি, উপত্যকার নারকীয় দৃশ্য দেখে কেঁদেছে, স্নান আর নোংরা হয়ে আছে তার চেহারা। সবেগে মাথা নাড়লো সে। 'কী বলছে! কেউ না গেলেও আমি যাবো!' এমন ঝাঁঝের সাথে বললো, জেক যেনো তাকে অপমান করেছে। 'তোমার গাড়ি আমিই চালাবো।'

'লক্ষী মেয়ে,' বললো জেক। 'ট্যাংক ভর্তি ফুয়েল দরকার হবে আমাদের, শ্বেগোরিয়াসকে সাহায্য করো।' ঘুরে দাঁড়ালো জেক, শ্বেগোরিয়াসকে চিৎকার করে বললো, 'রঙ্গিলা আর সারকে নিচ্ছি আমরা....ভিকি তোমাকে সাহায্যে করবে।'

রাস গোলামের দেহরক্ষীদের কয়েকজন এরইমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ভরা কার্ঠের বাস্কগুলো একটা গুহা থেকে বের করে এনে এক জায়গায় জড়ো করছে, এই সময় ওখানে পৌঁছুলো জেক। একেকটা বাস্ক চারজন দেহরক্ষী ধরাধরি করে হাঁটু মুড়ে থাকা উটের পিঠে তুলছে, তোলার পর কুঁজের সাথে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে বাস্কগুলো।

'এই যে, তোমরা!' চারজনের একটা দলকে দেখে ডাকলো জেক, ভিকার্স ভরা একটা বাস্ক বয়ে নিয়ে আসছে তারা। 'ওটা নিয়ে আমার সাথে এসো।' দলটা দাঁড়িয়ে

পড়লো, জেকের ভাষা বুঝতে পারছে না। হাত নেড়ে, ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করলো ও। এই সময় কোথেকে একজন আদিবাসী যোদ্ধা ছুটে এলো, দেহরক্ষীদের ওপর হস্তিত্ব করতে দেখে বোঝা গেলো রাস গোলামের ঘনিষ্ঠ কেউ হবে। চারজনের দলটাকে জেকের পিছু নিতে বাধা দিলো সে, অস্ত্রভঙ্গি করে দেখালো বাস্তবতা কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না, উটের পিঠের তুলতে হবে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো জেক, কিন্তু কেউ কারো ভাষা না জানায় সমস্যার কোনো সুরাহা হ'লো না; লোকটা গৌয়ার, এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে।

‘দুর্গত, বন্ধু,’ ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ধাঁ করে লোকটার কানের পাশে ঘুসি মারলো জেক, লোকটা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার সাথে সাথে তর্কাতর্কিরও সমাপ্তি ঘটলো। ‘এসো তোমরা,’ দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিলো ও। ভিড় ঠেলে হনহন করে এগোলো গাড়িগুলোর দিকে। উপত্যকায় আহত হয়ে পড়ে আছে সারা, এই চিন্তাটি উন্মাদ করে তুলছে ওকে। কল্পনায় দেখতে পেলো রক্তক্ষরণে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, বালি মেশানো মাটি শুষে নিচ্ছে তাজা লাল রক্ত।

ফিরে এসে দেখলো রঙ্গিলার ক্র্যান্ড হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে গ্রেগোরিয়াস। প্রথমবারেই স্টার্ট নিলো কার। আস্তে করে ইগনিশন টেনে নিলো ভিকি।

‘গ্যারেথ কোথায়?’ চিৎকার করলো জেক।

‘কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না,’ জবাব দিলো গ্রেগোরিয়াস। ‘একটা গাড়ি নিয়ে যেতে হবে...’ হঠাৎ হাসির শব্দে দু’জনেই ওরা ঘাড় ফেরালো।

শিখিল ভঙ্গিতে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ সোয়েলস্। সম্পূর্ণ শান্ত সে, আগের মতোই ধোপদুরন্ত-চুলগুলো পরিপাটি করে ব্রাশ করা, স্যুটের ভাঁজ এতো নিখুঁত, যেনো এইমাত্র দর্জির দোকান থেকে ডেলিভারি আনা হয়েছে।

‘তাহলে এই ব্যাপার!’ ব'লে ভুরু নাচিয়ে হাসলো সে, কৌতুক ভরা মুখটা ঠোঁটের ফাঁকে ধরা চুরুটের নীল ধোঁয়ায় মুহূর্তের জন্যে ডাকা পড়ে গেলো। ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা জেক বারটন আর তার দুই হাঁসের ছানা পুরো ইতালিয়ান বাহিনীর সাথে লড়তে যাচ্ছে?’

ড্রাইভারের খোলা হ্যাচ থেকে দেখা দিলো ভিকির মাথা। ‘আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম, গ্যারেথ।’

‘নাও,’ হালকা সুরে রসিকতা করলো গ্যারেথ, ‘এবার গার্লস গাইড এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ভাষণ শোনো।’

‘নালা থেকে বেরিয়ে গেছে সারা।’ এক ছুটে গ্যারেথের সামনে চলে এলো গ্রেগোরিয়াস। ‘আমরা তাকে তুলে আনতে যাচ্ছি। আপনি আর আমি এক গাড়িতে থাকবো, জেক ভাই আর ভিকি....’

গ্রেগোরিয়াসের কথা শেষ হ'লো না, বাধা দিলো গ্যারেথ। ‘কেউ আমরা কোথাও যাচ্ছি না।’ মাথা নাড়লো সে।

আবেগের বশে গ্যারেথের বুকের কাছে কোট ধ'রে ঝাঁকাতে শুরু করলো গ্রেগোরিয়াস। ‘সারা! সারা! আপনি বুঝতে পারছেন না! সারা আহত হয়েছে! উপত্যকায়! ওকে আমাদের তুলে আনতে হবে!’

হেসে উঠলো ভিকি। 'তার উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে? মানে, আজকালের মেয়েরা কি কঠিন ব'লে ঘন ঘন পা'জামা খোলার চেষ্টা বাদ দিয়েছে?'

'আস্তে না!' হেসে উঠলো সারাও। 'তবে কাজটা সত্যিই কঠিন।' তার সুরটা এমন, যেনো অভিজ্ঞতা থেকে বলছে। 'অবশ্য খোলার সময় তেমন অসুবিধে হয় না-অসুবিধে হয় তাড়াতাড়ি পরার সময়।'

ওষুধের বাস্র থেকে একটা কাঁচি বের করলো ভিকি। 'তোমার এটা কেটে নামাতে হবে।'

'এতো সুন্দর একটা জিনিস, কাটো-জেক তো আগেই ওটার বারোটা বাজিয়েছে।'

কাঁচি দিয়ে কেট পা'জামাটা সারার কোমর থেকে খসিয়ে আনলো ভিকি। 'এবার তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।' তার গায়ে একটা উলেন আলখাল্লা চাপালো সে, কোমর থেকে নিচের দিকটা নগ্নই থাকলো। গাড়ির মেঝেতে, মোটা চটের ওপর শুয়ে আছে সে।

পোর্টেবল টাইপরাইটার নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ভিকি, পিছু ডাকলো সারা, 'চলে যেয়ো না। আমার সাথে আর কিছুক্ষণ থাকো।'

ইতস্তত করে ভিকি বললো, 'কিন্তু আমাকে যে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।'

'এখানে ব'সে করো। আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না।'

'প্রমিস?'

'আই প্রমিস।'

কেস থেকে বের করে টাইপরাইটারটা কোলে নিলো ভিকি, লম্বা করে একটার ওপর আরেকটা তুলে দিয়েছে পা। মেশিনে নতুন কাগজ ভরে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো সে। তারপর তার আঙুল প্রজাপতির মতো ছুঁয়ে যেতে শুরু করলো কী গুলোকে। প্রায় সাথে সাথেই রাগ আর ভাবাবেগ ফিরে এলো তার মধ্যে, প্রাঞ্জল শব্দের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হ'লো সব হলুদ কাগজের বুকে। তার চেহারায় লালচে আভা ফুটলো, মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুল সরালো চোখ থাকে।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো সারা, নড়ছে না বা কথা বলছে না। তারপর আরেকটা নতুন কাগজ ভরলো ভিকি মেশিনে, এই সময় নিস্তব্ধতা ভাঙলো সে। 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করেছি, ভিকি।'

'করেছো?' ভিকি মুখ তুলে তাকালো না।

'আমার ধারণা লোকটা জেক।'

'জেক?' দ্রুত মুখ তুললো ভিকি, হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কারণ বোধগম্য হ'লো না।

'হ্যাঁ,' নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সারা। 'তোমার প্রথম প্রেমিকে হিসেবে জেককেই আমরা গ্রহণ করবো।' বলার ঢঙে পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্যাপারটাকে দলীয় আয়োজন হিসেবে দেখছে সে।

‘তাই? তোমার বুঝি সেরকম ধারণা?’ ধারণাটা আগেই ভিকির মাথায় ঢুকেছে, বলা যায় প্রায় স্পষ্ট রায় আরেকজনের কাছ থেকে আসায় দ্রুত উপেক্ষা করার একটা প্রবণতা পেয়ে বসলো তাকে।

‘সত্যিকার একটা পুরুষ। গায়ে কী জোর! তেমনি সাহস। হ্যাঁ, ওকেই।’ ব’লে চলেছে সারা, ‘আমার ধারণা, জেককেই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।’ কথাগুলো বলে, জেকের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, এক নিমেষে সেটাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিলো সে।

এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নাক টানলো ভিকি, ঝড় তুললো টাইপরাইটারে। আসলে সে স্বাধীনচেতা মেয়ে-যে কিনা ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করে।

ডেউ খেলানো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে ঘাস মোড়া মুক্ত প্রান্তর পর্যন্ত পশু আর মানুষ গিজগিজ করছে। গোটা এলাকার ওপর মিহি ধুলো উড়ছে, রোদ লেগে চারদিকে ঝিকমিক করছে বর্ষার ফলা আর মাতাল ঢাল। গোত্রে যারা প্রভাবশালী শুধু তারা ঘোড়ায় চেপে আসছে, তাদের প্রায় সবার পড়নে রঙচঙে সিল্কের আলখাল্লা। মালপত্র বয়ে আসছে পশুগুলো, তাদের মধ্যে দূর দিগন্তের কাছে চেনা যাচ্ছে শুধু উটগুলোকে।

প্রিসিলার টারিটে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেক, হেলমেটের ছায়ায় বাইনোকুলারের লেন্স, ধুলোর পাহাড় ভেদ করে দূরে চলে গেছে ওর দৃষ্টি, বিশৃংখল আদিবাসীদের ঘাড়ে চড়াও হবার জন্যে ইতালিয়রা ধাওয়া করে আসছে কিনা বুঝতে চায়। খারাপ দিকটা কল্পনা করতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেলো ওর। ইতালিয়রা এখন যদি এসে পড়ে, আবার পাইকারীভাবে মারা পড়বে আদিবাসীরা-শিকার হবে ক্রস ফায়ারের।

হঠাৎ জেকের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেলো। ওদের অস্ত্রগুলো কখন পৌঁছবে কে জানে। এই জনারণ্যের ভেতর কোথায় সেগুলো লুকিয়ে আছে তাই বা কে বলবে।

কাঁধে হাত পড়ায় ঘাড় ফেরালো ও। দেখলো পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্স লিজ মিখায়েল।

‘ধন্যবাদ, মিঃ জেক,’ শান্ত গলায় বললো প্রিন্স।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার চোখে বাইনোকুলার তুললো জেক।

‘ঠিক কাজটি করেছো তা বলি না, তবু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।’

‘কেমন আছে ও?’

‘এইমাত্র মিস ভিকির সাথে দেখে এলাম, বিশ্রাম নিচ্ছে-তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে।’

দু’জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো, তারপর প্রসঙ্গটা তুললো জেক, ‘আমার চিন্তা হচ্ছে, প্রিন্স। একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি আমরা। শিফটারা যদি ধাওয়া করে, বীভৎস কাণ্ড ঘটে যাবে। অস্ত্রগুলো কোথায় বলতে পারো? ওগুলো আমাদের এখনি দরকার।’

চুলোর কাছ থেকে উঠে এসে ওদের সাথে টেবিলে বসলো ভিকি। ‘সময় তুমি পাবে না,’ বললো সে। ‘প্রস্তুতি তোমার যা নেয়ার এখনি নিতে হবে।’

‘তারমানে ? এ-কথা বলছো কেনো?’

‘গতকাল দুপুরে মারিব নদী অতিক্রম করেছে ইতালিয়রা। পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা, বোমা মেরে রাস্তাঘাট উড়িয়ে দিচ্ছে। পুরোদস্তুর যুদ্ধ এখন ওখানে।’ বললো ভিকি।

ঠোট গোল পাকিয়ে শিষ দিলো জেক, নরমস্বরে বললো, ‘হিয়ার উই গো।’ গ্যারেথের দিকে ফিরলো ও। ‘খবরটা তুমিই বরং রাস গোলামকে দাও। একমাত্র তুমিই ওকে সামলাতে পারো।’

‘আমার ওপর তোমার আস্থা দেখে একটা ধাক্কা খেলাম,’ মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করলো গ্যারেথ।

‘রাস গোলামের কী প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারি। ছুটে গিয়ে সরাসরি আঘাত করতে চাইবেন তিনি। জানা কথা, সুযোগ দেয়া হলে নিজের বাহিনীকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবেন। ওঁকে তোমার শাস্ত রাখতে হবে।’

‘কীভাবে তা সম্ভব বুদ্ধি দাও-মরফিন ইঞ্জেক্ট করবো, নাকি লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারবো মাথায়?’

‘রামি খেলতে বসাও,’ পরামর্শ দিলো জেক। সেদ্ধ একটা ডিম মুখে পুরে চেয়ার ছাড়লো ও। ‘নাস্তার জন্যে ধন্যবাদ, ভিকি। যাই, দেখি, ভরসার কী অবস্থা করেছেন রাস গোলাম।’

একটানা দু’ঘণ্টা কাজ করলো জেক। ভরসা’র গোটা গিয়ারবক্স খুলে আনতে হবে। বিশ গজ দূরে নিজের তাঁবুর বাইরে টেবিলে বসে রয়েছে ভিকি, আপনমনে দ্বিতীয় রিপোর্টটা টাইপ করছে। কাজে ব্যস্ত থাকলেও, একজন আরেকজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তবে প্রকাশ্যে নয়। ভুলেও কেউ একবার কারো দিকে তাকালো না।

অবশেষে কঠিন কাজটা শেষ করলো জেক, সেটিং থেকে বের করে আনলো গিয়ারবক্স। পিছিয়ে এসে ন্যাকড়া দিয়ে হাতের গ্রিজ মুছলো, বললো, ‘কফি ব্রেক।’ হেঁটে আগুনের পাশে চলে এলো ও, দুটো মগে কালো কফি ফেলে টেবিলের সামনে থামলো। ‘কেমন হচ্ছে তোমার রিপোর্ট?’ জিজ্ঞেস করলো ভিকিকে, টাইপরাইটারের সচল কাগজটার ওপর চোখ বুলালো একাবর। ‘পুলিটজার আশা করা যায়।

হেসে উঠলো ভিকি, হাত বাড়িয়ে কফির মগটা ধরলো। ‘পুরস্কার কখনো সেরা লোকটি পায় না।’

‘কিংবা সত্যি যার দরকার,’ সায় দেয়ার সুরে বললো জেক, ভিকির উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসলো।

পরামর্শসভা ডেকেছেন দুপুরে, ব'লে পাঠিয়েছেন আপনাকেও থাকতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ভরসা'র দিকে হনহন করে এগোলো সে।

এক মুহূর্ত ভিকির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো জেক, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো।

'মনে রেখো- সহজে হাল ছাড়ি না আমি,' নরমস্বরে ব'লে গ্রেগোরিয়াসের পিছুপিছু চ'লে গেলো সে।

এক ঘণ্টা পর, গিয়ারবক্স খুলে পার্টস-গুলো পরিষ্কার একটা ক্যানভাসে রাখলো ওরা। পিছিয়ে এলো জেক, বললো, 'না, সম্ভব নয়। তোমার দাদা তাঁর হাঁস জবাই করে ফেলেছেন, এ আর ডিম পাড়বে না।'

'হ্যাঁ,' বললো গ্রেগোরিয়াস, কালো হয়ে গেছে তার চেহারা, 'কী বলবো, দাদা একটা।' সময়মতো নিজেকে সামলে নিলো সে। 'দাদার উৎসাহ আর প্রাণশক্তি আরেকটু কম হলে খুশি হতাম।'

'দুপুর তো হয়ে এলো,' আড়মোড়া ভেঙে বললো জেক। 'চলো দেখি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর ভদ্রলোক কী বলেন।'

রাস বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে আস্তানা গেড়েছেন রাস গোলাম। তাঁর সাথে শুধু সর্দার, প্রভাবশালী মাতবর, আর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা ঠাঁই পেয়েছে। বেড়া, প্যারফিন টিন, গাছর পাতা ইত্যাদি দিয়ে তাড়াহুড়োর সাথে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু কুঁড়েঘর, সব মিলিয়ে দুই একর জায়গার ওপর ছোটোখাটো একটা গ্রামই বলা যায়। গলিগুলোর ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা ঘুর ঘুর করভে, গোটা এলাকার অবাধে চরছে ছাগল, নেড়ি কুত্তা, গাধা আর উট।

গ্রামের মাঝখানে রাস গোলামের তাঁবু। তাতে এতো বেশি তালি পড়েছে, প্রথম যে ক্যানভাস দিয়ে ওটা বানানো হয়েছিল সেটার প্রায় কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রবেশ পথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেহরক্ষীরা, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

গোত্রপ্রধানের তাঁবুর আরো সামনে বড় একটা খোলা মাঠ, অপেক্ষারত আদিবাসী যোদ্ধারা সেটা প্রায় ভ'রে ফেলেছে।

'মাই গড,' বিস্ময় প্রকাশ করলো জেক। 'পরামর্শসভায় দেখছি সবাই উপস্থিত।'

'সেটাই নিয়ম,' ব্যাখ্যা করলো গ্রেগোরিয়াস। 'সবাইকে হাজির থাকতে হবে, তবে কথা বলতে পারবে শুধু মাতবর আর সর্দাররা।

মাঠে গালা আর রাসটা বাহিনীর মাঝখানে রয়েছে এক চিলতে ফাঁকা জমিন। একটা হাত তুলে জেককে দেখিয়ে ভিকি, বললো, 'ওরা গালা গোত্রের লোক, হারারি আর রাসটাদের সাথে সাপে-নেউলে সম্পর্ক।'

'একদল জল্লাদ,' বিড়বিড় করলো জেক। 'এ-ধরনের বন্ধু থাকলে, শত্রুর দরকার কী?'

বীরত্ব আর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। সর্দাররা মুহূর্ত্ত উল্লাসে পেটে পড়লো। বেশ কয়েক মিনিট পর আবার তিনি জেকের দিকে ফিরলেন।

‘দাদা বলছেন, ইতালিয়দের বাহিনীকে মাটির সাথে শুইয়ে দেয়ার জন্যে তিনটে গাড়িই যথেষ্ট।’

‘তাঁর আত্মবিশ্বাসের বহর দেখে আমি মুগ্ধ,’ ব্যঙ্গ করলো গ্যারেথ।

জেক বললো, ‘আরো সমস্যা আছে—ড্রাইভার আর গানারের অভাব রয়েছে আমাদের। তোমাদের লোককে ট্রেনিং দিয়ে গড়ে নিতে দু’এক হপ্তা সময় লাগবে।’

রাস গোলাম প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন, যেনো জেকের বক্তব্য অনুবাদ ছাড়াই বুঝতে পারছেন। তাঁকে সমর্থন করে সর্দার আর মাতবররাও টেঁচামেচি শুরু করলো।

‘দাদা চাইছেন, ওয়েলস অব চান্ডিতে ইতালিয়দের পজিশনে হামলা চালাবেন। তাঁর ইচ্ছে, এই মুহূর্ত্তে হামলা চালাতে হবে।’

গ্যারেথের দিকে তাকালো জেক, গ্যারেথ তাঁবুর মাথার দিকে মুখ তুলে চোখ ঘোরালো।

‘নির্মম সত্যটা ফাঁস করো, ওল্ড চ্যাপ।’

মাথা নাড়লো জেক। ‘তোমার কথা উনি শুনবেন ব’লে মনে হয়। বুঝিয়ে দেখো।’

বড় করে শ্বাস টানলো গ্যারেথ, তারপর শুরু করলো। আর্মারড সাপোর্ট সত্ত্বেও সামনে থেকে আক্রমণ করা আত্মহত্যার সামিল হবে, কারণ শত্রুদের কমান্ডিং পজিশনে ট্রেন্ডের ভেতর রয়েছে মেশিনগান আর মর্টার।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর সে বললো, ‘নিজেদের গরজেই সামনে বাড়তে হবে ইতালিয়দের। তখন আমরা সুযোগ পাবো।’

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় আর প্রাণশক্তির অর্ধেকটা ব্যয় করার পর রাস গোলামকে রাজি করাতে সমর্থ হ’লো গ্যারেথ। ইতালিয়দের বাহিনী ওয়েলস অব চান্ডির মাথা থেকে নিজেদের পজিশন না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। ইতালিয়রা খোলা প্রান্তরে নেমে এলেই আক্রমণ করা হবে। এরপর আবার দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। তিনটে গাড়ির জন্যে যথেষ্ট ড্রাইভার ও গানার নেই।

‘আমি ড্রাইভ করতে পারি,’ মাঝখান থেকে বললো ভিকি, হঠাৎ সে বুঝতে পেরেছে তার কথা কেউ বিবেচনাতেই আনছে না।

জেক আর গ্যারেথ দৃষ্টি বিনিময় করলো, সাথে সাথে দু’জনেই সম্পূর্ণ একমত হলো, তবে প্রতিনিধি হিসেবে কথা বললো গ্যারেথ, ‘শখের ড্রাইভার হিসেবে আর্মারড কার চালানো এক কথা, আর ওটা নিয়ে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অন্য কথা, মাই ডিয়ার। এখানে তুমি আছো যুদ্ধের রিপোর্ট লেখার কাজ নিয়ে, যুদ্ধ করার জন্যে নয়।’

কটমট করে গ্যারেথের দিকে তাকিয়ে থাকলো ভিকি, তারপর সমর্থনের আশায় ঝট করে জেকের দিকে ফিরলো। ‘জেক!’ শুরু করলো সে।

‘গ্যারেথ ঠিক বলেছে,’ ভিকিকে থামিয়ে দিলো জেক। ‘ওর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।’

চুপসে গেলো ভিকি, রাগটা দমন করার চেষ্টা করলো, জানে এই মুহূর্তে তর্ক করে কোনো লাভ হবে না। সে যে ওদের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়, সেটা সময় মতো দেখিয়ে দেয়া যাবে, ভাবলো সে।

আবার আলোচনা শুরু হলো। রণকৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেক বললো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিকার্স গানসহ আর্মারড কারগুলো ইতালিয় বাহিনীর সাথে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায়। যেকোনো মূল্যে ইতালিয়দের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা ফাঁক তৈরি করতে হবে, সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকবে রাস গোলামের অশ্বারোহী সৈনিকরা।

গ্রেগোরিয়াস বললো, 'দাদা এখন বলছেন, চান্ডির গুহা পেরিয়ে এলেই ইতালিয়দের ওপর হামলা করতে হবে। হারারি আর গালা, দুই গোত্রের অশ্বারোহী যোদ্ধারা এই আক্রমণের দায়িত্ব নেবে, নেতৃত্বে থাকবে দুটো আর্মারড কার। পদাতিক, ভিকার্স গান আর অবশিষ্ট আর্মারড কার এখানে, এই সারডি গিরিসংকটে রিজার্ভ হিসেবে থাকবে।'

'গাড়িগুলোর ড্রাইভার থাকবে কারা?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

'আপনি আর আমি একটা গাড়িতে, দ্বিতীয় গাড়িতে ড্রাইভার থাকবেন মেজর গ্যারেথ সোয়েলস্, গানার থাকবেন দাদা।'

'আমার কপালে এতো বড় অভিশাপ নেমে আসছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' গুণ্ডিয়ে উঠলো গ্যারেথ। 'আদ্যিকালের বুড়োটা স্রেফ একটা উন্মাদ। নিজের জন্যে, এবং তার চারপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বাকি সবার জন্যে সে একটা ভীতিকর অভিজ্ঞতা।'

'ইতালিয়দের জন্যে,' সায় দিলো জেক। হাসছে।

'তুমি তো হাসবেই,' অভিযোগ করলো গ্যারেথ। 'তোমাকে তো আর একটা টিনের কৌটার ভেতর ম্যানিয়াকটার সাথে থাকতে হচ্ছে না। গ্রেগোরিয়াস, শোনাও ওকে....।'

'না, মেজর সোয়েলস্।' মাথা নাড়লো গ্রেগোরিয়াস, তার চেহারা নির্লিপ্ত। 'আমার দাদা অর্ডার যা দেয়ার দিয়ে ফেলেছেন, তাঁর কথার ওপর আর কোনো কথা চলবে না। আপনার প্রতিবাদ আমি তাঁকে অনুবাদ করে শোনাবো না—তবে আপনি যদি জেদ ধরেন, এইমাত্র তাঁর সম্পর্কে যে বিশেষণগুলো উচ্চারণ করলেন সেগুলো অনুবাদ করে।'

'মাই ডিয়ার চ্যাপ,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে গ্রেগোরিয়াসকে থামিয়ে দিলো গ্যারেথ। 'তোমার দাদা আমাকে নির্বাচিত করায় ব্যাপারটাকে আমি দুর্লভ সম্মান হিসেবে নিচ্ছি। মন্তব্য যেগুলো করেছি, স্রেফ কৌতুক ছিলো, বিলিভ ইট। নো অফেন্স, ওল্ড চ্যাপ, নো অফেন্স অ্যাট অল।' সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো, তাস তুলে নিয়ে পরবর্তী দান বাঁটতে শুরু করেছেন রাস গোলাম। 'এখন আমার একটাই প্রার্থনা—তাড়াতাড়ি মুভ করুক ইতালিয়রা। তাসের পরাজয় আর আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবো না।'

তীব্র মুখ থেকে স্যানুট করলো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। ‘আপনি আমাকে ডেকেছেন, মাই কর্নেল?’

বিশার আয়নায় চোখ রেখে ছোট্ট করে মাথা, বাঁকালো কাউন্ট আলদো বেলিনি, পরমুহূর্ত আবার নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে মনোযোগ দিলো। ‘জিনো!’ ধমক মারলো সে। ‘আমার বাঁ বুটের ডগায় ওটা কি ময়লার দাগ?’

সার্জেন্ট জিনো সাথে সাথে হাঁটু মুড়ে বসলো কাউন্টের পায়ের কাছে, হুমড়ি খেয়ে পড়লো বুটের ওপর, বুটের গায়ে তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ায় চকচকে ভাটা ম্লান হয়ে গেলো—তাড়াতাড়ি নিজের শার্টের হাতা দিয়ে বুটটা পালিশ করলো সে।

চোখ তুলে তাকিয়ে কাউন্ট দেখলো এখনো প্রবেশপথের কাছে ইতস্তত করছে মেজর ক্যাস্তেলানি। তার চেহারা এমনই সীসার মতো ভারি আর নিরস, কাউন্ট অনুভব করলো তার রাগ ফিরে এসেছে। ‘গু-মুত খেয়েছো নাকি, ক্যাস্তেলানি, তোমার চেহারা এমন তেতো হয়ে আছে কেনো?’

‘আমার আশংকার কথা আমি তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি, মাই কর্নেল।’

‘বটে!’ হুংকার ছাড়লো কাউন্ট। ‘সেজন্যেই কি তোমাকে আমি যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও এখনো তুমি রওনা হও নি?’

‘মাই কর্নেল, আমি কি আরেকবার ব্যাখ্যা করতে পারি কেনো আমাদের পজিশন ছেড়ে নড়া উচিত হবে না?’

‘না, পারো না! আরে খচর, এল ডুসে, বেনিটো মুসোলিনি স্বয়ং আমার ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন।

‘মাই কর্নেল, শত্রুরা....।’

‘বাহ্!’ ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো কাউন্টের চেহারা। ‘বাহ্ ছাড়া আর কী বলার আছে আমার? তুমি বলছো শত্রু, আমি বলি বর্বর! আমি বলি জংলী, তুমি বলো সৈনিক। বাহ্!’

‘আমার কর্নেল যা বলেন, কিন্তু আর্মারড কার—।’

‘না! ক্যাস্তেলানি, না! ওটা কোনো আর্মারড ভেহিকেল ছিলো না—ছিলো একটা অ্যান্ডুলেস।’ কাউন্ট নিজেকে সত্যিই তাই বুঝিয়েছে। ‘বিজয় নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, সেটা আমি তোমার কথার হাত ছাড়া করতে পারি না। ভীতু মেয়েমানুষের মতো গর্তের ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকতে অস্বীকার করছি আমি। ভয় পাওয়া আমার স্বভাব নয়, তুমি ভালো করেই জানো। আমি অ্যাকশন, ডিরেক্ট অ্যাকশন পছন্দ করি।’

হাল ছেড়ে দিয়ে মেজর বললো, ‘কর্নেল যা বলেন।’

‘আমি কী বলি সেটা বড় কথা নয়, ক্যাস্তেলানি। বড় কথা হ’লো ঈশ্বর এই গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়েছেন। একজন বীরযোদ্ধা হিসেবে সে দায়িত্ব অবশ্যই আমি পালন করবো।’

এর কোনো জবাব হয় না। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে তাঁর থেকে কাউন্টকে বের করার পথ করে দিলো মেজর ক্যাস্টেলানি। কাউন্টের চিবুক উঁচু হয়ে আছে, দৃঢ় পায়ে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

সেই ভোর অন্ধকার থাকতে মেজর ক্যাস্টেলানির স্ট্রাইক ফোর্স তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। এর লাইনে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশটা ট্রুপ ট্রান্সপোর্টার। সামনে বাড়ার আদেশ দিতে ইচ্ছে করেই দেরি করেছে মেজর ক্যাস্টেলানি।

ইতিমধ্যে রণকৌশল স্থির করে ফেলেছে সে। ওয়েলস অব চান্ডির মাথার ওপর, ট্রেনের ভেতর পুরো একটা কোম্পানি রেখে যাওয়া হবে, একজন ক্যাপটেনের অধীনে। বাকি সব ট্রুপস-কে নিয়ে গিরিখাদের দিকে এগোবে তারা, প্রবেশপথ দখল করবে, লড়তে লড়তে উঠে যাবে হাইল্যান্ডের দিকে।

লাইনের প্রথমে পাঁচ ট্রাক ভর্তি রাইফেলম্যান রয়েছে, তার ঠিক পিছনে মেশিনগান সেকশন—কয়েক মিনিটের নোটিসে অ্যাকশনে যেতে পারবে ওগুলো। মেশিনগানের পিছনে বিশটা ট্রাকে রয়েছে পদাতিক বাহিনী, আর লাইনের একেবারে শেষ মাথায় রয়েছে আরো দশটা ট্রাক। ফিল্ড আর্টিলারিকে নিজের চোখ আর হাতের নিচে রেখেছে মেজর ক্যাস্টেলানি।

কলাম যদি ঘোরতর কোনো বিপদে পড়ে, কলাম খুলে সারিবদ্ধভাবে সাজাতে যে মূল্যবান সময় দরকার হবে তার জন্যে পদাতিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করেছে সে। কাউন্ট যে তাদেরকে বিপদের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই, তবে কামানের সুরক্ষিত মাজলের ছত্রছায়ায় থেকে বিপদ মোকাবিলা করা কঠিন হবে না।

প্রতিটি স্থির ট্রাকের পাশে বালি মেশানো মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে রয়েছে ত্রু আর ড্রাইভাররা—খালি মাথা, শার্টের বোতাম খোলা, হাতে সিগারেট।

মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে বড় করে শ্বাস টানলো মেজর লুইগি ক্যাস্টেলানি, তার নির্দেশ বজ্রনির্ঘোষের মতো ছড়িয়ে পড়লো মরু প্রান্তরে। ‘ফল ইন!’

সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠলো লোকজন, ব্যস্ত হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে ইউনিফর্ম ঠিকঠাক করলো, প্রতিটি ট্রাকের পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো তারা।

উত্তেজিতভাবে লাইনের সামনে পায়চারি শুরু করলো কাউন্ট বেলিনি। ‘তোমাদের রক্ত চাই, বীর সেনারা আমার? জানি, আমি জানি রক্তপিপাসায় অস্থির হয়ে আছে তোমরা।’ পিছনের বাতাসে হেলান দিয়ে মুক্তকণ্ঠে হাসলো সে। ‘বাহারা, তোমাদের আমি বালতি বালতি রক্ত দেবো। আজ তোমরা মনের আশ মিটিয়ে পান করতে পারবে!’

যারা গুনতে পাবার কাছাকাছি রয়েছে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করলো, অস্তিত্বের সাথে মাথা চুলকালো কেউ কেউ। মদ খেয়েছে সবাই, তার প্রভাবে আচ্ছন্ন।

অল্পবয়েসী এক ভাড়াটে সৈনিকের সামনে দাঁড়ানো কাউন্ট, হেলমেটের বাইরে তার লম্বা চুল ঝুলে রয়েছে। ‘ব্যাশ্বিনো,’ বললো কাউন্ট। ছোকরা মাথা নত করে অপ্রতিভ ভাবটুকু লুকানোর চেষ্টা করলো। ‘তোমাকে আজ আমরা একজন বীরযোদ্ধা বানাবো। রাইফেলম্যান সৈনিকটিকে আলিঙ্গন করলো সে। ‘তোমাকে শত্রুর হাতে নিহত হয়ে প্রমাণ করতে হবে, কাউন্ট বেলিনির নির্দেশ পেলে হাসতে হাসতে মরতে পারো তুমি।’ সৈনিকের লাজুক হাসি দপ করে নিভে গেলো, মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে মুখ তুললো সে।

‘গাও, ব্যাশ্বিনো, গাও!’ চেষ্টায়ে উঠলো কাউন্ট, নিজেই হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করলো ‘লা গিওভান্নেজা’। লাইনের সামনে মার্চ করতে করতে গেয়ে চললো সে, তার পায়ের নিচে মাটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো, লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছবার পর তার গান থামলো। মেজর ক্যাস্তেলানির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো সে, মেজর আবার একটা হংকার ছাড়লো।

‘মাউন্ট আপ।’

কালো শার্ট পরা ট্রুপারদের ঝাঁকটা ভেঙে গেলো, যে-যার ট্রাকের দিকে ছুটলো সবাই।

কলামের মাথায় সম্মানসূচক জায়গাটি দখল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্টের রোলস-রয়েস, ড্রাইভারের সিটে আগেই উঠে বসেছে গুইসেপ্পি, তার পাশে জিনো, হাতে ক্যামেরা।

রোলস-রয়েসের এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া রয়েছে, কাউন্টের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রে পিছনের সিট ভর্তি। স্পোর্টস রাইফেল, শটগান, ট্র্যাভেলিং ব্যাগ, পিকনিক বস্তু, বেতের তৈরি ওয়াইন ক্যারিয়ার, বাইনোকুলার, টেবিল ঘড়িসহ আরো কতো কী! গাড়িতে চড়ে প্যাড লাগানো নরম সিটে হেলান দিলো কাউন্ট, তাকালো মেজরের দিকে। ‘মনে রেখো, ক্যাস্তেলানি, আমার রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য হ’লো গতি আর চমক। শত্রুর হৃৎপিণ্ডে বজ্রাঘাত হানো—কাউন্ট বেলিনির নামে।’

কলামের সর্বশেষ ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে ব’সে রয়েছে মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি, সামনের উনপঞ্চাশটা ট্রাকের ধুলো খাচ্ছে আর দরদর করে ঘামছে। হাতঘড়ি দেখলো সে। ‘সর্বনাশ, এরইমধ্যে এগারোটা বেজে গেছে। দ্রুত এগোতে হবে আমাদের, না হলে—’

এই সময় কাকে যেনো অভিশাপ দিয়ে কষে ব্রেক করলো ড্রাইভার, ট্রাক পুরোপুরি থামার আগেই লাফ দিয়ে রানিং বোর্ডে বেরিয়ে এলো মেজর, সেখান থেকে আরেক লাফে উঠে পড়লো ক্যাবের ছাদে। ‘কী ব্যাপার?’ সামনের ট্রাকের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো সে।

‘কী জানি, মেজর, কিছু বুঝতে পারছি না,’ পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিলো লোকটা।

তাদের সামনে গোটা কলাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হ’তে মাথা নিচু করে নিলো মেজর, তার ধারণা হলো, সরাসরি একটা অ্যামবুশের ভেতর এসে পড়েছে তারা। চারদিক থেকে প্রশ্ন আর মন্তব্য শোনা গেলো। প্রায় সব ট্রাক থেকেই নেমে এলো ড্রাইভার আর হেলপাররা। সামনে কোথাও থেকে গুলির আওয়াজ হয়েছে।

চোখে বাইনোকুলার তুলে তাকালো মেজর ক্যাস্তেলানি। মরু বিস্তৃতি পেরিয়ে আবার ভেসে এলো গুলির শব্দ। এতোক্ষণে রোলস-রয়েসটাকে বাইনোকুলারের লেন্সে ধরতে পারলো সে।

কলাম থেকে বেরিয়ে বাম দিকের খোলা প্রান্তর ধ’রে ছুটছে রোলস-রয়েস। ব্যাক সিটের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট, তার হাতে শটগান। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। মেজর ক্যাস্তেলানিও তাকালো। পাখির পালক উড়ছে বাতাসে, নিহত পাখিটা ডিগবাজি খেতে খেতে রোলস-রয়েসের খানিকটা সামনে পড়লো। পাখির ঝাঁকটা এখনো রয়েছে এগোলো মধ্যে। কাউন্টের শটগান আবার গর্জে উঠলো। নীল আগুনের ফুলকি বেরুলো মাজল থেকে। আকাশে বিস্ফোরিত হ’লো আরো দুটো পাখি, বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো পালকগুলো। ব্রেক করলো ড্রাইভার।

জিনোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেজর, গাড়ি থেকে নেমে নিহত পাখি নিয়ে কাউন্টের কাছে ফিরে এলো সে। জিনোর হাত থেকে পাখি নিয়ে পোজ দিলো কাউন্ট, হাঁটু গেড়ে ব’সে চোখে ক্যামেরা তুললো জিনো। দু’কান পর্যন্ত বিস্তৃত হ’লো কাউন্টের ঠোঁট।

‘গাধাটা ডোবাবে!’ দাঁতে দাঁত চেপে ঝাল ছাড়লো মেজর ক্যাস্তেলানি।

•

আদিবাসী যোদ্ধাদের মধ্যে বিপজ্জনক একটা অস্থিরতা মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। সেই সকাল থেকে খুলি ফটানো রোদের মধ্যে ব’সে অপেক্ষা করছে তারা অথচ যুদ্ধ শুরুর কোনো আলামত এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

সকাল দশটার দিকে স্কাউটরা এসে রিপোর্ট করে গেছে, ইতালিয়রা পজিশন ছেড়ে রওনা হয়েছে। সাথে সাথে রাস গোলামের আদিবাসী বাহিনী সতর্কতার সাথে নির্বাচিত পজিশনে চলে এসেছে, কিন্তু তারপর আর কোনো খবর নেই।

ইতালিয়দের প্রথম আক্রমণটা কোথায় ঠেকানো হবে গ্যারেথ আগেই তা ঠিক করে রেখেছিল, সম্ভাব্য ভালো পজিশন খুঁজে বের করার জন্যে তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। আদিবাসীদের অশ্বারোহী বাহিনী অত্যন্ত বিশৃংখল, অল্প সময়ের

চোখ থেকে পানি গড়ালো। ‘দুনিয়া এখন জানে ইথিওপিয়ার কয়েক লাখ আদিবাসী কী রকম নির্ধাতন সহ্য করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এবার সভ্য দুনিয়া থেকে আমাদের জন্যে সাহায্য আসবে।’ মেয়েটা শিশুর সারল্য নিয়ে বিশ্বাস করছে, মঙ্গলের কাছে অমঙ্গলের পরাজয় অবশ্যস্বাভাবী। জেকের বাহু থেকে ভিকিকে ছাড়িয়ে আনলো সে, জেকের পরিবর্তে সেই আলিঙ্গন করলো ভিকিকে। ‘মিস ভিকি, তোমার এই ঋণ কোনোদিন আমরা শোধ করতে পারবো না।’ তার চোখের পানি ভিকির নাক-মুখ ভিজিয়ে দিলো, ঘন ঘন নাক টানলো সে, নিজের হাত দিয়ে মুছিয়ে দিলো ভিকির মুখ। ‘তোমার কথা চিরকাল আমরা মনে রাখবো,’ বললো সে, কান্নার মাঝখানে হাসলো। ‘চলো যাই, দাদাকে খবরটা দেই।’

খবরটা কেনো সুখবর, আদিবাসীদের তাতে কি উপকার বা লাভ, শতো চেষ্টা করলেও বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান রাস গোলামকে তা বোঝাতে পারা গেলো না। লীগ অব নেশনস বা জাতিসংঘের কী ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমই বা কী ভূমিকা রাখতে পারে—এ বিষয়ে তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কয়েক পাইন্ট তেজ পেটে পরার পর, নিজের মনের গভীরে তার বিশ্বাস গেড়ে গেছে। ইংল্যান্ডের মহারানী তাদের সমর্থন দিয়েছে, কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেট ব্রিটেনের সেনাবাহিনী তাদের সাথে ময়দানে লড়বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। গ্রেগ এবং সারা প্রাণপণে চেষ্টা করলো তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলার, তার ভুল সংশোধন করার। সবশেষে গ্যারেথকে আলিঙ্গন করে সতীর্থ যোদ্ধার সম্মান দিয়ে অ্যামহারিক ভাষায় যেনো বোমা বর্ষণ করলেন।

এরপর, ভাষণের মাঝপথেই, হঠাৎ অপত্যাশিতভাবে থেমে গেলেন রাস গোলাম, নাটকীয়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন, ঢলে পড়লেন মাংস ভরা বিশাল এক পাত্রে মুখ দিয়ে। সারাদিনে রয়ুন্ধ, মেসেজ শোনার পর উত্তেজনা, আর মাত্রাতিরিক্ত তেজ, সব মিলিয়ে বুড়ো মানুষটার শক্তি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকারই কথা। পাত্র থেকে চারজন দেহরক্ষী তুললো তাঁকে, ব’লে নিয়ে গেলো তাঁবুতে, এরই মধ্যে তিনি সশব্দে নাক ডাকতে শুরু করেছেন।

‘চিন্তায় কিছু নেই,’ সারা তার অতিথিদের আশ্বস্ত করলো। ‘দাদা খুব বেশিক্ষণ অনুপস্থিত থাকবেন না—খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিলে আসবেন।’

‘তাকে বরং তোমার পরামর্শ দেয়া উচিত, চব্বিশ ঘন্টার আগে যেনো ঘুম থেকে না জাগে,’ হেঁড়ে গলায় বললো গ্যারেথ। ‘মাই গড, এমন প্রাণ শক্তি নিয়ে গোটা বিশেক লোক থাকলে দুনিয়ার বাকি সব মানুষ বেকার হয়ে যেতো!’

বিশাল এলাকা জুড়ে কয়েক শো অগ্নিকুণ্ডের আলো লালচে করে তুলেছে আকাশটাকে, পাহাড়চূড়ার মাথায় ভাসছে স্নান চাঁদ।

পায়ের পাতায়। পাতাগুলোর কিনারা ক্ষতবিক্ষত। বুঝতে অসুবিধে হয় না, উঁচু-নিচু দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে আনা হয়েছে তাদেরকে, কিংবা হয়তো ঘোড়ার পিছনে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে আনা হয়েছে, ঘোড়ার সাথে সমান তালে হাঁটতে না পেরে ঘন ঘন আছাড় খেয়েছে লোকগুলো। তাদের চোখগুলো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে খোলা মঞ্চের মাঝখানে—ওখানে নারকীয় একটা দৃশ্যে অভিনয় করছে এক মেয়েলোক।

যুবতী মেয়েলোকটাকে চিনতে পারলো ভিকি, সারডি শহরের রেস্ট হাউসে রাস কুল্লাহ'র পাশে তাকে ব'সে থাকতে দেখেছে সে, গালা গোত্রপ্রধানের একজন ভালোবাসার পাত্রী-সারার ভাষায়, গাভী। এই মুহূর্তে মাটিতে ভাঁজ করা হাঁটু ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে, বিশাল দুই স্তন ঝুলে রয়েছে নিচের দিকে, নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত।

তার সূর্যমুখী ঝাঁচের মুখে ধর্মীয় আবেগ আর মোহ প্রায় পবিত্র একটা আলো ফুটিয়ে তুলেছে। পটলচেরা কালো চোখে নিষ্ঠা, ত্যাগ, একাগ্রতা আর আত্মনিবেদনের গভীর, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি। ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে, মৃদু হাঁপাচ্ছে সে। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মেয়েদের অথবা কসাইদের মতো, তার আলখাল্লার আন্তিন কনই পর্যন্ত গুটানো, কজি পর্যন্ত রক্তে ভিজে আছে হাত। একজন দক্ষ সার্জেনের মতোই বাঁকা ভগাসহ ছোরাটা বাগিয়ে ধ'রে আছে সে, ছোরার রূপালি ফলা আগুনের আভাষ লালচে আর স্নান লাগলো দেখতে।

যে জিনিসটাকে নিয়ে ব্যস্ত সে, এখন আর সেটাকে প্রাণী বলা চলে না, যদিও এখনো মোচড় খাচ্ছে সেটা, বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে বার্থ চেষ্টা করছে, নিঃশ্বাসও ফেলছে, কিন্তু বাধা দিতে বা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এখনো ফোঁপাচ্ছে সে, যদিও আওয়াজটা এখন আর মানুষের ব'লে চেনার কোনো উপায় নেই।

ছোরার কোপ আর গভীরভাবে টানা আঁচড়ে মানুষের পরিচিত আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে সে। বৃত্তের কিনারায় উপচে পড়া ভিড় থেকে জোরালো দাবি উঠলো, যেনো এক সাথে গর্জে উঠলো কয়েক হাজার হায়েনা। ব্যস্ততার ভান করে নিজের কাজে আরো মনোযোগ দিলো মেয়েলোকটা, জিনিসটার বিস্ফারিত তলপেটের গোড়া থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঘন ঘন ছোরা চালিয়ে কি যেনো একটা কেটে বের করে আনার চেষ্টা করছে সে। রক্তে ভেজা আঙুল পিচ্ছিল হয়ে আছে, মুঠো থেকে ছোরার বাঁ বারবার পিছলে বেরিয়ে যেতে চায়। খানিকটা করে কাটছে সে, টানা-হ্যাঁচড়া করছে—মৃদুপথযাত্রী ফুঁপিয়ে উঠলো আবার, তবে আওয়াজটা অস্পষ্ট। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিঁধে হ'লো মেয়েলোকটা, ছোরার ফলা দিয়ে সদ্য কেটে আনা জিনিসটা মাথার উপর তুলে ধরলো সে দর্শকদের দেখানোর জন্যে।

বৃত্তের কিনারা ধ'রে একটা চক্র দিলো সে, একটা হাত মাথার উপর, আঙুলের ভেতর সদ্য কেটে আনা জিনিসটা। চক্র দেয়ার সময় খিলখিল করে হাসলো সে, নাচতে নাচতে এগোলো, রক্তের কয়েকটা ধারা হাত বেয়ে নেমে এসে ভিজিয়ে দিলো কাঁধ আর স্তন, পাঁজরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেলো কোমরের নিচে।

‘গায়ের সাথে স্টেটে থাকো,’ নরম গলায় বললো জেক। আশ্চর্য! ওর এই গলার স্বর আগে কখনো শোনে নি ভিকি। মেয়েলোকটার ওপর থেকে সে তার আতঙ্কিত দৃষ্টি ছিঁড়ে আনলো, তাকালো জেকের দিকে।

জেকের মুখ যেনো নিষ্প্রাণ পাথুরে একটা অবয়ব। চোয়াল দুটো কঠিন, চোখ জ্বলছে।

পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলো জেক, হাতটা নামিয়ে উরুর পাশে সমান করে রাখলো। ওর হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততার কোনো ভাব পুটলো না, তবে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো প্রতিটি পদক্ষেপে, কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে দিলো সামনের বাধা প্রতিটি লোককে। জোরালো ধাক্কা খেয়ে ভিড়টা ফাঁক হয়ে গেলো, আবার জোড়া লাগার আগে সেই ফাঁক গ’লে প্রতি মুহূর্তে ওর পিছনে থাকার সুযোগ হ’লো ভিকির।

কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে ভিকির কোনো ধারণা নেই। কয়েক হাজার হিংস্র আর উত্তেজিত গালার বিরুদ্ধে একা জেক কি করতে পারবে, তাও তার অজানা। তবে এসব সমস্যা বা বিপদের কথা তার মাথায় ঢুকলেও তেমন একটা বিচলিত বোধ করলো না।

প্রতিটি গালার অচ্ছেদ্য মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে নৃত্যরত মেয়েলোকটা, এই মুহূর্তে ভূমিকম্প বা বজ্রপাতহলেও বোধহয় তাদের হুঁশ ফিরবে না, ওর উপস্থিতি কেউ টের পাবার আগেই রাস কুল্লাহ কাছে পৌঁছে গেলো জেক।

মোটা, নরম বাঁ হাতের ওপরের দিকটা ধরলো ও, তুলতুলে চর্বি আর মাংসের ভেতর ডেবে গেলো আঙুলগুলো, প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করালো তাকে, ভারসাম্য কেড়ে নিয়ে প্রায় ঝুলিয়ে রাখলো হাতের ওপর। ঘুরিয়ে নিজের দিকে মুখ ফেরালো। অপর হাতে ধরা বেরেটার মাজল ঠেকালো ওপরের ঠোঁটে, ঠিক চওড়া নাকের কদর্য ফুটোর নিচে।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, জেকের আগুন ঝরা দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেলো রাস কুল্লাহ, পরমুহূর্তে মাংসের ভেতর নখ ঢুকে পড়ার ব্যথায় গুঁড়িয়ে উঠলো, ইস্পাতের ঠাণ্ডা মাজল ঠোঁটের ওপর ঘষা খাওয়ায় ভয়ে কাঁপ ধ’রে গেলো শরীরে।

অল্প দু’চারটে অ্যামহারিক শব্দ শিখেছে জেক শ্রেণের কাছে, মনে মনে সেগুলো গুছিয়ে নিলো। ‘ইতালিয়রা,’ হিস হিস করে বললো ও, ‘আমার ভাগে।’

জেকের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাস কুল্লাহ, যেনো ওর কথা শুনতে পায়নি, তারপর একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো সে। গালাদের সবচেয়ে কাছের ভিড়টা দুলে উঠলো, যেনো বাধা দিতে আসছে।

রাস কুল্লাহ’র ঠোঁটে পিস্তলের মাজল চেপে ধ’রে ঘোরালো জেক, দাঁত আর ইস্পাতের মাঝখানে খেতলে গেলো ঠোঁট, চামড়া ছিঁড়ে মাজলটা ভেতরে ঢুকলো খানিক, রক্ত বেরিয়ে পড়লো।

‘মৃত্যু।’ একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো জেক। ভোঁতা গলায় শিষ্য যোদ্ধাদের বারণ করলো রাস কুল্লাহ। চেহারায় আক্রোশ নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেলো তারা,

আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে, হিংস্র দৃষ্টি জেকের ওপর স্থির হয়ে আছে, ওর যে-কোনো দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

রক্ত ভেজা হাত নিয়ে মেয়েলোকটা আবার তার শিকারের সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসলো, বিশাল জনসমূহে নেমে এলো প্রত্যাশায় ভরাট অটুট নিস্তব্ধতা। চারদিকে ভিড় নিরেট নিঃপ্রাণ পাঁচিল, এক চুল নড়লো না কেউ, সবাই জেক আর রাস কুল্লাহ'র দিকে তাকিয়ে আছে। জমাট নিস্তব্ধতার মাঝখানে, আগুনের পাশ থেকে ভাঙাচোরা রক্তাক্ত জিনিসটা আবার ককিয়ে উঠলো—ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলা ধরনের একটা দীর্ঘ আওয়াজ, জেকের স্নায়ুতে যেনো গরম লোহার ছাঁকা দিলো, চেহারা হয়ে উঠলো ক্ষ্যাপার মতো।

‘তোমার লোকদের বলো,’ নির্দেশ দিলো জেক, নিজের কানেই কর্কশ শোনালো।

কৈপে গেলো রাস কুল্লাহ'র গলা, যেনো একটা মেয়ে চিৎকার করলো। অর্ধনগ্ন বন্দীদের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরীরা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

রাস কুল্লাহ'র ঠোঁট থেকে মাজল তুলে নিলো জেক, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক খোঁচা দিলো নাকের ফুটোয়, দুই ফুটোর মাঝখানের নরম দেয়াল ছিঁড়ে গিয়ে দরদর করে রক্ত বেরুলো। নির্দেশটা পুনরাবৃত্তি করলো জেক। অনিচ্ছার ভাব নিয়ে প্রহরীরা বন্দী তিনজনকে ঠেলে দিলো সামনের দিকে। তিনজনই ঠক ঠক করে কাঁপছে।

‘ওর ড্যাগরটা নাও,’ শাস্ত গলায় ভিকিকে বললো জেক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাস কুল্লাহ'র চোখে স্থির হয়ে আছে।

ভয়ে ভয়ে, একটু একটু করে সরে এলো ভিকি, রাস কুল্লাহ'র পাশে থামলো। চেহারা দেখে মনে হ'লো রাস কুল্লাহ নড়ে বা ধমকে উঠলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে সে।

একটা হাত তুলে জেকের কাঁধে রাখলো ভিকি, খামচে ধরলো, শুধু এই স্পর্শ টুকুই সমস্ত আতংক দূর করে দিলো তার মন থেকে। অপর হাত দিয়ে ড্যাগারের কারুকাজ করা হাতলটা ধরলো সে, বিশাল ভুঁড়ির গা থেকে আস্তে করে টেনে নিলো সেটা। কাঠের হাতল, হাতলের মাথাটা সোনা দিয়ে মোড়া, সোনার ওপর অনেকগুলো দামী পাথর। জিনিসটা সৌখিন হলেও, ফলাটা চকচকে আর ধারালো।

‘ওদের মুক্ত করো,’ বললো জেক। ‘রশি কেটে দাও।’

জেকের পাশ থেকে সরে যেতে হ'লো ভিকিকে। বিপজ্জনক মুহূর্ত, পিস্তল ব্যারেলের ওপর চাপ বাড়িয়ে খেঁতলানো ঠোঁট থেকে আরো খানিকটা রক্ত বরালো জেক। রাস কুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে মাথাটা একপাশে ও পিছন দিকে অসম্ভব ভঙ্গিতে কাত করে, আর বুঝি এক চুল কাত হলেই ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে। দাঁত বের করে মুখ ভেঙেচে থাকার ভঙ্গিটাও যেনো স্থায়ী ও স্থির, কোটরের ভেতর চোখের মণি অনবরত ঘুরছে, মাঝেমধ্যেই সেটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় চোখ জোড়া নিষ্কলঙ্ক সাদা হয়ে উঠলো, গাল বেয়ে নেমে এলো পানির মোটা ধারা, আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে গোলাপের হলুদ পাপড়িতে জ'মে থাকা শিশিরের মতো।

বন্দীদের কজি আর কনুই থেকে রশির শক্ত বাঁধন কেটে দিলো ভিকি, হাত ডলে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলো তারা, তিনজন পরস্পরের গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে আছে। প্রত্যেকের ম্লান মুখে ক্ষতচিহ্ন, ঘাম আর শুকনো রক্ত—চেহারায় দিশেহারা ভাব, চোখে নগ্ন আতঙ্ক।

দ্রুত পায়ে জেকের পাশে ফিরে এলো ভিকি। মিথ্যে সান্ত্বনা কিনা জানা নেই, তবে জেকের গা ঘেষে থাকতে পারলে নিকেজে সম্পূর্ণ নিরাপদ ব'লে ভাবতে পারছে সে।

রাস কুল্লাহকে হাঁটতে বাধ্য করলো জেক, প্রতিটি মুহূর্ত সচেতন প্রয়াসের সাথে জেকের পাশে আঠার মতো লেগে থাকলো ভিকি। রাস কুল্লাহকে খোলা মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে যাচ্ছে জেক—অত্যন্ত ধীরগতিতে, প্রতিবার এক পা করে, প্রতি পদক্ষেপের পর কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিলো। উপচে পড়া ভিড়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে জেকের।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে আক্ষরিক অর্থেই প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে জিনিসটাকে, নরম ও নোংরা পদার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, বেদনা প্রকাশের ভাষা আর শ্রবণশক্তি কেড়ে নিয়ে মুক ও বধির বানানো হয়েছে তাকে। বেঁচে থাকার আকৃতি বা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার অক্ষমতা, কারণটা যাই হোক, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার পরও বেঁচে আছে সে—অল্পস্বল্প নড়ছে এখনো, আক্ষেপের সুর নিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

রাস কুল্লাহ'র উল্টো দিকে সামান্য ঝুঁকলো জেক, তবে ধ'রে থাকলো তাকে। ভিকি দেখলো, জেকের ঠাণ্ডা পাষণ চেহারায় করুণা আর সমবেদনার ছায়া ফুটলো মুহূর্তের জন্যে। রাস কুল্লাহ'র মুখ থেকে পিস্তল নামালো জেক, তার আগে পর্যন্ত ভিকি বোঝেনি কি করতে চাইছে ও পিস্তল ধরা হাতটা যতোটুকু পারা যায় লম্বা করলো জেক।

তীক্ষ্ণ শব্দে বিস্ফোরিত হ'লো পিস্তল। মাংসপিণ্ডের গায় শুধু মাথা আর কপালটা চেনা যায়, কপালের মাঝখানে ঢুকলো বুলেটটা। ভুরু ও গর চকচকে হাড়ের গায়ে নীলচে একটা গর্ত তৈরি হলো। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হাঁসের ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে কঁপে উঠলো চোখের পাতা, ধনুকের মতো বঁকে থাকা মাংসপিণ্ড চুপসে গেলো, শিথিল হলো। ছেঁড়া-ফাড়া গলার ভেতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুলো, অনেকটা ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকার মতো। তারপর সমস্ত যন্ত্রণার উর্ধ্বে উঠে গেলো সে।

লোকটাকে মুক্তি দিলো জেক, যদিও তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকালো না, হাতের পিস্তলটা আবার রাস কুল্লাহ'র মুখে ঠেকালো, আঙুলের চাপ বাড়িয়ে তার বাহুর মাংসে সঁধিয়ে দিলো নখগুলো, ঘুরতে বাধ্য করলো তাকে, হাতটা আরো মুচড়ে দিয়ে ধীরগতিতে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো।

সাথে সাথে পিছনের নিরেট ভিড়টা দূলে উঠলো, পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি।

বন্দীদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো জেক, সংকেত দিয়ে এগোতে বললো। সামনে থাকলো তারা, ধীর পায়ে এগোলো, আগের মতোই পরস্পরের গায়ের

সাথে সঁটে আছে। ওদের পিছনে থাকলো ভিকি, নিরাপত্তার অনুভূতিটাকে ধ'রে রাখার জন্যে একটা হাত পিছন দিকে লম্বা করা, জেকের কাঁধের ওপর। রাস কুল্লাহ'র হাত এমনভাবে মুচড়ে ধরেছে জেক যে তার গোটা শরীর কুঁকড়ে ছোটো হয়ে আছে, ইচ্ছে করলেই ভারসাম্য ফিরে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—আঙুলের চাপ আর হাতের ধাক্কা প্রয়োজনে কমিয়ে বা বাড়িয়ে তার হাঁটার গতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ও, এক পা এক পা করে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে।

জেক জানে, তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না, উচিত হবে না দুর্বলতা প্রকাশ করা। ওদের কৌশল বা শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই বলেই এখনো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না গালারা। হিংস্র হায়েনাগুলোকে দমিয়ে রেখেছে গোত্রপ্রধানের নির্দেশ, এরপর কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা, কিন্তু একবার মরিয়া হয়ে উঠলে কেউ তাদের ঠেকাতে পারবে না। পরিণতি সম্পর্কেও জানে জেক, জেনে মনেই ঝুঁকিটা নিয়েছে ও। ওদের মৃত্যু হবে মহা বিশৃংখলার ভেতর—চারদিক থেকে ধেয়ে আসবে ভিড়গুলো, লোমশ কয়েকশো হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলবে ওদের হাত-পা, চুলসহ খুলে নেবে খুলির চামড়া, আঙুল ঢুকিয়ে বের করবে চোখ, বুকে পা দিয়ে মট মট করে ভাঙবে পাজর, টেনে ছিঁড়ে নেবে জিভ।

পিছনের ভিড়টা সচল, তবে মধ্যবর্তী দূরত্ব কমলো না। এক পা এক পা করে এগোলো জেক, তাল বজায় রেখে ওর সাথে এগোলো রাস কুল্লাহ। একই ছন্দে ওর সামনে ভিকি, ভিকির সামনে বন্দীরাও হাঁটছে। খানিক পরপরই দীর্ঘদেহী গালারা ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, আঙুলের ডগা দিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করছে। প্রতিবার রাস কুল্লাহ'র নরম চামড়ায় পিস্তলের মাজলটা সজোর ঘষলো জেক। গুণ্ডিয়ে উঠলো লোকটা, অনিচ্ছার ভাব নিয়ে ফাঁক হয়ে গেলো সামনের ভিড়, কদাকার যোদ্ধারা ঠিক ততোটুকু সরে গেলো যতোটুকু ওদের এগোবার জন্যে দরকার, তারপর পিছন যারা পিছু নিলো তাদের সামনের সারিতে রয়েছে সর্দার আর মাতবররা। এতো কাছাকাছি থাকলো লোকগুলো যে হাত বাড়ালেই তারা তাদের গোত্রপ্রধানকে ছুঁতে পারবে।

কতোক্ষণ সময় লাগলো বলতে পারবে না জেক, হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলো সামনেটা ফাঁকা, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। অন্ধকারের ভেতর সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে, জেকের ইচ্ছে হ'লো ভিকি আর বন্দীদের ছুটতে বলবে, রাস কুল্লাহকে নিয়ে সে-ও পিছু নেবে ওদের। ইচ্ছেটাকে দমন করলো ও, কারণ জানে ওদের সাথে তাহলে গালারাও দৌড়-জনসমুদ্রে চাপা পড়ে যাবে ওরা। সামনে ঢাল। অন্ধকার যেখানে গাঢ়, ধ'রে নিতে হচ্ছে সেখানে কাঁটাঝোপ। কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সরু পথ।

কতোক্ষণ সময় লাগলো বলতে পারবে না জেক, হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলো সামনেটা ফাঁকা, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ওরা। অন্ধকারের ভেতর সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে, জেকের ইচ্ছে হ'লো ভিকি আর বন্দীদের ছুটতে বলবে, রাস কুল্লাহকে নিয়ে সে-ও পিছু নেবে ওদের। ইচ্ছেটাকে দমন করলো ও, কারণ জানে

ওদের সাথে তাহলে গালারাও দৌড় দেবে—জনসমুদ্রে চাপা পড়ে যাবে ওরা। সামনে ঢাল। অন্ধকার যেখানে গাড়, ধ'রে নিতে হচ্ছে সেখানে কাঁটাঝোপ। কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে সরু পথ।

‘ওদের নিয়ে কি করবো আমরা?’ রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো ভিকি। পিস্তলের মুখে এই লোকটাকে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না।

জেক জবাব দিলো না। পিছনে গা ঘেঁষে থাকা গালাদের ওপর অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর শুনতে দিতে চায় না। আবার এ-ও চায় না যে ভিকির আচরণে আতংক প্রকাশ পাক।

তবে কথাটা ভিকি মিথ্যে বলেনি, অনুসরণরত গালাদের আচরণে বেপরোয়া একটা ভাব জেকের অনুভব করতে পারছে, একঘেয়ে অনুসরণে তারা আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, প্রতিশোধপরায়ণ জনসমুদ্রে মাথাচাড়া দিচ্ছে আত্মহননের অদম্য স্পৃহা। আহ্বানের সুর সম্বলিত কয়েকটা গর্জন শোনা গেলো, পিছন থেকে সামনের সারির যোদ্ধাদের প্ররোচিত করা হলো—ছিঁড়ে ফেলো, মেরে ফেলো, পিষে ফেলো। ঝাঁপিয়ে পড়ো, উদ্ধার করো গোত্রপ্রধানকে!

‘গাড়ি!’ চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই অনুপ্রাণিত বোধ করলো জেক। ‘ওদেরকে গাড়িতে তুলবে তুমি।’

‘তারপর?’

‘এক এক করে,’ মৃদু কণ্ঠে বললো জেক। ‘আগে ওদেরকে গাড়িতে তোলো।’

কাঁটাঝোপের মাঝখান দিয়ে এখনো উঠছে ওরা, আগের চেয়ে আরো কাছে সরে এসেছে গালারা। আলখাল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন ধাক্কা দিলো ওকে, বাজিয়ে দেখলো, স্টেটে থাকলো গায়ের সাথে, চাপ বাড়ালো। জেকের গতি সাবলীল ও বিরতিহীন, ঢিল করে দিলো পেশী, সিকি পাক ঘুরলো। এমনই ক্ষিপ্ত আর বিদ্যুৎগতি যে ঘুসিটা গালা সর্দার এড়াতে পারলো না। যদি দেখতেও পেতো চারপাশে সঙ্গী-সাথীদের নিরেট ভিড়ের চাপ থাকায় সরে যাবার উপায় ছিলো না তার।

কনুই থেকে কজি পর্যন্ত হাতটাকে দা-এর মতো ব্যবহার করলো জেক, কোপ মারার ভঙ্গিতে, মুঠোয় ধরা পিস্তলটা লাগলো লোকটার মুখে, ওপরের মাড়ি থেকে নিখুঁতভাবে দাবিয়ে দিলো সামনের চারটে দাঁত, ধাক্কাটা সরাসরি সামনের সাইন্যাসগুলোর মধ্যে দিয়ে ব্রেনে গিয়ে আঘাত করলো। কোনো শব্দ না করে সাথে সাথে পড়ে গেলো লোকটা, পরমুহূর্তে অসংখ্য পায়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলো, অনুসরণরত গালারা হোঁচট খেলো, কিন্তু গ্রাহ্য করলো না। তবে আগের মতো আর ওদের গা ঘেঁষে থাকলো না তারা। পিস্তলটা আবার রাস কুল্লাহ'র মাথার পাশে ফিরিয়ে এনেছে জেক। রাস কুল্লাহ'র মোচড়ানো হাতে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো সে, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরুবার আগেই গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটে গেছে ঘটনাটা।

তার হাতটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনলো জেক, সামান্য চাপ বাড়িয়ে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করলো, নিতম্বে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে আরা দ্রুত হাঁটার নিঃশব্দ তাগাদা দিলো।

ওদের সামনে, গাড়িগুলোর কুঁজ আকৃতির মাথা দেখতে পেলো জেক, চাঁদের আলোয় ভাসছে, ছাই চাপা আগুনের গায়ে ফুটে আছে ইস্পাতের ভোঁতা কিনারাসহ কাঠামোগুলো।

‘ভিকি, রঞ্জিলকে ব্যবহার করবো আমরা। প্রিসিলা বাদ, কারণ প্রথমবারই স্টার্ট না নিলে বিপদ হবে,’ জেকের দাঁতের ফাঁক গ’লে নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো। ‘ড্রাইভারের হ্যাচ গ’লে নামতে হবে তোমাকে। আর সব কিছু ভুলে যাও, তোমার একমাত্র কাজ হইলের পিছনে বসা।’

‘কিন্তু বন্দীদের কি হবে?’

‘যা বলা হয়েছে তাই করো, প্রশ্ন করো না।’ ওদের কাছ থেকে গাড়িগুলো, আর মাত্র বিশ ফুট দূরে। ‘তাড়াতাড়ি, ভিকি, যতো তাড়াতাড়ি পারো।’

ছুটতে চাইলেও, পারলো না ভিকি, হন হন করে এগোলো। গালারা কেউ বাধা দেয়ার আগেই রঞ্জিলার সবচেয়ে উঁচু পাশটায় পৌঁছে গেলো সে, আঙ্কটা ধ’রে এক লাফে উঠে পড়লো গাড়ির মাথায়।

‘বন্ধ করো!’ চিৎকার করলো জেক, কর্কশ ধাতব আওয়াজের সাথে হ্যাচটা বন্ধ হতেই স্বস্তির পরশ অনুভব করলো ও। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ একপাল নেকড়ের মতো গর্জে উঠলো গালারা, পিলপিল করতে করতে সামনে বাড়লো তারা, পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে আগে বাড়তে চেষ্টা করলো, চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো গাড়িটাকে।

আকাশের দিকে একটা গুলি করলো জেক, সাথে সাথে কর্কশ কণ্ঠে একটা নির্দেশ দিলো রাস কুল্লাহ। সামান্য পিছিয়ে গেলো গালারা, থেকে গেলো তাদের চাপা গর্জন, চারদিকে নেমে এলো উত্তেজনায় টান টান নিস্তব্ধতা।

‘ভিকি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছে?’ ডাকলো জেক, বন্দীদের নিজের নাগালের মধ্যে আগলে রেখেছে ও, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে রঞ্জিলার দিকে।

সাড়া দিলো ভিকি, স্টীল প্লেটের পিছন থেকে তার কণ্ঠস্বর ভোঁতা শোনালো, ভেসে এলো যেমন অনেক দূর থেকে।

‘পিছনের দরজা,’ জরুরি সুরে বললো জেক, ‘খুলবে, কিন্তু আমি বলার পর।’ ধাক্কা দিয়ে বন্দীদের ঘুরিয়ে পিছনের দরজার সামনে নিয়ে আসছে ও। বন্দীরা আড়ষ্ট হয়ে আছে, নাগালের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় দেখতে পেয়ে অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ায় হোঁচট খেতে লাগলো, দিশেহারা বোধটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলো না, বোকার মতো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে এ জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকালো। ওদের পিঠে ঘন ঘন ধাক্কা দিতে হ’লো জেককে।

‘খোলো এবার!’ গলার রগ ফুলে উঠলো জেকের, মুঠো করা হাত হাতুড়ির মতো আঘাত করলো দরজার গায়ে। ভুলটা বুঝতে পেরে মুঠোর বদলে পিস্তল ঠুকলো ইস্পাতের গায়ে।

ঝনাৎ শব্দে খুলে গেলো দরজা, স্যাৎ করে ছুটে এসে বাইরে দাঁড়ানো ছোট ভিড়টার গায়ে ধাক্কা খেলো কব্বা।

‘গডড্যাম ইট!’ একটা কবাটের গায়ে কাঁধ ঠেকালো জেক, ধাক্কা দিয়ে পুরোপুরি খুললো সেটা, কবাটের আকস্মিক আঘাতে ছিটকে পড়লো একেবারে কাছে এসে পড়া দু’জন গালা। দেহভঙ্গিমার দ্রুতগতি পরিবর্তনে জেক কোনো বিরতি নিলো না, খপ করে ধরেই বন্দীদের একজনকে চুঁড়ে দিলো গাড়ির অঙ্কার গহ্বরে, বাকি দু’জন সঙ্গীকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে দেখে তাদের পিঠের ওপর বন্ধ করে দিলো দরজা, দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে গালাদের দিকে ফিরলো, শুনতে পেলো খোপে ঢুকে আটকে গেলো বোল্ট-টা।

কদাকার চেহারাগুলোয় ঘৃণা ফুটে রয়েছে, চোখে আক্রোশ আর খুনের নেশা নিয়ে হাঁসফাঁস করছে গালারা, পিঠে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপ নিয়ে সামনের সারির লোকগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে তর্জন-গর্জন শুরু হলো। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপারে, জেকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। মুখের বেশিরভাগ গ্রাস কেড়ে নেয়া হয়েছে, এই শেষ শিকারটাকে তারা পালাতে দেবে না।

নিজেকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগলো জেকের, মনে হ’লো কয়েক মাইল দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে, পাঁজরের খাঁচায় অনুভব করতে পারছে হৃৎপিণ্ডের অবিরাম গুঁতো, তবে রাস কুল্লাহকে ছাড়েনি ও, তার বাহুর নরম মাংস ছেড়ে দিলেও মুঠোর ভেতর ধ’রে রেখেছে ঘন কালো চুলের গোছা। চুলগুলো আঙুলে পেঁচিয়ে নিয়ে মাথার পিছনের খুরি চামড়ায় টান দিলো ও, বাঁকা হয়ে নিজের লোকদের দিকে ঘুরে গেলো রাস কুল্লাহ’র মুখ। অপর হাতের পিস্তলটা তুললো জেক গোত্রপ্রধানের কানে, ফুটোর ভেতর ঢুকাতে চেষ্টা করলো মাজলটা।

‘ওদের সাথে কথা বলো,’ কঠিন সুরে নির্দেশ দিলো জেক। ‘তা না হলে পিস্তলের মাজল আরেক কান দিয়ে বেরুবে।’

শব্দগুলো যদি নাও বুঝে থাকে, সুরটা বুঝলো রাস কুল্লাহ হড়বড় করে অ্যামহারিক ভাষায় কথা বললো সে, থামার আগেই সামনের সারির যোদ্ধারা এক পা পিছিয়ে গেলো। রঙ্গিলার খোলে পিঠ ঘষে, প্রতি মুহূর্তে এক ইঞ্চি করে সরলো জেক, অসহায় রাস কুল্লাহ’র চুল ধ’রে তাকে নিজের সামনে আড়াল হিসেবে রাখলো।

ওরা সরলো, ওদের সাথে ভিড়টাও সরলো, গালারা দৃষ্টি আর নাগালের মধ্যে ধ’রে রাখতে চাইছে ওদেরকে। চাঁদের আলোয় গালাদের মুখে চকচক করছে ঘাম, চেহারা নিষ্ঠুর আর ক্রোধোন্মত্ত, খুনের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ার চরম মুহূর্তে পৌঁছে ইতস্তত করছে। অঙ্কার থেকে বাঘের মতো গর্জে উঠলো একজন গালা, গমগমে কর্তৃত্বের সুর, মার মার কাট কাট ধ্বনি উঠলো ভিড়ের চারদিক থেকে—সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো রাস কুল্লাহ’র আতঁচিকার। হাঁটু দিয়ে তার কিডনিতে গুঁতো মেরেছে জেক।

আরো আশ্তে মারতে চেয়েছিল জেক, চায়নি রাস কুল্লাহ ব্যথা পেয়ে আতর্নাদ করে উঠুক। গোত্রপ্রধানের কষ্ট মাত্রা ছাড়াচ্ছে দেখলে গালারা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না।

ভিড়ের ভেতর চারদিক ঠালা-গুঁতোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। পিছনের সারিগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলতে গিয়ে ব্যর্থ হ'লো জেক, গলা শুকিয়ে গেছে। বুঝতে পারলো, আর সময় নেই।

‘ভিকি, স্টাট দিতে পারবে?’ ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জেক।

ভিকির অস্পষ্ট গলা ভেসে এলো ‘রেডি টু স্টার্ট।’

পায়ের পিছনে ক্র্যাক হ্যান্ডেলের স্পর্শ পেলো জেক, আর ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত শোরগোল ম্লান করে দিয়ে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের রক্ত হিম করা একটা আওয়াজ শোনা গেলো। চিৎকারটা শেষ দিকে লু-লুউউ-লু-লুউউ উলুধনির সুরে প্রলম্বিত হলো, হঠাৎ নেমে আসা নিস্তব্ধতার ভেতর রক্তপিপাসায় কাতর আধিভৌতিক করুণ আর্তির মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আফ্রিকান যুবকদের যুদ্ধপ্রবণ হৃদয়ে ছলকে উঠলো রক্ত, এই ব্যাকুল আহ্বান চাবুকের মতো বাড়ি মারলো উত্তেজনায় উত্তপ্ত চামড়ায়, গুড়িয়ে উঠলো জনসমুদ্র, পাল্টা জবাবে চারদিক থেকে এলো রণহংকার।

‘জেক, দেখতে চাই কি করো তুমি! ওরা আসছে!’ ভাবলো জেক, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাস কুল্লাহকে ধাক্কা দিলো, ফেলে দিলো গালাদের গায়ের ওপর। যোদ্ধাদের পাঁচ-সাতজনকে নিয়ে পড়লো রাস কুল্লাহ, তারা আছাড় খেলো পিছনের সারির গায়ে।

ইতোমধ্যে ক্র্যাক হ্যান্ডেল ধ’রে ফেলেছে জেক। এই সংকটময় মুহূর্ত উপস্থিত হবে জানতো ও, সেজন্যেই বেছে নিয়েছে নিতম্বিনীকে, জানে লৌহমানবীদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে লক্ষী। কিন্তু প্রথমবার হ্যান্ডেল ঘোরাতে নিতম্বিনীর এঞ্জিন প্রতিবাদের সুরে খক খক করে উঠলো, স্টার্ট নিলো না।

‘প্লিজ, মাই ডালিং, প্লিজ!’ মরিয়া হয়ে আবেদন জানালো জেক, দ্বিতীয়বার হ্যান্ডেল ঘোরাতেও বিষম খেলো এঞ্জিন, খকখক করলো তারপর হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে সাবলীল ছন্দে সচল থাকলো। লাফ দিয়ে গাড়ির মাথায় উঠে যাবে জেক, ওর মাথার ওপর খাড়া হ’লো একটা তলোয়ার, সবগে নেমে এলো খুলি লক্ষ্য করে।

বাতাস চিরে নেমে আসছে ফলা, আওয়াজটা শুনতে পেলো জেক, মাথাটা নামিয়ে নিলো ঝট করে। গাড়ির খোলে লাগলো তলোয়ারের ফলা, আগুনের ফুলকি ছুটলো চারদিকে। আবার তলোয়ার তুললো গালা সর্দার, মাটির ওপর পিঠ দিয়ে পড়লো জেক, বেরেটার ট্রিগার টানলো।

মাংসে বুলেট ঢোকান ভোঁতা শব্দটা শুনতে পেলো জেক, পিছন দিকে হেলে পড়লো লোটা, হাত থেকে ছুটে গিয়ে শূণ্য ডিগবাজি খেলো তলোয়ার। আলখাল্লা পরা কুৎসিত দর্শন মূর্তিগুলো ধেয়ে এলো চারদিক থেকে, চোখের পলকে ছেকে ধরলো জেক আর রঙ্গিলাকে, জনসমুদ্র খেপে গেছে।

‘ড্রাইভ, ভিকি, ফর গডস সেক, ড্রাইভ!’ আত্নাদ করে উঠলো জেক, বগলের তরা দিয়ে মুখের সামনে একটা মাথা বেরিয়ে আসছে দেখে খুলিতে ঠেকিয়ে আবার টেনে দিলো ট্রিগার। কাধে একটা হাত পড়লো, ফড়ফড় করে ছিঁড়ে নিলো শার্টটা। বগলের নিচ দিয়ে পিস্তল ধরা হাতটা পিছন দিকে লম্বা করলো জেক, আবার গুলি করলো। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে সচল হ’লো রঙ্গিলা, খোল থেকে ছিটকে পড়ে গেলো কয়েকজন গালা।

রঙ্গিলার ঝাঁকিতে জেকের হাত থেকে ছুটে গেলো পিস্তল। সে-ও ছিটকে পড়েছে। গালারা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর, সারা শরীরে তাদের নির্দয় আঁচড় অনুভব করলো জেক, শুরু হয়ে গেলো ওকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া। অন্ধকার আর ভিড়ে কিছুই দেখতে পেলো না জেক, শুধু আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলো ওর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে রঙ্গিলা। জানে শেষ চেষ্টা, অসুরের শক্তি নিয়ে ডাইভ দিলো জেক। গাড়িটা কতো দূরে পরিষ্কার ধারণা ছিলো না, খোলের সাথে ধাক্কা খেয়ে আবার ছিটকে পড়লো ও। গাড়ি আর খেঁতলানো শরীরের মাঝখানে দূরত্ব বাড়লো, জেক নিজেও জানে না কিসের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো ও, সন্দেহ হ’লো হাদের জয়েন্টগুলো খুলে গেছে কিনা। একটা আঙুল ধ’রে আছে জেক, রঙ্গিলা ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

থ্রটলে ভিকির পায়ের চাপ বাড়তেই থাকলো, সগর্জনে ছুটলো রঙ্গিলা। সামনে মানুষের নিশ্চিন্দ পাঁচিল, ধেয়ে আসা গাড়িটাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ খুব কম লোকেরই হলো। ভিকির চোখের সামনে ধপ ধপ করে পড়লো লোকগুলো, থ্যাচ থ্যাচ শব্দে বাড়ি খেলো গাড়ির সামনের প্লেটের সাথে, রণহংকারের বদলে যন্ত্রণাকাতর আত্নাদে ভারি হয়ে উঠলো বাতাস। অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, গালারা যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। ভিড়ের শেষ মাথা ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় বেরিড়ে এলো আর্মারড কার, সামনের ঢালে পড়ে আরা দ্রুত হ’লো গতি।

প্রথম কয়েক সেকেন্ড জেককে টেনে এনেছে রঙ্গিলা, তারপর আঙুল ছেড়ে দিয়েছে জেক, গাড়ির পিছু পিছু দৌড়ে এক লাফে উঠে পড়েছে খোলের মাথায়। টারিটে হেলান দিয়ে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে ও, দেখতে না পেলোও শব্দ শুনে বুঝতে পারলো বিপদ এখনো কাটেনি।

গাড়ির কিনারা ধ’রে ঝুলে রয়েছে অনেকে, জেক ঘাড় ফেরাতেই সবচেয়ে কাছের লোকটা রণহংকার ছাড়লো, বাতাসে তার আলখাল্লা ফুলে উঠেছে, প্রায় ঢেকে দিয়েছে মাথাটা। খোলের কিনারা দু’হাতে ধ’রে উঠে আসছে সে, ছোরার হাতলটা দু’সারি দাঁতের মাঝখানে। তাকে আরো খানিক উঠতে দিলো জেক, কিনারা ছাড়িয়ে কাঁধ দুটো উঁচু হতেই দুই পা এক করে বুকের মাঝখানে লাথি মারলো, শূন্যে সিধে হ’লো লোকটা, পিছন দিকে কাত হয়ে মাটিতে পড়লো মাথা দিয়ে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভয়াব্র আত্নাদের শব্দ থেমে গেলো।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো জেক, গাড়ির মাথা অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে। হাত আর পা দিয়ে প্রতিবার একজন করে গালাকে কিনারা থেকে ফেলে দিলো ও। ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামছে রঙ্গিলা, ফুল থ্রটল দিয়ে রেখেছে ভিকি, অবিশ্বাস্য দক্ষতার সাথে ঝোপ আর গাছগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে সে। অবশেষে ঢাল থেকে নেমে এসে খোলা প্রান্তরে পৌঁছলে আর্মারড কার।

হ্যাচ কাভারে দমাদম ঘুসি মেরে ভিকির দৃষ্টি আকর্ষণ করলো জেক, ধীরে ধীরে গতি কমালো সে, তারপর মৃদু একটা ঝাঁকির সাথে দাঁড়িয়ে পড়লো রঙ্গিলা।

হ্যাচ খুলে উঠে এলো ভিকি, দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো জেকের গলা। আলিঙ্গনটা এড়ানোর কোনো চেষ্টা করলো না জেক, নিঃশ্বাসের শব্দ বাধ সাধতে চাইলেও উপভোগ্য নিস্তর্রতা নেমে এলো দু'জনের মাঝখানে। আনন্দঘন মুহূর্তে বন্দীদের কথা মনে ছিলো না, রঙ্গিলার পেটের ভেতর তাদের কাশি আর নড়াচড়ার শব্দ প্রায় চমকে দিলো ওদেরকে।

ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হ'লো ভিকি, চাঁদের আলো লেগে তার চোখ কোমল লোভে চকচক করে উঠলো।

'বেচারারা তোমার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে,' ফিসফিস করে বললো ভিকি। 'ওদেরকে তুমি নরক থেকে তুলে এনেছো—' দেরি করে পৌঁছানোর ওদের একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি, কথাটা মনে পড়তেই ভাষা হারিয়ে ফেললো সে।

'তা তো বুঝলাম,' বললো জেক। 'কিন্তু এখন ওদেরকে নিয়ে কি করা হবে বলতে পারো?'

'হারারি ক্যাম্পে নিয়ে যাই চলো, রাস গোলাম নিশ্চয়ই ন্যায্য একটা ব্যবস্থা করবেন।'।

'উই,' মাথা নাড়লো জেক। 'আমার তা মনে হয় না। সবাই ওরা ইথিওপিয়ান আদিবাসী, ওদের নিয়ম-কানুন আমাদের মতো নয়। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত—এটাই এখানকার রীতি, এক অর্থে ন্যায্যও বটে। ইতালিয়রা রাস গোলামকে জ্বালিয়ে মারছে, তাদের সামরিক উপদেষ্টাদের সাথে তিনি সদর ব্যবহার করবেন এটা আশা করা যায় না। ভেবে দেখো, বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে লোকগুলোকে সিংহের মুখে ঠেলে দিতে চাও কিনা।'।

'ওহ্ গড, তার মানে আসলে আমরা বন্দীদের এখনো উদ্ধার করতে পারি নি?'

'তাছাড়া,' বললো জেক, 'সমস্যা আরো একটা আছে। বন্দীদের রাস গোলামের হাতে তুলে দিলে কাল সকালেই রাস কুল্লাহ এসে ফেরত চাইবে ওদের। রাস গোলাম ফেরত দিতে রাজি না হলে একটা ট্রাইবাল যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। উই, এ ঝুঁকি নেয়া চলে না।'।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে ভিকি বললো, 'তাহলে একটাই উপায়। ওদেরকে ছেড়ে দাও, যেখানে খুশি চলে যাক ওরা।'।

'যেখানে খুশি বলতে তুমি বোঝাতে চাইছো ওয়েলস অভ চান্ডি,' পূর্ব দিকে তাকালো জেক, চাঁদের আলোয় ধু-ধু প্রান্তর নির্জন আর ফাঁকা। 'দেখা না গেলেও,

গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ইথিওপিয়ান স্কাউটরা। এক মাইলও যেতে পারবে না, তার আগেই জবাই হয়ে যাবে বন্দীরা।’

‘ওদেরকে আমাদেরই পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে তাহলে,’ বললো ভিকি।

ঝট করে তার দিকে ফিরলো জেক। ‘পৌঁছে দিতে হবে?’

‘গাড়িতে করে, ওয়েলস অভ চান্ডিতে।’

‘ইতালিয়দেররা আনন্দে বগল বাজারে,’ হাসি মুখে বললো জেক। ‘ওদের কামানের কথা ভুলে গেছো দেখছি!’

‘যুদ্ধবিরতি ঘোষণার জন্যে সাদা পতাকা উড়বে গাড়ির মাথায়,’ বুদ্ধি দিলো ভিকি।

‘এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, জেক। সত্যি নেই।’

ঝাড়া এক মিনিট প্রস্তাবটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলো জেক। ‘অনেক দূরের পথ, ভিকি। চলো তাহলে, দেরি করে লাভ নেই।’

হেডলাইট না জ্বেলে গাড়ি চালালো ওরা, ইতালিয়দের বা আদিবাসী স্কাউটদের যতোটা সম্ভব অন্ধকারে রাখতে চায় জেক। তবে চাঁদ যথেষ্ট উজ্জ্বল, সামনের পথ চিনতে বা শুকনো গভীর নালাটাকে এড়িয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হ’লো না। অবশ্য মাঝে-মাঝেই ছোটো কিন্তু গভীর গর্তে পড়ে ঝাঁকি খেলো রঞ্জিল, নাকের সামনে দিয়ে হঠাৎ সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠা শিয়াল বা নেকড়ে ছুটে পালালো।

অর্ধনগ্ন বন্দীরা গাড়ির পিছনের কমপার্টমেন্টে কাত হয়ে পড়ে আছে, সারাদিনের তুমুল যুদ্ধ আর ভয়ে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তাদের, পরস্পরে গায়ে ঢলে পড়েছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এতোই গভীর সে ঘুম, এঞ্জিনের বিকট আওয়াজ বা ঘোর অনবরত ঝাঁকিও ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারলো না। আগোছাল একটা স্থূপের মতো পড়ে থাকলো তারা।

শীত শীত করায় ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে টারিট থেকে নেমে এলো ভিকি, ড্রাইভিং সিটে জেকের পাশে ছোট্ট জায়গাটুকু দখল করলো। কিছূক্ষণ শান্ত গলায় জেকের সাথে কথা বললো সে, তারপর তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এলো, থেমে গেলো এক সময়। এক পাশে ঢলে পড়লো সে, একটু হেসে তার সোনালি মাথাটা নিজের কাঁধে ঠিকমতো বসিয়ে নিলো জেক, তার পিঠ আর কোমরে হাত পেঁচিয়ে ধরে রাখলো, যাতে পিছরে পড়ে না যায়। গায়ের আঁচ পেয়ে আরো কাছে সরে এলো ভিকি। পূর্ব আকাশে চোখ রেখে একমনে গাড়ি চালালো জেক।

ইতালিয়দের সেন্দ্রিরা তাদের ক্যাম্পের সীমানার ওপর নিয়মিত বিরতিসহ এক জোড়া শক্তিশালী অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট সার্চলাইটের আলো ফেলেছে, তাদের সন্দেহ রাতের অন্ধকারে আদিবাসীরা হামলা করতে পারে। মরু আকাশের গায়ে সাদা আলোর লম্বা এক জোড়া টানেল ছুটে গেলো একদিক থেকে আরেক দিকে। আলোটোর দিকে লক্ষ্য রেখে এগোলো জেক, দূরত্ব কমে আসার সাথে সাথে গাড়ির গতি মন্তর করলো। জানে নিস্তব্ধতার ভেতর বহু মাইল দূর থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাবে, তবে এঞ্জিনে গর্জন কম হলে দূর থেকে ধরা যাবে না ঠিক কোনদিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

এক সময় জেক আন্দাজ করলো ইতালিয়দের ক্যাম্প আর দুই কি তিন মাইল সামনে। ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করে অন্ধকার আকাশটাকে চিরে হাজার ফুট ওপরে উঠলো একটা স্টার শেল, বিস্ফোরিত হ'লো চোখ ধাঁধানো সাদা-নীল আলো, বহু মাইর জুড়ে নিচের মরুভূমিটাকে একটা মঞ্চের মতো আলোকিত করে তুললো। অকস্মাৎ ব্রেক করে রঙ্গিলাকে দাঁড় করালো জেক, শেলটা ধীরে ধীরে মাটিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। আলোর ভেতর নড়াচড়া করলেই আর্মারড কারের উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে ইতালিয়রা।

নিভে গেলো স্টার শেলের আলো, অন্ধকার যেনো আরো গাঢ় হয়ে ফিলে এলো। ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে ভিকির, ঢুলুঢুলু চোখে জেকের দিকে তাকালো সে, কপালে হাত তুলে চুল সরালো।

‘কি হলো, জেক?’

‘পৌঁছে গেছি,’ বললো জেক, পরমুহূর্তে আরেকটা স্টার শেল উঠলো আকাশে, তার উজ্জ্বর আলোয় স্নান হয়ে গেলো চাঁদটা।

‘ওদিকে,’ ব'লে একটা হাত তুলে ভিকিকে দেখালো জেক, ওয়েলস অভ চান্ডির ওপরে পাহাড়শ্রেণীর কিনারা পরিষ্কারই দেখা গেলো। সাজানো অনেকগুলো সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইতালিয়দের ট্রাক বহর, স্টার শেলের আলোয় প্রতিটি কার্ঠামো স্পস্ট, মাইল দুয়েক দূরে। আচমকা মেশিনগানের একটানা আওয়াজ ভেসে এলো, ছায়া লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করছে সেন্টিরা। মেশিনগানের আওয়াজ থামার সাথে সাথে গর্জে উঠলো কয়েকটা রাইফেল।

‘মনে হচ্ছে সবাই ওরা জেগে আছে, অত্যন্ত নার্ভাস,’ চিন্তিত গলায় মন্তব্য করলো জেক। ‘আর সামনে যাওয়া উচিত হবে না।’

ক্রল করে ড্রাইভারের সিট থেকে নামলো ও, গাড়ির পিছনে চলে এলো। তিনজন বন্দী জড়াজড়ি করে রয়েছে, ঘুমন্ত পুতুলের মতো। একজন এমন বিকট শব্দে নাক ডাকছে, ফিক যেনো হাঁপানি রোগাক্রান্ত একটা সিংহ। গায়ে ধাক্কা দিয়ে তিনজনকেই জাগালো ও। কোথায় রয়েছে, কি ঘটেছে ইত্যাদি স্মরণ করতে বেশ খানিক সময় নিলো তারা। ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে অন্ধকার প্রান্তরে বের করে আনলো জেক।

ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করতে লাগলো বন্দীরা, সন্ত্রস্ত, নিজেদের চারদিকে বোকার মতো তাকালো। এই সময় আবার একটা স্টার শেল বিস্ফোরিত হ'লো সরাসরি মাথার ওপর, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো লোকগুলো। এই সময় একপাল মুরগীর মতোই কাছের একটা রিজের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো জেক, ওদের।

শেষমেষ ঘাড়ের কাছের জামা আঁকড়ে ধ'রে একজনকে টেনে সামনে নিয়ে গেলো জেক, আঙ্গুল তুলে সামনেটা দেখিয়ে ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেললো। স্টার শেলের আলোয় নিজের ক্যাম্প চিনতে পারলো লোকটা, বিশাল ফিয়াট ট্রাকগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। উল্লাসের চিৎকার দিয়ে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লো সৈনিক।

অন্য দুজন কিছু সময় নিলো ধাতস্ত হ'তে। এরপর তারাও দৌড়ে রওনা হ'লো। বিশ গজ এগোনোর পর একজন ফিরে এসে জেকের হাত ধ'রে ঝাঁকিয়ে দিলো, ভঙ্গিটা ধন্যবাদসূচক, এরপর চওড়া হাসলো ইতালিয়ান সৈনিক। ভিকির দিকে ফিরে ওর হাত চুমোতে ভিজিয়ে দিলো। কাঁদছে লোকটা, দুই গাল বেয়ে নামছে জলের ধারা।

‘যথেষ্ট হয়েছে,’ গর্জে উঠলো জেক। ‘যাও, ভাগো!’ হাত তুলে আবারো সামনেটা দেখিয়ে দিলো ও।

বন্দি সৈনিকদের মুক্তি প্রাপ্তির আনন্দ যেনো জেক আর ভিকিকেও নাড়া দিয়ে গেছে। অন্ধকারে মুখে হাসি নিয়ে গাড়িতে ফিরলো ওরা। সারডির উদ্দেশ্যে ফিরতি পথের চল্লিশ মাইলের অর্ধেকটা পেরিয়ে এলো, পুব আকাশের বুকে এখন ইতালিয়ান ক্যাম্পের লক্ষণ বলতে কালো রাতের বাতাসে সামান্য আলোর আভা। হঠাৎ মৃদু হেসে, ঠোঁট নামিয়ে জেকের গলার নরম জায়গাটাতে চুমো খেলো ভিকি।

যেনো নিজের ইচ্ছেতেই, মুক্ত খোলা প্রান্তরের নরম বালুর উপর ধীর হয়ে এলো রঙ্গিলার গতিবেগ। থেমে দাঁড়ালো গাড়িটা।

ম্যাগনিটো বন্ধ করে দিলো জেক, ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো এঞ্জিনের আওয়াজ। চারদিকে এখন শুধুই নিস্তব্ধতা। ভিকির দিকে ফিরে দুই হাতের ভেতরে নিয়ে এলো জেক ওকে। এতো জোরে—ব্যথায় শ্বাস আটকে এলো মেয়েটার।

‘জেক!’ আধো প্রতিবাদ, আধো অনুরোধ ধ্বনিত হ'লো ভিকির কণ্ঠে। তার ঠোঁট ব্যগ্র ভঙ্গিতে খুঁজে নিলো জেকের ওষ্ঠ, পুরুষালী স্বাদ নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে।

নতুন গজানো দাড়িতে কর্কশ হয়ে আছে জেকের গাল, বুক খোলা শার্টের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা চুলগুলোর মতোই গাঢ় রঙের। ভিকির নরম শরীরের চড়াই-উতরাই গুলো যেনো জেকের শক্ত কাঠামোতে মিশে গেলো, সামনে ঝুঁকে আরো শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরলো ভিকি। কর্কশ গালের ছোঁয়া ব্যথা নয়, অপার্থিব আনন্দ দিচ্ছে ওকে।

ভিকি জানে, কামনার আগুন জ্বলেছে ওর শরীরে, আর কিছুক্ষণ পর ওদের দুজনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে যাবে সেটা। চিন্তাটা আরো বেপরোয়া করে তুললো তাকে। ওকে আমি ভালোবাসায় পাগল করে তুলতে পারি— এই ভাবনায় আরো উত্তেজিত হ'লো ভিকি, ইচ্ছে হ'লো এখনই সেটা পরখ করে দেখে।

কানে জেকের প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনছে ভিকি, কিছুক্ষণ পর টের পেলো, ওটা তার নিজের শ্বাসের শব্দ। প্রতিটি পালসের সাথে সাথে বুকের ভেতর থেকে দপদপিয়ে উঠছে যেনো প্রচন্ড একটা ব্যাথা।

আর্মারড কারের চালকের প্রকোষ্ঠে স্থান খুবই কম। ওদের জরুরি, অস্থির নড়াচড়াগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে আরো অস্থির হয়ে উঠছে। মনের গভীরে কোথায় যেনো বিবেকের দংশন অনুভব করলো ভিকি, এমন উন্মাদনা সে এর আগে কখনো দেখেনি। এক মুহূর্তের জন্যে গ্যারেথ সোয়েলসের চৌকষ, ভদ্রোচিত, আনুষ্ঠানিক আচরণের কথা মনে পড়লো তার; এই উন্মত্ত আবেগের সঙ্গে তুলনা করলো সেই মার্জিত শারীরিক তৃপ্তির, তারপর সব মুছে গেলো মন থেকে।

গাড়ির বাইরে, মরুর রাতের হিম হাওয়া ভিকির নগ্ন পিঠ আর উরুতে কামড় বসালো। হাতের ছোটো ছোটো সোনালি রোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। বেডরোল খুলে বালির উপর বিছিয়ে দিয়েছে জেক। এরপর যখন ভিকির কাছে ফিরে এলো সে, তার গায়ের উত্তাপ একটা শক্-এর মতো লাগলো ভিকির কাছে। আত্মার গভীরের কিছু যেনো পুড়ে যেতে লাগলো সেই উত্তাপে, নিমিষে তাতে গা ভাসিয়ে দিলো ভিকি। জেকের কামনা তগু দেহ, আর মরুর হিম শীতল হাওয়া বড়ো আরাধ্য বৈপরীত্য হয়ে সুখ দিলো ওকে।

এখন ইচ্ছেমতো নড়াচড়া করতে পারছে ভিকি, ওর ঠান্ডা হাত দুটোর ছোঁয়ায় জেকের নগ্ন শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। কর্কশ, রুদ্ধ স্বরে হাসলো ভিকি।

‘হ্যাঁ, আমি চাই,’ বলে আবারো হাসলো সে, সহজেই ওকে দুই হাতে কোলে তুলে বেড রোলে শুয়ে, নিজের বুকের উপর বসিয়ে দিলো জেক।

‘তাড়াতাড়ি, জেক,’ শেষ প্রতিরোধটুকুও চ’লে গেছে ভিকির মন থেকে। ‘তাড়াতাড়ি, ডার্লিং।’

ভিকির সমস্ত অনুভূতি যেনো চিৎকার করছে। ব্যাথাভুর, ভীষণ এক দ্বৈতযুদ্ধ শুরু হ’লো যেনো ওদের মধ্যে। একসময় থামলো ওটা। মরুর বিপুল বিস্তৃতির নিচে বাতাসের হিসহিস গর্জন ভয় পাইয়ে দিলো ভিকিকে, ছোট্ট বাচ্চাদের মতো জেকের শরীর আঁকড়ে ধ’রে থাকলো সে। দুই চোখে পানি, গালে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে তার হিমশীতল স্পর্শ।

কাঁদছে ভিকি—নিজেও জানে না কেনো।

মারিব নদীর ওপাড়ে, ইথিওপিয়ার প্রথম সতর্ক আক্রমণের ফলাফলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জেনারেল ডি বোনো।

রাস মুণ্ডলেতু—উত্তরাঞ্চলের ইথিওপিয় নেতা খুব কমই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে—নিজের চল্লিশ হাজার লোক নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়-ঘেরা এলাকা, আম্বা আরাদাম-এ ঢুকে গেছে সে। বাধা না পেয়ে সাত মাইল সামনের আদোয়া দখল করে নিয়েছেন ডি বোনো। সাথে সাথেই ইতালির নিহত সৈনিকদের সম্মানে ভাস্কর্য গড়লেন তিনি। ইতালিয়দের পূর্ববর্তী পরাজয়ের লজ্জা ঢেকে গেলো এতে করে।

সভ্যতা বিস্তারের অভিযান শুরু হয়েছে। থামিয়ে দেওয়া গেছে জংলীদের। আকাশ থেকে বোমা ফেলা শুরু হয়ে গেছে।

ভীষণ উঁচু পাথুরে প্রদেশের উপর থেকে বোমা ফেলা শুরু করেছে রয়াল ইতালিয়ান এয়ারফোর্স। গোত্র প্রধানদের নেতৃত্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবিন্যস্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে ইথিওপিয় অধিবাসীরা। তাদের প্রতিরোধ রেখা বরাবর একশ একটা ফাটল—সহজেই আক্রমণে গেলেন জেনারেল ডি বোনো, সেই মাকালে’ পর্যন্ত

দখলে নিয়ে আসলেন। এইখানে এসেই নিজের অর্জনে স্তম্ভিত ডি বোনো, বিশ্রামে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাস মুণ্ডলেতু তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে আম্বা আরাদামের উপরে লড়াই করছে, ওদিকে রাস কাসা এবং রাস সিউম নিজেদের বিশাল সেনাবহর নিয়ে পর্বতের পাস পেরিয়ে লেক টানা'য় সম্রাটের বাহিনীর সাথে যোগ দিতে গলধকর্ম হ'লো।

এরা অসহায়, অবিন্যস্ত যোদ্ধার কাফেলা, গম কাটার মতো করে এদের গলা কাটা যায়—চোখ বন্ধ করে চিন্তাটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন ডি বোনো।

ইতিহাস তাকে রক্তপিপাসু জেনারেল হিসেবে মনে রাখুক, এটা তিনি চান না।

‘মাকালে’-তে অবস্থিত ইতালীয় অভিযানের কমান্ডার, জেনারেল ডি বোনোর তরফ থেকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী, বেনিটো মুসোলিনির প্রতি। আদোয়া এবং মাকালে দখলের পর, আমার ধারণা, প্রথম উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে। শত্রুর প্রতি-আক্রমণের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান এখানে সুদৃঢ় করতে হবে। সাপ্লাই এবং যোগাযোগ প্রয়োজন।”

‘ইতালির প্রধানমন্ত্রী, চলমান যুদ্ধের নেতা, বেনিটো মুসোলিনির তরফ থেকে আফ্রিকার ইতালীয় অভিযানের সেনাপতি, জেনারেল ডি বোনোর প্রতি। হিজ ম্যাজিস্টার ইচ্ছেমতো আমি আপনাকে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যাতিরেকে আমবা কারাদাম আক্রমণের নির্দেশ দিচ্ছি। বার্তা পাওয়া মাত্র যোগাযোগ করুন।”

‘ইতালির অভিযানের কমান্ডার, জেনারেল ডি বোনোর তরফ থেকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী, বেনিটো মুসোলিনির প্রতি—আমার অভিবাদন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে অবগত করতে চাই যে, কৌশলগত বিচারে আমবা আরাদাম অত্যন্ত কঠিন এলাকা... ওই অঞ্চলের ভূখন্ড অ্যামবুশের জন্যে আদর্শ স্থান... রাস্তা-ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ... আমার বিচারের প্রতি আস্থা রাখুন... হিজ এক্সিলেন্সিকে আপনি বোঝান, এখানে সামরিক অবস্থান অত্যন্ত জরুরি, যে কোনো রাজনৈতিক সুবিধার চেয়ে সামরিক ভাব-মূর্তি বেশি মনোযোগ পাবার দাবি রাখে।”

“বেনিটো মুসোলিনির তরফ থেকে আফ্রিকা অভিযানের প্রাক্তন সেনাপতি, মার্শাল ডি বোনো'র প্রতি। হিজ ম্যাজিস্টার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেনো

আপনাকে জানাই সেনাবাহিনীর মার্শাল পদে আপনাকে উন্নিত করা হয়েছে এবং আদোয়া দখলের অভিযানে আপনার সুনিপুণ দক্ষতার জন্যে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। এর ফলে পূর্ব আফ্রিকায় আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। একজন সৈনিক এবং সেনাপতি হিসেবে আপনার দায়িত্ববোধ এবং অবদানের জন্যে পুরো জাতি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, শীঘ্রই আফ্রিকায় পৌছনো জেনারেল পিয়েত্রো বাদোগ্লিও-এর কাছে নেতৃত্ব হস্তান্তর করুন।”

নিজের পদোন্নতি এবং দেশে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটা শান্তভাবেই গ্রহণ করলেন মার্শাল ডি বোনো। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইতালি ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন তিনি।

জেনারেল পিয়েত্রো বাদোগ্লিও কঠিন-কঠোর লড়িয়ে। তার যুদ্ধকৌশল হলো, যতো দ্রুত সম্ভব যে কোনো অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে পিষে ফেলা।

রাগে গড়গড়, অধৈর্য্য অবস্থায় মাসাওয়া পৌছলেন তিনি, যা কিছু দেখছেন, তাতেই রাগ চড়ে যাচ্ছে। তার পূর্বসূরীর কৌশলের প্রতিও ভীষণ বিরক্ত জেনারেল। যদিও, এরচেয়ে ভালো অবস্থান রেখে যাওয়া সম্ভব ছিলো না কারো পক্ষে।

বিশাল, দারুনভাবে সজ্জিত অনুপ্রাণিত একদল সৈনিক পেয়েছেন তিনি, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানে। অত্যন্ত চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা তো আছেই।

ছোট্ট কিন্তু চমৎকার রকম সুসজ্জিত এয়ারফোর্স অবাধে আম্বা আরাদামের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে, যে কেনো ইথিওপিয় সংঘবদ্ধ আক্রমণ প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। নতুন হেডকোয়ার্টারে এক ডিনারে, লেফটেন্যান্ট ভিটোরিয়ো মুসোলিনি, এল ডুসে'র কনিষ্ঠ পুত্র তিনি, দক্ষ পাইলট, শত্রু হাইল্যান্ডের উপর দিয়ে নিজের সি-ইন-সি বিমান নিয়ে উড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতার বয়ান করছিলেন। নতুন এই যুদ্ধবিমান এবং পাইলট প্রাপ্তির সংবাদে আন্দোলিত হলেন বাদোগ্লিও। আকাশ থেকে ফেলা বোমার ভয়াবহতার কথা শুনে ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। বিশেষত, তিনশো বা তার অধিক ঘোড়সওয়ার, যারা লম্বা কালো আলখাল্লা পরা একজনের নেতৃত্বে চলছিলো, তাদের উপর হামলার কথা শুনে আমোদ পেলেন তিনি।

‘একশ মিটারের কম উচ্চতা থেকে একশ কিলো বোমা ফেলে দিয়েছিলাম আমি,’ তরুণ মুসোলিনি ব'লে চ'লে, ‘ঠিক মাঝখানের ছুঁতন্ত ঘোড়সওয়ারের উপর পরলো ওটা। ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে পরে ওরা, কালো আলখাল্লা পরা নেতা এতো উপরে নিক্ষিপ্ত হলো, আমি তো ভেবেছিলাম, আমার ডানা না ছোঁয়! অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য।’

নিজের বাহিনীতে এহেন রক্ত-গরম তরুণ পেয়ে যার-পর-নাই আনন্দিত হলেন বাদোগ্লিও। নিজের পাশে বসা এয়ারফোর্স কর্নেলের দিকে তাকলেন তিনি।

‘কর্নেল, বিমান বাহিনীতে আপনার তরুণ যোদ্ধাদের কি মত? আমরা কি নাইট্রোজেন মাস্টার্ড ব্যবহার করতে পারি?’

‘সবার পক্ষ থেকে বলছি, ‘ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন কর্নেল, ‘উত্তরটা হলো— হ্যাঁ। আমাদের সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত।’

নড় করলেন বাদোগ্লিও। নিজের ধারণার সাথে মিলে গেছে ব্যাপারটা। কাজেই, পরদিন সকালে মাসাওয়ার ওয়ারহাউস থেকে মাস্টার্ড গ্যাস নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন তিনি। ডি বোনো ওগুলো ব্যবহার করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। হাজার হাজার ইথিওপিয় অধিবাসী পরবর্তীতে এই জ্বালাময় কুয়াশা বা ধোঁয়াশার নির্যাতন ভোগ করেছে। সমগ্র ইউরোপের আর কোনো সেনাবাহিনী এটা ব্যবহার করার সাহস দেখায় নি। খালি পায়ে চলাচল করা ইথিওপিয় আদিবাসীরা এমন শত্রুর বিরুদ্ধে অসহায়, যা আকাশ থেকে পরে জীবন্ত শরীরের চামড়া-মাংস খুবলে নিয়ে আসে।

ডি বোনের বদলে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেলের বহু সিদ্ধান্তের মধ্যে এটি একটি। ডি বোনের রণকৌশল ছিলো ন্যায্য যুদ্ধ, নির্দয় অনুপ্রবেশ নয়, আর এ হ’লো সম্পূর্ণ যুদ্ধ—যা কিছু দিয়ে সম্ভব।

একটা শিকারী বাজ প্রয়োজন ছিলো মুসোলিনির। সঠিক লোককেই নির্বাচন করেছিলো সে।

আসমারায়, উঁচু দোতলা অফিস ভবনে দাঁড়িয়ে এখন সেই শিকারী বাজ। রাগের কারণে চওড়া ডেস্কে বসতে পারছেন না তিনি, ভারী পদক্ষেপে পায়চারী করছেন অনবরত। দেখে বোঝার উপায় নেই, পঁয়ষট্টি পেরিয়েছেন।

মুষ্টিযোদ্ধার কাঁধ, চিবুক সামনে ঠেলে দেওয়া—বড়ো, বেচপ নাকের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে ভারী চিবুক, খাটো করে ছাটা বাদামী গৌফ, চওড়া শক্ত মুখ তার।

কোটরের গভীরে ঢোকা চোখ, সারক্ষণ জ্বলছে, নিজের সামনের তালিকার আঞ্চলিক এবং রেজিমেন্টার কমান্ডারদের কেবল একটা যোগ্যতাই বিচার করছেন, ‘সে কি লড়তে পারে?’

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরটা হ’লো ‘না’, সবশেষে নির্দয় লড়িয়ে একজনকে মনে ধরলো তারা।

‘হ্যাঁ,’ উৎসাহের সাথে মাথা ঝাঁকালেন বাদোগ্লিও, ‘এই একমাত্র ফিল্ড কমান্ডার, যে কিছু একটা করে দেখিয়েছে।’ একটু থেমে, রিডিং গ্লাসটা চোখে লাগিয়ে হাতের রিপোর্টে চোখ বোলালেন বাদোগ্লিও। ‘একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ অন্তত লড়েছে সে, প্রায় ত্রিশ হাজার শত্রু ক্ষতম করেছে, নিজের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই। এই অর্জনের কথা কেউ জানেই না। একটা না একটা খেতাব পাবার যোগ্যতা তার অবশ্যই আছে। যোগ্য লোকদের পুরস্কার পাওয়া দরকার। কী চেহার—একেবারে যোগ্য নেতা। যখন প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য পাবে, এই লোক কি না করতে পারে। শুধু যদি তার আর্টিলারি কমান্ডার মেজর ব্যাটা আরো দক্ষ হ’তো, এই লোক পুরো শত্রু আর্মার কলাম শেষ করে দিতে সক্ষম হ’তো। আর্টিলারি আগেভাগে ফায়ার ওপেন করেছে, এতো আর তার দোষ নয়।’

চকচকে ফটোগ্রাফিক প্রিন্টের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো জেনারেল বাদোগ্লিও। সিংহ বধের উল্লাস নিয়ে গর্বিত শিকারীর মতো আর্মারড কার হেনরিয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট আলদো বেলিনি। হেনরিয়েটার খোল ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে, পিছনে পড়ে রয়েছে আদিবাসী যোদ্ধাদের লাশ, রক্তে লাল হয়ে আছে তাদের শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা। জেনারেল বাদোগ্লিওর জানা নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা লাশগুলো চাতুর্যের সাথে সংগ্রহ করা হয়েছে, পরবর্তীতে জিনো ওগুলোর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

কর্নেল বেলিনি নিজের কৃতিত্ব ছবির সাহায্যে রেকর্ড করে রাখতে চাইলেও, এক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। ক্যামেরাম্যান সার্জেন্ট জিনো বারবার পোজ দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেও, মধ্যমাঠে গিয়ে হেনরিয়েটার পাশে দাঁড়াতে রাজি হয় নি সে। অবশেষে মেজর ক্যাস্তেলানি রিপোর্ট দিলো, শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে পালিয়েছে। অফিসিয়ার রিপোর্ট হিসেবে অবশ্য ছবিগুলো চমৎকার প্রমাণ, কাউন্টের বীরত্বের।

এখন, বুড়ো সিংহের মতো গর্জে উঠলো বাদোগ্লিও, ‘জুনিয়র অফিসারদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও, এই লোক অর্ধেক শত্রু আর্মার ধ্বংস করে দিয়েছে।’ রিডিং গ্রাস দিয়ে রিপোর্টের গায়ে আঘাত করলো সে। ‘এ লোক আগুন-থেকো। কোনো সন্দেহ নেই, দেখামাত্র চিনি আমি এদের। এ ধরনের লোকদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত। রেডিও করে শীঘ্রি হেডকোয়ার্টারে এসে আমার সাথে দেখা করতে বলা হোক একে।’

কাউন্ট আলদোর জন্যে ক্রমেই যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছে সামরিক অভিযান। ওয়েলস অব চান্ডির ক্যাম্প এখন অন্য চেহারা পেয়েছে তার এঞ্জিনিয়ারদের বদৌলতে। আরাম-আয়েশের সমস্ত উপকরণ, এমনকি বরফ তৈরির মেশিন, সুয়েরেজ ব্যবস্থা সবকিছুই একে একে নতুন রূপ দিয়েছে সেনা ক্যাম্পটাকে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অত্যন্ত জোরদার, ক্যাস্তেলানি তার সুনিপুণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে কাঁটাতারের বেড়া হ’তে আগুন-বৃন্ত—সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

আশেপাশের মরু থেকে কুয়ার পানির কারণে প্রচুর বন্য-প্রাণী আসে এখানে। কাজেই শিকারের কোনো অভাব নেই কাউন্টের জন্যে। সবমিলিয়ে দারুন আয়েশে দিন যাপন করছিলো কাউন্ট বেলিনি। হেড কোয়ার্টার থেকে তলব অনেকটা ১০০ কিলো বোমার মতো আঘাত করলো তাকে। জেনারেল বাদোগ্লিও-এর মেজাজের কথা কারো অজানা নয়। অত্যন্ত নির্দয় স্বভাবের ব্যক্তি সে, তাকে ফাঁকি দেয় এমন সাধ্য নেই কারো। তার বিচার নির্মম এবং দ্রুত।

কাউন্টের শব্দ পাওয়াটা স্বাভাবিক। হাজার অফিসারদের মধ্যে থেকে তাকেই বেছে নিয়েছে জেনারেল বাদোগ্লিও—এর অর্থ একটাই হ’তে পারে, জেনারেল বোনার কাছে তার পাঠানো অতিরঞ্জিত রিপোর্টগুলো বাদোগ্লিও-র হাতে পড়েছে। ঠিক

হেডমাস্টারের কাছে ধরা খাওয়া দুই বাচ্চার মতো অবস্থা হ'লো কাউন্টের। কুয়ার ধূষিত পানি খাওয়ার পর যেমন হয়েছিলো, ভয়ে পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো তার।

বারোঘণ্টা সময় লাগলো ধাতস্ত হয়ে, রোলস রয়েসে চ'ড়ে বসতে।

'চালাও, গুইসেন্সি,' ঠিক সাজাপ্রাপ্ত নেতার মতো বনেদি ভঙ্গিমায়ে বিড়বিড় করে নির্দেশ দিলো কাউন্ট আলদো।

আসমারার উদ্দেশ্যে ফিরতি পথে একদম মিয়মাণ হয়ে রইলো সে। হতদ্যম, সর্বহারা—রোমে ফেরত পাঠানো হলে তার সম্মানের যে বারোটা বেজে যাবে! এতে করে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে বলা যায়।

গুইসেন্সি, কাউন্টের স্বভাব-চরিত্র যার ভালোমতোই জানা আছে, আসমারায় পৌঁছে প্রথমেই ক্যাসিনোর সামনে গাড়ি থামালো। অন্ত্যত এখানে কাউন্ট আলদো বেলিনি হিরোর মর্যাদায় ভূষিত।

ক্যাসিনোয় বীরোচিত সম্বর্ধনা পেলো কাউন্ট। অল্প বয়েসী যুবতীরা তাকে হেঁকে ধরলো, কলকল রবে মুখরিত করে তুললো বাতাস।

কয়েক ঘণ্টা পর। সদ্য দাড়ি কামিয়েছে কাউন্ট। তার ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করা হয়েছে। জিনো নিজের হাতে তার চুলে সুগন্ধ তেল ঢেলেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাকে পাউডারের পাফ বুলালো কাউন্ট। ডেহকোয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা বার আগে মেয়েদের চুমো খেলো সে, শেষ এক গ্লাস কনিয়াক গিললো, মন থেকে ভয় তাড়ানোর জন্যে বেপরোয়া ভঙ্গিতে হাসলো, তারপর মিছিল করে বেরিয়ে এলো ক্যাসিনোর বাইরে। কড়া রোদের মধ্যে তাকে নিয়ে ছুটে চললো রোলস-রয়েস, হেডকোয়ার্টারের বিশাল গেট দিয়ে রোলস-রয়েস ঢুকছে, কাছের একটা গির্জা থেকে চারটে বাজার সময় সংকেত শোনা গেলো। পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা হ'লো কাউন্টকে, নির্জন করিডর ধ'রে উল্টো দিকে ছোঁড়ার একটা প্রবণতাকে অতিকষ্টে দমন করলো সে। অনুভব করলো, হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পেটের ভেতর ভুট-ছাট শব্দ হচ্ছে, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাঁপছে চোখের পাতা। পথ-প্রদর্শক একজন সার্জেন্ট হলঘরের দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো একপাশে।

ভেতরে ঢুকে কাউন্ট দেখলো ইতালিয়দের অনেক অফিসার উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে ইতালিয়ান এয়ারফোর্সের লোকও রয়েছে। কারো দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না কাউন্ট। সিদ্ধান্ত নিলো, না হয় নিজের জুতো জোড়া ভালো করে পরখ করে দেখবে আজ।

অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিতি, অপ্রত্যাশিত একটা শব্দের দ্বারা আক্রান্ত হ'লো কাউন্ট। কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলো তার শরীর, মুখ লুকালো আস্তিনের আড়ালে। তারপর ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে আস্তিনের আড়াল থেকে উঁকি দিলো সে। কামরা ভর্তি অফিসাররা উল্লাসে হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, পরস্পরের কাঁধে আর হাতে চাপড় মারছে। হ্যাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো কাউন্ট। ঝট করে পিছনে তাকালো সে,

আরো অবাক হয়ে গেলো সেদিকে কেউ দাঁড়িয়ে নেই দেখে। এতোক্ষণে অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে উপলব্ধি করলো সে, এতো উত্তেজনা আর আনন্দ তাকে নিয়েই। অপ্রত্যাশিত হলেও, এই উষ্ণ সম্বর্ধনা তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

আবার যখন সামনে তাকালো কাউন্ট, দেখতে পেলো অফিসারদের ভিড় ঠেলে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ডদেহী আজরাইলের মতো খোদ জেনারেল বাদোগ্লিও। পিছন দিকে আরেকবার তাকালো কাউন্ট, কিন্তু সবগুলো বন্ধ দরজার সামনে একজন করে সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে দেখে পালানোর চিন্তা বাদ দিতে হ'লো তাকে। তবে নিজের অজান্তে পিছু হটতে শুরু করলো সে।

ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলো জেনারেল, তার বিশাল বপুর চাপে কাউন্টের সমস্ত দম বেরিয়ে গেলো। জেনারেলের বুকে মুখ ঠেকিয়ে হাঁপাতে লাগলো সে।

‘একজন বীরকে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য হ'লো আমার!’ হেঁড়ে গলায় ঘোষণা করলো বাদোগ্লিও।

পায়ে কোনো জোর নেই, জেনারেলের শরীর আঁকড়ে ধ'রে নিজেকে সামলালো কাউন্ট; ওদিকে কাউন্টের এহেন আলিঙ্গনে জেনারেল ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। সিরামিকের মেঝেতে যেনো কয়েক মুহূর্ত কুস্তি লড়লো দু'জন সামরিক সদস্য, অবশেষে কোনো রকমে ভারসাম্য ফিরে পেলো আলদো বেলিনি।

মাই গড, মনে মনে ভাবছে সে, আমার রিপোর্টের প্রতিটি তথ্য, দাঁড়ি-কমা সহ বিশ্বাস করে ব'সে আছে ব্যাটা। এরপর কাউন্টের বীরত্বগাঁথা নিয়ে একে একে বক্তব্য পেশ করলো গণ্যমান্য সামরিক ব্যক্তিবর্গ। গর্বে, আনন্দে চোখে পানি চ'লে এলো তার। আর বুঝি সহ্য হয় না এতো প্রশংসা, কাউন্টের মনে হ'লো তার হৃদয় বুঝি ফেটেই যাবে এবারে!

‘সম্ভাব্য সব রকম সাপোর্ট এখন পাওনা হয়েছে আপনার,’ জেনারেল তাকে আশ্বস্ত করলো। ‘সত্যি করা বলতে কি, ওগুলো আপনাক দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা।’ হেডকোয়ার্টারের প্রাইভেট স্টাডিরুমে এই মুহূর্তে ওরা শুধু তিনজন উপস্থিত—কাউন্ট, জেনারেল বাদোগ্লিও আর তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা। গোল টেবিলে ভাঁজ খোলা একটা ম্যাপ আর মদ্যপানের সরঞ্জাম রয়েছে।

‘আমার আর্মার দরকার,’ ইতস্তত না করে বললো কাউন্ট, মোটা ইস্পাতের প্লেট চিরকালই তাকে আকৃষ্ট করে, নিরাপত্তার একটা নিশ্চয়তা এনে দেয়।

‘আমরা আপনাকে এক স্কোয়াড্রন হালকা সিভি থ্রি দেবো,’ বললো জেনারেল, অর্ডারটা টুকলো প্যাডে।

‘আর এয়ার সাপোর্ট দরকার আমার।’

‘আরে ভনিতা রাখেন!’ গর্জে উঠে জেনারেল।

‘অনেক সময় নিয়ে আলোচনার পর ঠিক করা হয়েছে, আমাদের ঠিক করা উপযুক্ত সময়ে একজন গোত্র প্রধান নিজেকে ইথিওপিয়ার সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করবে। অবশ্যই, বেশ কয় হাজার লিরা ব্যয় করতে হয়েছে আমাদের, এই কারণে। নিজের বাহিনীর সমস্ত যোদ্ধা দিয়ে আমাদের সহয়তা করবে সেই গোত্রপ্রধান। ইতালির দখলকৃত ভূখণ্ড সে-ই আমাদের হয়ে শাসন করবে।’

‘জী, জী,’ কাউন্ট সায় দেয়।

‘ভদ্রলোক যে এলাকাটা আংশিক নিয়ন্ত্রণ করেন সেই এলাকাই দখল করার জন্যে লড়ছেন আপনি, কাউন্ট বেলিনি। আপনি সারডি গিরিসংকট দখল করে সারডি শহরে পৌঁছানোর পরপরই আমাদের এই গোত্রপ্রধান তাঁর দলবল নিয়ে আপনার সাথে যোগদান করবেন, নিজেকে ঘোষণা করবেন ইথিওপিয়ার রাজা হিসেবে।’

‘তার নাম?’ আবার জিজ্ঞেস করলো কাউন্ট। ‘কে সে?’

কিন্তু কথা বলার নিজস্ব একটা ঢং রয়েছে রাজনৈতিক এজেন্ট এন্টোলিনোর। ‘আপনার দায়িত্ব হবে এই গোত্র প্রধানের সাথে মিলিত হওয়া। ভালো কথা, তাঁকে কিছু সোনা দিতে হবে—সে ব্যবস্থাও আপনি করবেন।’

‘জী।’

‘ভদ্রলোক উত্তরাধিকারসূত্রে রাস গোত্রের একজন,’ ব’লে চলেছে এন্টোলিনো। ‘এই মুহূর্তে সারডিতে আপনার বিরুদ্ধে লড়ছেন তিনি, তবে পরিস্থিতি বদলে যাবে...’ থামলো সে, পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে বাড়িয়ে দিলো কাউন্টের দিকে। ‘চুক্তিপত্রটা পড়ে দেখতে পারেন, তারপর সই করুন, প্লিজ।’

এনভেলাপ থেকে কাগজটা কাঁপা হাতে বের করে ততোধিক কাঁপা হাতে সই করলো কাউন্ট, তার হাত আর স্বাক্ষরের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকলো এন্টোলিনো।

তারপর সে অন্য আরেক প্রসঙ্গ তুললো। ‘আপনার রিপোর্টে আপনি তিনজন বিদেশীর কথা বলেছেন, কাউন্ট বেলিনি। তিনজনের মধ্যে একজনের পরিচয় আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। এই মেয়েটি আসলে একটা সাংবাদিক, একটা বেশ্যা। জার্নালিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সে, কাজ করে একটা মার্কিন পত্রিকায়। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ইতালি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের অভিযোগ আগে থেকেই ছিলো। এই মেয়েটার পাঠানো রিপোর্ট এরই মধ্যে প্রচার করা হয়েছে সারা দুনিয়ায়, ফলে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, দারুণ অপ্রস্তুত অবস্থার মুখে পড়েছি আমরা—’

সিগারে বড়ো করে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন এন্টোলিনো। ধোঁয়ার ফাঁক থেকে ব’লে চললেন, ‘আপনার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকলো, এই মেয়ে স্পাইটিকে যে-কোনো মূল্যে ধরতে হবে। এবং ধরা পড়ামাত্র, ওই এলাকার নতুন সম্রাটের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে। এরপর আপনি আর মেয়েটার ব্যাপারে মাথা

ঘামাবেন না, বুঝতে পারছেন তো? রাস তাকে নিয়ে যাই করুন না কেনো, আপনার সেটা সেখার বিষয় নয়, পরিষ্কার?’

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো কাউন্ট। এই সব রাজনৈতিক আলাপ তার পক্ষে মনোযোগ দিয়ে বেশিক্ষণ শোনা সম্ভব নয়।

‘সাদা ইংরেজ লোকটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে, খুনী এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দেখামাত্র গুলি করে মেরে ফেলতে হবে। বাকি বিদেশী সৈনিকের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।’

‘আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন,’ বললো কাউন্ট। ‘সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ক্ষমা নেই।’

আমবা আরাদাম-এর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললো পিয়েত্রো বাদোগ্লিও-এর বাহিনী। খণ্ডযুদ্ধের সম্মুখীন হ’লো তারা, কিন্তু চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি চালিয়ে গেলো। আবি আদ্দি এবং তেমবিয়েন পৌছতে শত্রুর আক্রমণাত্মক হাবভাব সম্পর্কে সতর্কবাণী পেলো জেনারেল বাদোগ্লিও। তার নিজের হাতে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়—

‘সাহস এবং প্রতীজ্ঞা নিয়ে লড়ছে আদিবাসীরা। হেভি মেশিনগান ফায়ার এবং আর্টিলারি সাপোর্টের বিপরীতে খালি পায়ে, তলোয়ার হাতে সাহসিকতার সাথে লড়ছে। আমাদের বাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে এতোটুকু ভয় না পেয়ে, নাঙা তলোয়ার নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ছে আদিবাসীরা।’

হতে পারে, তারা সাহসী মানুষ, কিন্তু ইতালীয় সেনাবাহিনীর বিশাল ওয়ার মেশিনের বিপরীতে তাদের বাধা খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত, রাস মুগ্ধলতুর কাছে পৌছতে সক্ষম হ’লো জেনারেল বাদোগ্লিও-এর বাহিনী। আমবা আরাদামের সুরক্ষিত পর্বতের গুহায় নিজের যোদ্ধাদের নিয়ে গুঁত পেতে আছে সে, বুড়ো এক সিংহের মতো।

বৃদ্ধ গোত্রপ্রধানের বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো বাদোগ্লিও বাহিনী। বিশাল তিন এঞ্জিনের ক্যাথ্রোনিস বিমান গর্জন করে পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে চললো ঝাঁকে ঝাঁকে, টনের পর টন বোমা ফেলে ঝাঁঝরা করে দিতে লাগলো পার্বত্য এলাকা। সাথে হেভী আর্টিলারি দিয়ে সহায়তা করলো গ্রাউন্ড ট্রুপ।

ওদিকে, ওয়েলস অভ চান্ডিতে ফিরে আসার পর দিনকয়েক একটা ঘোরের মধ্যে কাটলো কাউন্টের। হুগা ছাড়িয়ে যেতে চলেছে নতুন ট্যাংক বহন পৌঁছেছে ক্যাম্পে, সেগুলো সম্পর্কে তেমন কোনো আগ্রহ দেখালো না। তারপর হঠাৎ একদিন ছ’টা ট্যাংকের সামনে হাজির হ’লো সে।

হালকা সি ভি ৩ ট্যাংকগুলো দ্রুতগতি, কুঁজবিশিষ্ট টারিট, ভোঁতা চেহারা ইত্যাদি দেখে তার মাথায় নতুন একবুদ্ধি গজালো। কাউন্ট দেখলো, ট্যাংকগুলো কোনো বাধাই

মানে না, আপন গতিতে নিজের পথে যেতে থাকে। একটা ট্যাংকের ভেতর ঢোকান পর তার মনে হলো, দুনিয়ায় এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হ'তে পারে না। বাহ, শিকারে যাবার জন্যে এমন চমৎকর বাহন থাকা সত্ত্বেও ব'সে আছে সে!

ডানাকিল মরুর বিশালত্ব সত্ত্বেও তার এই শিকার অভিযান ঠিকই নজর কাড়লো। জীবনের সেরা দিন কাটাচ্ছে কাউন্ট আলদো বেলিনি।

বাসটা আর হারারিরা ছটফটে, তাদের ধৈর্য নেই বললেই চলে। অল্প ক'দিনের যুদ্ধবিরতিতে একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়লো তারা, রোজই কিছু লোক তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আর গবাদিপশু নিয়ে ক্যাম্প ছাড়লো। ছোটো ছোটো দলগুলো ধীরগতিতে পাহাড় বেয়ে উঠে গেলো নিজেদের পাথুরে গ্রামগুলোর দিকে, ঠাণ্ডা আর প্রিয় আবহাওয়ার আশ্রয়ে। বাড়ি মানেই মিষ্টি একটা পরিবেশ, আরাম আর আনন্দ। যাবার সময় সবাই গোত্রপ্রধান রাস গোলামের কাছ থেকে বিদায় নিলো, তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললো, ডাকলেই আবার তারা যুদ্ধ করার জন্যে সাথে সাথে ফিরে আসবে। তবু নিজের সেনাবাহিনী এভাবে আকারে ছোটো হয়ে যাচ্ছে দেখ মন খারাপ হয়ে গেলো তাঁর, একদণ্ডের জন্যে ভুলতে পারলেন না যে তাঁদের পবিত্র জন্মভূমির এক প্রান্তে সদলবলে ওত পেতে ব'সে রয়েছে ইতালিয়দের বাহিনী।

বেশিরভাগই অবশ্য রয়ে গেলো, তবে আকারে ছোটো হয়ে যাওয়ায় আদিবাসী বাহিনীর ভেতর উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়ে গেলো কয়েক গুণ। প্রতিদিনই নতুন নতুন গুজব ছড়ালো, কারো সাধ্য নেই সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে দেখে। জেক আর গ্যারেথও কম উদ্বিগ্ন নয়, যার যার ডিপার্টমেন্টে শৃংখলা বজায় রাখতে হিমশিম খেয়ে গেলো ওরা।

রাতের অন্ধকারে পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে ইতালিয়দের ক্যাম্পের কাছাকাছি আরেকবার যেতে হ'লো জেককে। হেনরিয়েটাকে ইতালিয়রা ক্যাম্পের দিকে কেনো টেনে নিয়ে গেছে বোধগম্য হ'লো না ওর। হুড পরানো বুল'স আই লণ্টনের আলোয় আর্মারড কারের পাটসগুলো এক এক করে খুললো ও, ওকে সাহায্য করলো গ্রেগোরিয়াস। বেন্টলি এঞ্জিনটা ভাগ ভাগ করে চটের বস্তায় ভরা হলো, গাধাগুলো যাতে বহিতে পারে। ভোরের দিকে গিরিসংকরে নিচে ক্যাম্প ফিরে এসেও থামলো না জেক, হেনরিয়েটার অচল পাটস ফেলে দিয়ে নতুন পাটস ফিট করলো। ছোটোখাটো মেরামত দরকার হ'লো বাকি দুটো গাড়িরও। কাজ শেষ করার পর তৃপ্তিবোধ করলো জেক, আদিবাসীদের আর্মার শক্তি প্রায় আগের পর্যায়ে ফিরে এসেছে, তিনটে কার নিয়ে একটা স্কোয়াড্রন, প্রতিটি গাড়ি বহু বছর আগে কারখানা থেকে বেরুবার সময় যেমন নিখুঁত ছিলো আজও প্রায় তেমনি নিখুঁত।

গ্যারেথও ইতোমধ্যে আদিবাসীদের কয়েকজনকে ট্রেনিং দিয়ে ভিকার্স মেশিনগান চালানো শিখিয়ে ফেলেছে। অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনীর লোজনকে এক জায়গায় জড়ো করে সংক্ষিপ্ত একটা কোর্স শেষ করালো সে, ট্রেনারের ভূমিকায় তার সাথে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গানাররাও থাকলো। ভিকার্স মেশিনগানের ছত্রছায়া কিভাবে ব্যবহার করতে হবে শেখানো হ'লো অশ্বারোহী বাহিনীকে, পদাতিক বাহিনীকে শেখানো হ'লো পিছু হটার সময়ও কিভাবে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতিসাধন সম্ভব।

গিরিসংকট ধ'রে পিছু হটার পথটা সার্ভে করার সময় বের করে নিলো গ্যারেথ। প্রতিটি ডিফেন্সিভ পজিশন চিহ্নিত করলো সে, গিরিসংকটের খাড়া গায়ে প্রতিটি মেশিনগান নেট আর সাপোর্ট ট্রেন্ড তৈরি হওয়ার সময় সশরীরে উপস্থিত থেকে সুপারভাইজ করলো। চুলের কাঁটা সমেত বাঁকা ট্র্যাক ধ'রে এগোবার সময় প্রতিটি বাঁকে ওদের মুখলধার গুলিবর্ষণের সামনে পড়তে হবে ইতালিয়দের, একই সাথে পিছনের ট্রেন্ডে লুকিয়ে থাকা পদাতিক সৈন্যরা বেরিয়ে এসে শত্রুপক্ষের পিছু হটার পথও বন্ধ করে দেবে।

গিরিসংকট বেয়ে ওঠায় পুরোটা ট্র্যাক সমান করা হয়েছে, প্রয়োজনের সময় যাতে আর্মারড কারগুলো পিছু হটতে পারে। সব কাজ শেষ, সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা, কিন্তু প্রত্যাশিত হামলা হচ্ছে না ব'লে সবাই ভারী অস্থির।

এমন সময় হঠাৎ একদিন নতুন ধরনের একটা গুজব শোনা গেলো। গুজবের কোনো কমতি নেই, কাজেই কোনোটাই তেমন গুরুত্ব পায় না, কিন্তু এটার উৎস ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ইতালিয়দের ঘাঁটির ওপর রাতদিন নজর রাখছে একদল স্কাউট, তারা ই নিজেদের চোখে দেখে এসে রিপোর্ট করলো রাস গোলামের কাছে। অদ্ভুতদর্শন কয়েকটা বাহন, ঝড়ের বেগে ছোট্টে, চাকা বা পা কিছুই নেই। বাহনগুলো প্রায় রোজই গোটা মরু চষে বেড়াচ্ছে, খোলা প্রান্তরেও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

‘চাকা নেই,’ চিন্তিত দেখালো গ্যারেথকে, জেকের দিকে ফিরলো, উঁচু করলো একটা ভুরু। ‘কি হ'তে পারে বুঝতেই পারছো, কি?’

‘পারছি,’ মাথা ঝাঁকালো জেক। ‘তবে নিজেদের গিয়ে একবার দেখে আসা দরকার।’

আকাশে চাঁদ আধখানা হলেও, তার আলোয় ইস্পাতের তৈরি ট্র্যাকের গভীর দাগ পরিষ্কার চেনা গেলো মাটিতে। হামাগুড়ি দেয়ায় ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলো জেক, খুঁটিয়ে দেখলো দাগগুলো, উপলব্ধি করলো ওর সবচেয়ে ভীতিকর আশংকাটাই সত্যি হ'তে চলেছে। ওর প্রিয় লৌহমানবীগুলোকে এবার লড়তে হবে ট্রাক

লাগানো আরো অনেক ভারি বাহনের সাথে। ওগুলোয় কি আছে কল্পনা করে নিলো জেক—রিভলভিং টারিট, বড় বোর-এর দ্রুতবর্ষণক্ষম ভারি আগ্নেয়াস্ত্র।

কি ঘটতে পারে বিদ্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলো ও। ভারি আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছুটে এলো একটা মিসাইল, নিতম্বিনীর সামনের আর্মার ভেদ করে এঞ্জিন কমপাটিমেন্টে ঢুকলো, সব চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে গেলো খোল ভেঙে নিয়ে, যাবার সময় ছাতু করে দিয়ে গেলো পথে ত্রুদের যে-ক'জনকে পেলো। 'ট্যাংক,' বিড়বিড় করে বললো ও। 'ব্লাডি ট্যাংক।'

'আমি বলবো, আমাদের মধ্যে একজন শ্যেন স্কাউট রয়েছে,' বললো গ্যারেথ, প্রিসিলার টারিটে আয়েশ করে ব'সে রয়েছে সে। 'নবিস কেউ হলে ধ'রে নিতো দাগগুলোর জন্যে নিশ্চয়ই কোনো ডাইনোসর দায়—কিন্তু শ্যেনদৃষ্টি জেককে ফাঁকি দেয়া অতো সহজ নয়।' কথা শেষ করে চুরুটের শেষ মাথাটা টারিটের পাশে ঘষে নেভানোর জন্যে লম্বা করলো সে, জানে কাজটা খেপিয়ে তুলবে জেককে।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে সিধে হ'লো জেক। 'তোমার আগামী জন্মদিনে উপহারটা পাবে—একটা ছাইদানি।' রাইফেল, মেশিনগান বা কামানের গোলাগুলি খেয়ে ওর আর্মারড কার ঝাঁঝরা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ওটার গায়ে জ্বলন্ত তামাক ঘষে নোংরা করলে ওর পিঙ্কি জ্বলে যায়, জানে সেই উদ্দেশ্যেই কাজটা করা হলো।

'দু'খিন, ওল্ড চ্যাপ,' অবাধ নিঃশব্দ হাসি ফুটলো গ্যারেথের ঠোঁটে। 'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আর কখনো হবে না।'

আঙটা ধ'রে গাড়ির মাথায় চড়লো জেক, হ্যাচ গ'লে নেমে পড়লো ড্রাইভিং সিটে, এঞ্জিনের আওয়াজ যতোটা সম্ভব কম রেখে ছেড়ে দিলো প্রিসিলা, খোলা প্রান্তর ধ'রে ধীরগতিতে এগোলো ওরা।

সেই পুরনো চিন্তাটা ফিরে এলো জেকের মাথায়, ওদের তিনজনের কথা ভাবছে, যেমন রোজই ভাবে। মরুর রাতের ওই ভালোবাসাবাসি পর, জেক জানে, ভিকি ওর হয়ে গেছে। নিজেদের কষ্ট না দিয়ে এখন আর আলাদা হওয়া সম্ভব নয় ওদের দুজনের পক্ষেই।

কিন্তু ওই ঘটনার পর বেশ কয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, খুব কমই ভিকির মাঝে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে জেকের। একদিন, পড়ন্ত বিকেলে কুয়াশাঘেরা ঝর্ণার ধারে, কালো পাথরের উপর নরম সবুজ আগাছা—আবৃত নির্জন স্থানে, লোক চক্ষুর অন্তরালে আবারো প্রেম করেছে ওরা। পালকের বিছানার মতোই নরম ছিলো আগাছা-আবৃত সেই প্রাকৃতিক বিছানা। পরে, নগ্ন হয়ে সঁতার কেটেছে ওরা ঝর্ণার জলে। গাঢ় পানির তলায় মসৃণ, ফ্যাকাসে আর নরম ঠেকেছে ভিকির ত্বক।

আবার, গ্যারেথ সোয়েলস-এর সঙ্গেও ওকে দেখেছে জেক—ক্যাম্পের ওপর খাড়া কোনো পাথরের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটছে, কথা বলার সময় ঝুঁকে আছে পরস্পরের দিকে। অকস্মাৎ খিলখিল শব্দে ভিকির হেসে ওঠা,

কিংবা অস্ফুট কোনো মন্তব্য শোনার জন্যে ঝুঁকে গ্যারেথের ঘনিষ্ঠ হওয়া, গ্যারেথের শ্রুতিমধুর কৌতুক বা লক্ষ্যবস্তুবহুল অঙ্গভঙ্গি দেখে কৃত্রিম রাগ বা বিস্ময় প্রকাশ করা ইত্যাদি আগের মতো নির্ভেজাল আছে, নিজের ভেতরে ঈর্ষার জ্বালা ঠিকই টের পায় জেক।

এর কোনো মানে হয় না, জেক জানে। ভিকি এতো বোকা নয়, অথবা এতোটা অবুঝও নয় যে জেককে মন দিয়েও গ্যারেথের আকর্ষণীয় ব্যবহারে পটে যাবে। অন্তত জেকের তাই বিশ্বাস। যে প্রগাঢ় আবেগ ওদের ভালোবাসাকে মহিমাম্বিত করেছে, তা এক জীবনে একবারই আসে।

কিন্তু, তবু ভিকি এবং গ্যারেথের মধ্যকার খুনসুটির যেনো কোনো শেষ নেই। একটা পুরো সকাল ওরা দুজনই ক্যাম্পের বাইরে ছিলো একই সাথে। জেক জানে, ও কিছু নয়। সন্দেহ নেই, গ্যারেথকে পছন্দ করে মেয়েটা। সে নিজেও তাকে পছন্দ করে। ওর চাল-চলন, হাসি-তামাশা, আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহারে কেউ আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। উপরের কপট ভাবটুকু বাদ দিলে, গ্যারেথ সোয়েলস একজন পরিপূর্ণ পুরুষ।

‘হ্যাঁ,’ নিজের অজান্তেই ব’লে উঠলো জেক। ‘সে আমার বন্ধু,’ ঠোঁটে ক্ষীণ, বাঁকা হাসি নিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো সে, প্রিসিলাকে নিয়ে এগুচ্ছে দক্ষিণ আর পূর্ব দিকে, জানে আকাশের গায়ে লালচে হয়ে থাকা অংশটার নিচেই ইতালিয়দের ক্যাম্প। ‘তাকে আমি ভালোবাসি।’

এক সময় টারিট থেকে হ্যাচ গ’লে নিচের দিকে ঝুঁকলো গ্যারেথ, জেকের কাঁধে টোকা দিলো। ‘সামনে, বাঁ দিকে একটা নালা। ওটাতাই বোধহয় কাজ হবে।’

প্রিসিলাকে সেদিকে ঘুরিয়ে নিলো জেক, কয়েক সেকেণ্ড পর থামলো। ‘কিন্তু বেশি গভীর,’ মন্তব্য করলো ও।

‘সূর্য ওঠার পর তাতে বরং সুবিধেই হবে, রিজ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাবো, আর পূর্ব দিকে গোটা প্রান্তরে চোখ রাখা যাবে।’ হাত তুলে ইতালিয়দের সার্চলাইটের আভা আর তার সামনের খোলা মরুভূমিটা দেখানো গ্যারেথ। ‘সম্ভবত ওদিকেই রোজ ওরা খেলাধুলো করে। এখান থেকে দেখতে কোনো অসুবিধে নেই। এখনই আমাদের আড়াল নিতে হয়, ওল্ড চ্যাপ।’

ওদের প্ল্যান হ’লো ইতালিয়দের স্কোয়াড্রনের গতিবিধি দেখার জন্যে সারাটা দিন ব্যয় করবে, রাতের অন্ধকারে আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে ফিরে যাবে ক্যাম্পে। গ্যারেথের যুক্তি মেনে নিলো জেক, প্রিসিলাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নালার ভেতর নামলো। এক সময় থামলো ও, আর্মারড কারের শুধু টারিটের খানিকটা অংশ পাড় ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে থাকলো, দূর থেকে দেখে চেনা যাবে না। পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকলো প্রিসিলা, ওটার সামনে মসৃণ এটা ঢাল, প্রয়োজনের সময় ঢালটা বেয়ে দ্রুত উঠতে পারবে ওরা, হঠাৎ করে পালানোর দরকার হ’তে পারে।

এঞ্জিন বন্ধ করলো জেক, হাত কুড়াল নিয়ে খোলা মরুতে হাঁটলো দু’জন পাশাপাশি, কাঁটাঝোপ কেটে এনে ঢেকে দিলো টারিটের বেরিয়ে থাকা অংশটুকু।

বালি ভর্তি একটা বালতিতে স্পেসয়ার ক্যান থেকে গ্যাসোলিন ঢাললো জেক, নালায় তলায় এনে আগুন ধরালো তাতে। গায়ে আগুনের আঁচ থাকায় মরুর হিম বাতাস কাঁপ ধরাতে পারলো না, ওদিকে কফির জন্যে পানিও গরম হচ্ছে। দু'জনেই ওরা চুপচাপ, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন।

‘আমার মনে হয়, আমাদের একটা সমস্যা আছে’ অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো জেক, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের দিকে।

‘যতো পিছনেই তাকাই, সমস্যাবহুল পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, এই দৃশ্য ছাড়া আর তো কিছু আমি দেখতে পাই না,’ মৃদুকণ্ঠে বললো গ্যারেথ। ‘তবে কয়েকটা ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করলে—যেমন, অভিশপ্ত একটা মরুভূমিতে আটকা পড়েছি, আশপাশের সঙ্গী-সাথীরা সবাই অসভ্য আর রক্তখেকো খুনী, ইতালিয়দের বাহিনীর সাথে শিক্ষিত, সভ্য সৈনিকেরাও আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে, ক্যাশ হয় কিনা সন্দেহ আছে এমন একটা চেক ছাড়া পকেট খালি না, শতো মাইলের মধ্যে ভালো কোনো মদের বোতল দেখতে পাচ্ছি না, আর শিগগির পালাবার কোনো সম্ভাবনাও নেই ইত্যাদি দেখেও যদি না দেখার ভান করি, তাহলে বলবো, আমার আকার-আকৃতি এখন পর্যন্ত অবিকৃতই আছে, কাজেই আমিও বেশ সুখে আছি।’

‘আমি ভিকির কথা ভাবছিলাম।’

‘আহ! ভিকি!’

‘তুমি জানো আমি ওর প্রেমে পড়েছি।’

‘আমাকে তুমি অবাক করলে,’ আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় নিঃশব্দে শয়তানী হাসি হাসলো গ্যারেথ। ‘সে জন্যেই কি ভাবাবেগে ভেজা মুখ হাঁ করে হাবার মতো ঘুর ঘুর করছো কদিন ধরে, হাষা হাষা করছো মিলনের মরশুমে যাঁড় যেমন করে? গুড লর্ড, তুমি না বললে আমার কল্পনাতেও আসতো না।’

‘আমি সিরিয়াস, গ্যারেথ।’

‘ওটাই তো তোমার এক নম্বর সমস্যা, ওল্ড চ্যাপ। সব কিছুই তুমি অতিরিক্ত সিরিয়াসলি নাও। তিন ভাগের দু’ভাগ সম্ভাবনা, বাজি ধ’রে বলতে পারি, তোমার মনে এরই মধ্যে আইভি লতায় ঢাকা কটেজের স্বপ্ন মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে, কটেজের সামনে সুন্দর বাগান, খোঁয়াড়ে হাজার দেড়েক গরু-মোষ, পুকুরে বড় বড় মাছ—মিলছে তো, কি?’

‘ছবিটা প্রায় ওরকমই—প্রায়,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিলো জেক। ‘হ্যাঁ ব্যাপারটা সিরিয়াস।’

বুক পকেট থেকে দুটো চুরুট বের করলো গ্যারেথ, একটা জেকের দুই চৌঁটের মাঝখানে গুঁজে দিলো, শুকনো একটা গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে জেকের মুখের দিকে বাড়িয়ে দিলো সেটা। বিদ্রূপাত্মক হাসি খসে পড়েছে তার চৌঁট থেকে, চিন্তিত গলা, কিন্তু তার মুখের ভাব আগুনের অনিশ্চিত আলোয় বুঝতে পারা কঠিন। ‘কর্ণওয়ালের কাছাকাছি, জায়গাটা চিনি আমি। দেড়শো একর। ছবির মতো সুন্দর পুরনো একটা

ফার্মহাউস, অবশ্যই। ছোটোখাটো কিছু মেরামতের কাজ করতে হ'তে পারে, নিজের রুচি মতো একআধটু বদলে নেবো, তবে শেডের তলায় গরু আর ঘোড়াগুলো ভারি স্বাস্থ্যবান। তমি জানো, ওল্ড চ্যাপ, নিজের হাতে দুধ দোয়াতে ভালোবাসি আমি? জীবনের মজাটা তো গাঁয়েই হে, শিকার করো, মাছ ধরো, গম ফলাও, এলাকার মাথা হয়ে থাকো, সাধারণ মানুষের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করো। চেক ভাঙিয়ে যা টাকা পাবো, তার সাথে ব্যাংক লোন বিয়োগ করে যা দাঁড়াবে, বোধহয় হয়ে যাবে।'

এরপর দু'জনেই ওরা চুপ করে থাকলো, কাপে কফি ঢেলে আগুন নেভালো জেক, নড়েচড়ে গ্যারেথের দিকে মুখ করে বসলো আবার।

'ব্যাপারটা অতোটকুই সিরিয়াস,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো গ্যারেথ।

'তাহলে শান্তি বা সমঝোতায় আসার কোনো উপায় নেই? ভদ্রলোকের চুক্তি সম্ভব নয়?' ঠোঁটের কাছে মগ তুলে বিড়বিড় করলো জেক।

'প্রাণ থাকতে নয়,' বললো গ্যারেথ। 'সেরা লোকটিকে জিততে দাও, এবং কথা দিচ্ছি প্রিয় গাভীর প্রথম বাচ্চাটার নাম রাখবো আমরা তোমার নামের সাথে মিলিয়ে, প্রতিজ্ঞা করলাম।'

আবার ওরা চুপ করে গেলো, যে যার নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক, মগে চুমুক দিলো, টান দিলো চুরুটে।

'দু'জনের একজন ঘুমালে পারি,' এক সময় বললো জেক।

'টস করে দেখা যাক কে ঘুমাবে,' পকেট থেকে সেই মুদ্রাটা বের করে আঙুলের টোকায়ে শূন্য হুঁড়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'লো গ্যারেথ।

'হেডস,' বললো জেক।

হুঁড়ে দিয়ে নৈপুণ্যের সাথে কজির ওপর মুদ্রাটা থামালো গ্যারেথ। 'তোমার কপাল মন্দ, ওল্ড চ্যাপ।' পয়সাটা পকেটে চালান করে দিয়ে মগের অবশিষ্ট কফি মাটিতে ফেলে দিলো সে, নালার নরম বালির ওপর একটা কম্বল বিছালো। খানিক পরই তার নাক ডাকার আওয়াজ পেলো জেক।

ভোরে আস্তে করে নাড়া দিয়ে তার ঘুম ভাঙালো জেক, ঠোঁটে আঙুল রেখে সাবধান করলো। দ্রুত সজাগ হ'লো গ্যারেথ, চোখ পিট পিট করে ঘুমতাড়ালো, দু'হাত দিয়ে সরিয়ে সমান করলো মাথার চুল। কোনো প্রশ্ন না করে একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়ালো সে, প্রিসিলার আড়ালে থেকে পিছু নিলো জেকের।

আজকের ভোর যেমনো লাল আর সোনালির নিঃশব্দ বিচ্ছোরণ, পূব আকাশের অর্ধেকটা রাঙিয়ে তুলেছে; উঁচু পার্বত্য এলাকাগুলোর মাথায় সোনালি আগুন জ্বলছে; উঁচু পার্ব এলাকাগুলোর মাথায় সোনালি আগুন জ্বলছে, নিচের ছায়াগুলো দূসর নীল।

অন্তগামী আধখানা চাঁদ হাঙরের সাদা দাঁতের মতো, পশ্চিম দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে।

‘শুনতে পাচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করলো জেক, মাথা ঘুরিয়ে নিস্তব্ধ ভোরে কান পাতলো গ্যারেথ।

কাঁপা কাঁপা একটা শব্দ।

‘কি?’

মাথা ঝাঁকালো গ্যারেথ, চোখে বাইনোকুলার তুললো। ধীরে ধীরে রোদ লাগা রিজ-গুলোর ওপর দৃষ্টি বুলালো।

‘ওদিকে,’ তীক্ষ্ণ, চাপা কণ্ঠে বললো জেক, ওর হাত অনুসরণ করে বাইনোকিউলার ঘোরালো গ্যারেথ।

কয়েক মাইল দূরে, অস্পষ্ট আকৃতি নিয়ে কালো কয়েকটা বিন্দু সমতল প্রান্তরের ডেবে থাকা একটা অংশে নড়াচড়া করছে। এতো দূরে আর ঘন ছায়ার ভেতর যে গ্লাসের ম্যাগনিফায়িং লেন্সেও পরিষ্কার নয়, কাঠামোগুলো ভালো করে চেনা গেলো না।

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো ওরা, ওদের সামনে বিশাল শুকনো পুকুর-আকৃতির গর্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দিকে ধীরগতিতে সরে যাচ্ছে বিন্দুগুলো, ওগুলোর সামনে একটা ঢাল ক্রমশ উঠে গেছে ওপর দিকে, সারির প্রথম বিন্দুটা এরইমধ্যে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিনারা ছাড়িয়ে উঠে এলো সেটা, সোনালি সূর্যের উজ্জ্বল রোদে চকচক করে উঠলো গা, কাটামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার ধরা পড়লো ওদের চোখে।

‘সিভি থ্রি ক্যাভলরি ট্যাংক,’ ইতস্তত না করে বললো গ্যারেথ। ‘ফিফটি হর্স পাওয়ার আলফা এঞ্জিন। ফ্রন্টাল আর্মার টেন সেন্টিমিটারস। ঘন্টায় আঠারো মাইল টপ স্পীড।’ সে যেনো ক্যাটালগে চোখ রেখে পড়ে যাচ্ছে। ‘মোট ত্রু তিনজন-ড্রাইভার, লোডারগানার আর কমান্ডার। যতোদূর বুঝতে পারছি, মাউন্টিঙে ওটা ফিফটি-এর এম স্প্যাভাউ। এক হাজার গজের মধ্যে লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, রেট অভ ফায়ার প্রতি মিনিটে পনেরো রাউন্ড।’

সে থামার আগেই সামনের ট্যাংকটা রিজ-এর পরবর্তী ঢালের কিনারা দিয়ে নেমে গেলো, এক এক করে বাকি পাঁচটা বিন্দুও অনুসরণ করলো সেটাকে, ওগুলো অদৃশ্য হবার সাথে সাথে এঞ্জিনের আওয়াজও আর শোনা গেলো না।

চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে মুচকি হাসলো গ্যারেথ। ‘বুঝতেই পারছো, ওন্ড চ্যাপ, আমরা খানিক বেকাদায় পড়ে গেছি। ওই স্প্যাভাউগুলোয় রয়েছে রিভলভিং টারিট।’

‘আমাদের আর্মার কারের স্পীড বেশি,’ সোজা-সাপটা বললো জেক; সেই মায়ের মতো, যার ছেলেদের তিরস্কার করা হয়েছে।

‘ওই একটাই সুবিধে,’ মন্তব্য করলো গ্যারেথ। ‘আর সব দিক থেকে আমরা নিষ্কণ্ট হয়ে গেছি।’

‘ব্রেকফাস্ট চলবে?’ কিঙ্জেস করলো জেক। তারপর অনেকটা আপনমনে বিড়বিড় করলো, ‘সারাটা দিন আটকা পড়ে থাকা।’

টিনের কৌটা থেকে স্টু বেরুলো, গরম করা হ’লো বালতির আগুনে। তারপর কাগজে মোড়া রুটি চায়ের মগে ডুবিয়ে খেলো ওরা। শেষ করার আগেই আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে এলো সূর্য।

‘শুলাম,’ ব’লে প্রিসিলার খেলের পাশে, ছায়ায় কন্মল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো জেক, হাঁটু ভাঁজ করা আকৃতিটা দেখতে হ’লো বিশাল এক বাদামী কুকুরের মতো।

টারিটের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো গ্যারেথ, খোলা প্রান্তরের দিকে চোখ, সেদিকে এরই মধ্যে তাপ-তরঙ্গ কাঁপতে শুরু করেছে। পালাবদলের সময়টা ভালোই বেছেছে ব’লে নিজেকে অভিনন্দন জানালো সে, রাতে বেশ ক’ঘণ্টা ভালো ঘুম হয়েছে, আর এখন সকালের ঠাণ্ডার ভেতর ব’সে থাকতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আবার যখন জেকের পালা শুরু হবে, মুচকি হেসে সে ভাবলো, আকাশের নিচে প্রান্তর হয়ে উঠবে জ্বলন্ত তন্দুর, প্রিসিলার খোল হয়ে উঠবে অদৃশ্য আগুন।

‘এক নম্বরটাকে দেখতে পাও কিনা দেখা,’ বিড়বিড় করলো সে, অলসভঙ্গিতে চোখে বাইনোকুলার তুলে দিগন্তরেখার ওপর দৃষ্টি বুলালো। চুপিসারে এগিয়ে এসে ইতালিয়দের টহলদাররা চমকে দেবে ওদেরকে, সে সম্ভাবনা নেই। অভিজ্ঞ সৈনিকের সতর্ক দৃষ্টি সাহায্যে এই জায়গাটি নির্বাচন করেছে সে, চুরুট ধরাবার আগে সেজন্যে আরেকবার নিজেকে অভিনন্দন জানালো।

‘এবার, জরুরি একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাও, মাই ডিয়ার গ্যারেথ,’ আবার বিড়বিড় করলো সে। তোমার আর্টিলারি নেই, মাইনফিল্ড বা আর্মার-ভেদী গান নেই অথচ এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ধ্বংস করতে হবে—কিভাবে তা সম্ভব?’

সমস্যা নিয়ে ঝাড়া দু’ঘণ্টা মাথা ঘামালো গ্যারেথ। সমাধান একটা পেলো বটে, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে নির্দিষ্ট একটা দিক থেকে, নির্দিষ্ট একটা জায়গায়, নির্দিষ্ট সময়ে ট্যাংকগুলোর আসার ওপর। ‘উঁহুও ব্যাপারটা অবাস্তব হয়ে দাঁড়াচ্ছে!’ তার মানে আরো চিন্তাভাবনা করতে হবে।

আরো এক ঘণ্টা পোরোলো। গ্যারেথ উপলব্ধি করলো, একটাই মাত্র উপায় আছে যার সাহায্যে ইতালিয়দের ট্যাংকগুলো নিজেরাই নিজেদেকে ধ্বংস করার জন্যে প্ররোচিত হবে। ‘সেই পুরনো গাধা আর মুলোর গল্প,’ ভাবলো সে। ‘এখন শুধু আমাদের একটা মুলো দরকার।’ চট করে জেক যেদিকে শুয়ে আছে সেদিকে একবার তাকালো সে। এই তিন ঘণ্টায় একবারও নড়েনি জেক। দীর্ঘ, ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া বোঝার উপায় নেই বেঁচে আছে কিনা। জেক এমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এতোটা গভীর গুম ঘুমাতে পারে দেখে কেনো কে জানে সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করলো গ্যারেথ।

প্রথর রোদ গ্যারেথের মাথায় আগন ঢালছে। লোমকূপ থেকে বেরুবার প্রায় সাথে সাথে শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাম, চামড়ায় রয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ মিহি লবণের প্রলেপ। চোখে বাইনোকুলার তুলে আবার দিগন্তের দিকে তাকালো সে।

তাপ-তরঙ্গ অস্পষ্ট হয়ে আছে দিগন্তরেখা, কাছাকাছি রিজগুলোর প্রায় কোনো অস্তিত্বই ধরা পড়লো না। গরম বাতাস দ্রুত জায়গা বদল করলো, পানির মতো ভারি আর পুরু, কোথাও মৃদুমন্দ গতিতে, কখনো দমকা ঝড়ো স্বভাব নিয়ে; অলসভঙ্গিতে মোচড় খেলো, পাক খেলো ঘূর্ণির মতো।

ঘন ঘন চোখ পিট পিট করলো গ্যারেথ, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ থেকে ফেলে দিলো ঘামের ফোঁটা। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো সে। জেকের পালা শুরু হ'তে এখনো একঘণ্টা বাকি দেখে মুহূর্তের জন্যে কুবুদ্ধি চাপলো মাথায়, ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেবে নাকি? রোদের মধ্যে খেলের মাথায় আর গরম চুলোর মাথায় ব'সে থাকা একই কথা। আরেকবার ছায়ায় নেতিতে থাকা জেকের দিকে তাকালো সে। আবার কথাটা ভাবলো, দেবে নাকি ঘড়ি কাঁটা ঘুরিয়ে?

এই সময় ভারি, উত্তপ্ত বাতাস অদ্ভুত একটা শব্দবয়ে আনলো। কাঁপা কাঁপা, কোমল একটা শব্দ; অনেকটা যেনো মৌমাছির গুঞ্জন। বোঝার কোনো উপায় নেই কোন্ দিক থেকে আসছে, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে সতর্ক হ'লো গ্যারেথ, সমস্ত ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সজাগ। মিলিয়ে গেলো আওয়াজটা, আবার ফিলে এলো, এবার আগের চেয়ে জোরালো—মাটির বিশৃংখল উত্থান-পতন ও উত্তপ্ত বাতাসের অস্থির আলোড়ন ওর কানের সাথে কৌতুক করছে। আচমকা শব্দের মাত্রা অনেকটা বেড়ে গেলো, ভোঁতা গর্জনের মতো, কাঁপিয়ে দিলো চারদিকের বাতাস।

গ্রাস জোড়া ঝট করে পূব দিকে ঘোরালো গ্যারেথ। তার মনে হ'লো গোটা পূব দিক থেকে উৎসারিত হচ্ছে আওয়াজটা, পাথুরে তীরভূমিতে পশুসুলভ হিংস্রতা নিয়ে সমুদ্রের আছড়ে পড়ার মতো।

মাত্র এক নিমেষের জন্যে নৃত্যরত তাপ-তরঙ্গ সর গেলো সামনে থেকে, ছোট্ট ফাঁকের ভেতর গাঢ় রঙের অস্পষ্ট একটা বিকট আকৃতি দেখতে পেলো গ্যারেথ, আকারে বিশাল, থামের মতো মোটা পা নিয়ে অচেনা এক দানব যেন, সম্ভবত তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। পরমুহূর্তে তাপ-তরঙ্গ ঢেকে দিলো ফাঁকটুকু, হতচকিত গ্যারেথকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিলো, সত্যিই কি জিনিসটা দেখেছে সে? কিন্তু গর্জনটা তো আর মিথ্যে নয়! আওয়াজটা এখন আকাশ বাতাস সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

'জেক,' ব্যর্থকণ্ঠে ডাকলো সে, জবাবে আরো বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো জেক, পাশ ফিরে শুলো। টারিট থেকে শুকনো একটা ডাল ভেঙে ছুঁড়ে দিলো গ্যারেথ, লাগলো জেকের ঘাড়ের পিছনে।

রাগের সাথে ঘুম ভাঙলো জেকের। 'কি পেয়েছো...!' খঁকিয়ে উঠলো ও।

'এখানে এসো, তাড়াতাড়ি!' রুদ্ধশ্বাসে ডাকলো গ্যারেথ।

'কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করে বললো জেক, টারিটের ওপর গ্যারেথের পাশ দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, চোখে গ্রাস তুলে পূব দিগন্তে তাকিয়ে আছে। আওয়াজটা আগের চেয়ে ভারি হয়েছে, গভীর সুরে মেঘ ডাকার মতো, কিন্তু তাপ-তরঙ্গের দেয়াল আর চোখ-ধাঁধানো রোদ এমন নিরেট যে ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না।

ভাষায় প্রতি সন্ধ্যায় পাগল কাউন্টের কাছে অভিযোগ জানায় সে, প্রতিবাদে মুখর হয়, কিন্তু পরদিন সকালে আবার বাধ্য হয় মরুর ওপর হিংস্র পশুদের ট্যাংক নিয়ে ধাওয়া করতে।

ইতোমধ্যে গোটা সাতেক সিংহ আর বুনো কুকুর মারা পড়েছে, তবে নিহত হরিণের সংখ্যা অনেক। খেদিয়ে যখন অপেক্ষারত কাউন্টের কাছে নিয়ে আসা হয়, সব কয়টা আধমরা হয়ে গিয়েছিল, ঘামে ভিজে চকচক করছিল গা, চোয়াল থেকে লাল ঝরছিল, খোলা প্রান্তরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাড়া খাবার পর তখন ওগুলোর দাঁড়াবার শক্তিও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

পশুদের এই দুর্বলতা বা দুর্দশা কাউন্টের শিকার করার আনন্দে এতোটুকু বিঘ্ন ঘটতে পারেনি, সে বরং কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে যে ওগুলোকে যথেষ্ট দৌড় খাটিয়ে ক্লান্ত করার পরই কেবল তার দিকে খেদিয়ে আনতে হবে। হুমকি দিয়ে বলেছে, যদি দেখে যে কোনো পশু সশব্দে হাঁপাচ্ছে না তাহলে তার খুব রাগ হবে, আর তার রাগ যে কি জিনিস ক্যাপটেনকে সেটা জিনোর কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছে। কাউন্টের চাই সহজ শিকার, আর সুন্দর ফটোগ্রাফ, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

শিকারের সংখ্যা যতো বাড়বে, ততো বাড়বে ফটোগ্রাফের সংখ্যা, কাজেই ট্যাংক আসার পর মহাফুর্তিতে আছে কাউন্ট। কিন্তু ক’দিন যেতেই সমস্যা দেখা দিলো, কারণ ডানাকিল মরু অণুগতি বন্যপ্রাণীর ভরণপোষণের সামর্থ্য রাখে না। তাড়া খেয়ে কিছু পশু মারা পড়লো, কিছু পালিয়ে গেলো। ভারিসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে উঠলো কাউন্ট। ট্যাংক স্কোয়াড্রনের ক্যাপটেনকে ডেকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করলো সে, নিজের অজান্তে লোকটার অতৃপ্তি আর প্রতিহিংসা বাড়িয়ে দিলো বিপুল পরিমাণে।

বুড়ো মন্দাটাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্যাপটেন, প্রথমে জ্যাক্ট একটা হাতি ব’লে চিনতেই পারেনি, খোলা প্রান্তরে বিশাল একটা মনুমেন্ট অথবা স্কুদে পাহাড় ব’লে মনে হয়েছিল।

হাতিটা প্রকাণ্ড, ছিন্‌ভিন্ন কান দুটো প্রাচীন জাহাজের জোড়া পালের মতো, চামড়ার অসংখ্য গভীর ভাঁজ একটা জাল বুনে রেখেছে, তার মাঝখানে ছোটো ছোটো চোখ দুটো রাজ্যের বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা। তার একটা দাঁত ঠোঁটের কাছে ভাঙা, অপরটা যেমন লম্বা তেমনি মোটা আর হলুদ, বাঁকের শেষ মাথায় ডগাটা ঘষা খেয়ে খেয়ে, গোল আর ভোঁতা হয়ে আছে।

হাতি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সিকি মাইল দূরে ট্যাংক থামালো ক্যাপটেন, বিনো কিউলারের সাহায্যে ওটার আকার আর মতিগতি বোঝার চেষ্টা করলো, তারপর ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার চেহারা, সরু গৌফ জোড়ার নিচে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো প্রতিশোধপরায়ণ হাসি, কালো চোখে ঝিক করে উঠলো অশুভ একটা আলো।

‘তাহলে মাই কর্নেল, শিকার চাই তোমার, তাই না?’ আপনমনে ফিসফিস করলো সে। ‘পাবে, শিকার তুমি পাবে। কথা দিচ্ছি।’

‘না! না!’ আনন্দ আর উত্তেজনার আর বেশি কিছু বলতে পারলো না ক্যাপটেন।

‘হিংস্র, বদমেজাজী আর খুব বিপজ্জনক,’ ক্যাপটেনকে বোঝাবার চেষ্টা করলো গানার।

‘ঠিক!’ খুশিতে হেসে উঠলো ক্যাপটেন, ভূগিতে দুই হাতের তালু এক করে ঘষলো। ‘আমার তরফ থেকে কাউন্টের জন্যে ওটা একটা বিশেষ উপহার।’

ছয়টা ট্যাংকই ব্যবহার করলো ক্যাপটেন, এক এক করে ছয়বার হাতিটার কাছাকাছি গেলো ড্রাইভাররা। এরপর, ওগুলোকে ধাওয়া করে কোনো ফল হচ্ছে না বুঝতে পেরে, বিরক্ত হয়ে সে চেষ্টা বাদ দিলো হাতিটা। তার পেট থেকে প্রতিবাদমুখর গুড় গুড় শব্দ বেরিয়ে এলো, মোচড় খেলো লেজ, চোখের পিছনের গ্ল্যান্ড থেকে পানি বেরিয়ে এসে ভিজে একটা মোটা দাগ তৈরি করলো ধুলো মাখা পথে, তাড়া খেয়ে ছুটে চললো পশ্চিম দিকে, পিছনে নিয়ে আসাছে এক লাইনে ছয়টা ট্যাংক। তবে এখনো সে রেগে আছে।

‘জানি তুমি বিশ্বাস করবে না,’ প্রায় নরম সুরে বললো গ্যারেথ। ‘আমি নিজেও ঠিক জানি না বিশ্বাস করা উচিত কিনা। তবে, দৃষ্টিক্রম যদি না হয়, ওটা একটা হাতি—ছয়টা ইতালিয়দের ট্যাংকের একটা স্কোয়াড্রনকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে, সোজা আমাদের দিকে।’

‘বিশ্বাস আমিও করি না,’ বললো জেক। ‘যদিও তুমি যা দেখেছো, আমিও তাই দেখেছি—কিন্তু, এ কিভাবে সম্ভব? তার মানে ওটাকে ওরা ব্লাডহাউন্ডের মতো ট্রেনিং দিয়েছে। তা কি সম্ভব, নাকি পাগল হ’তে আর বেশি দেরি নেই আমার?’

‘দুটোই সত্যি,’ বললো গ্যারেথ। ‘যদি পরামর্শ দেই, লেজ তুলে পালাবার জন্যে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার, তুমি কিছু মনে করবে? তোমার মনে হচ্ছে না, এভাবে ওদের কাছে চলে আসাটা নিরাপত্তার জন্যে হুমকিস্বরূপ, ওল্ড চ্যাপ, কি?’

লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক হ্যাণ্ডেলের সামনে পড়লো জেক।

ড্রাইভারের হ্যাচ গ’লে ঝুপ করে নেমে এলো গ্যারেথ, ব্যস্ত হাতে ইগনিশন আর থ্রটল সেটিং অ্যাডজাস্ট করলো। ‘অল সেট,’ বললো সে, উদ্বিগ্ন চোখে কাঁধের ওপর দিয়ে বারবার তাকালো।

এক হাজার গজের মধ্যে চলে এসেছে হাতি। সমান বেগে আসছে সে, লম্বা পা ফেলে, হাঁটা ও নৌড়ে মাঝামাঝি একটা গতি, কোনোরকম বিরতি বা বিশ্রাম না নিয়ে যে-কোনো হাতি এই ভঙ্গিতে ত্রিশ মাইল পেরিয়ে যেতে পারে।

‘আমাকে সাথে নিয়ে আত্মহত্যা করতে চাও, কি?’ স্টেচিয়ে উঠলো গ্যারেথ।

আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যাণ্ডেল ঘোরালো জেক, কিন্তু প্রিসিলা কোনো সাড়া দিলো না, এমন কি জেককে উৎসাহ দিয়ে পরের বার একটু কাশলোও না।

মূল্যবান একটা মিনিট পেরিয়ে গেলো। দুই হাঁটুতে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁপাচ্ছে জেক।

‘এই শালার বজ্জাত কারটা....,’ শুরু করলো গ্যারেথ।

জেকের আঁতকে ওঠায় কোনো কৃত্রিমতা নেই, ঝট করে সিধে হ’লো ও। ‘গাল দিয়ে না, তাহলে কোনদিনই স্টার্ট নেবে না। আবার ক্র্যাঙ্ক হ্যাণ্ডেল ঘোরালো। ‘বিপদের সময় গোলমাল করতে নেই, লক্ষী সোনা!’ ফিসফিস করলো ও, গায়েব সবটুকু শক্তি দিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালো।

কাঁধের ওপর দিয়ে আরেকবার দ্রুত তাকালো গ্যারেথ। বিপজ্জনক মিছিলটা কাছে, অত্যন্ত কাছে চলে এসেছে। ড্রাইভারের হ্যাঁচ থেকে মাথা বের কবে একপাশে কাত হ’লো সে, প্রিসিলার এঞ্জিন-কাউলিংয়ে আদর করে হাত বুলালো, নরম সুরে বললো, ‘রাগ করো না, মানিক। রাগের মাথায় কি বলেছি ভুলে যাও। এবার হাসো তো, সুন্দরী!’

মাথার ওপর ও চারধারে জোড়া ক্যানভাসের পর্দা, একদল শিকারীকে নিয়ে কোলাপসিবল ক্যাম্প চেয়ারে ব’সে রয়েছে কাউন্ট আলদো বেলিনি। টুকরো বরফ সহযোগে ঠাণ্ডা পানীয় আর হালকা নাস্তা পরিবেশন করছে মেস সার্ভেণ্টরা, কানভাস অনবরত পতপত করায় মরুর গরম সহ্য করার মত যথেষ্ট বাতাস লাগছে গায়ে।

দারুণ খোশমেজাজে রয়েছে কাউন্ট, তার একটা কারণ পেটটা কোনো গোলমাল করছে না। ছয়জন অফিসারকে অ্যাপায়ন করছে সে, সবাই তারা ভাড়াটে যোদ্ধা, ইতালিয়দের উপদেষ্টা অথবা বিভিন্ন পদমর্যাদায় কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে—বলাই বাহুল্য, ছয়জনই তারা শ্বেতাঙ্গ। এই মুহূর্তে সবাই তারা শিকারীর পোশাক পরে রয়েছে, সবার হাতের কাছে একটা করে স্পোটিং রাইফেল।

‘আমার মন বলছে আজ আমরা খুব ভালো শিকার পাবো। খেদাড়েদের যেভাবে ভড়কে দিয়েছি, জান প্রাণ বাজি রেখে খুঁজছে ওরা।’ হাসলো কাউন্ট, একটা চোখ টিপলো, কর্তব্য মনে করে পাল্টা হেসে দায়িত্ব পালন করলো অফিসাররা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আশা করছি...।’

‘মাই কাউন্ট!’ মাই কাউন্ট’ ভূতে পাওয়া লোকের মতো দিশেহারা চেহারা নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলো জিনো। ‘ওরা আসছে! রিজ থেকে আমরা ওদের দেখতে পেয়েছি।’

‘আহ!’ গভীর তৃপ্তির সাথে আওয়াজটা ছাড়লো কাউন্ট। ‘চলো তাহলে দেখা যাক আমাদের ট্যাংক বহরের মহৎ প্রাণ ক্যাপটেন আজ আমাদের জন্যে কি নিয়ে আসছে। সাদা মদ ভর্তি গ্লাসটা তিন চুমুকে শেষ কররো সে, তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্যে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো জিনো, তারপর তার দিকে মুখ করে পিছু হটতে হটতে

বেরিয়ে এলো তাঁবু থেমে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো গুইসেস্পি যেখানে রোলস-রয়েসের তোবড়ানো গা থেকে ধুলো পরিষ্কার করছে।

ছোট মিছিলটা, কাউন্টের রোলস-রয়েসের নেতৃত্বে, নিচু রিজের ঢাল বেয়ে নেমে এলো মাচাগুলোর মাঝখানে।

নিচু একটা চওড়া উপত্যকার ওপর মাচাগুলো, তৈরি করেছে ইতালিয়ান এঞ্জিনিয়াররা। মোট বাঁশ এসেছে আসমাড়া থেকে, লাল মাটি খুঁড়ে অনেক গভীরে পোঁতা হয়েছে সেগুলো, মাচা যাতে কাঁটাঝোপের চেয়ে বেশি উঁচু না হয়। মাচা হলও, ভেতরে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি মাচাকে ঘাসের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে, রোদ ঠেকানোর জন্যে, বেড়ার গায়ে গর্ত করা আছে খেদিয়ে নিয়ে আসা পশুদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার জন্যে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'তে পারে, তাই ক্যাম্প চেয়ার রাখা হয়েছে একটা করে। একটা মাচাকে শুধু বার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে বরফ থেকে গুরু করে সম্ভাব্য সব রকম মদ আর হালকা নাস্তাও পাওয়া যাবে। ল্যাট্রিনের সংখ্যা দুটো-একটা সবার জন্যে, অপরটি একা কাউন্টের জন্যে। দ্বিতীয় ল্যাট্রিনে তালা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভুল বা ইচ্ছে করে কেউ যাতে ঢুক পড়তে না পারে, শুধু ওটার মাথার ওপরই রঙিন কাপড়ের পর্দা।

এক সার মাচা, মাঝখানেরটা কাউন্টের। আকারে তারটাই সবচেয়ে বড়, ভেতরে আরাম আয়েশের আয়োজনও ব্যাপক। মাচার জায়গাটি এমনভাবে বাছা হয়েছে, খেদিয়ে নিয়ে আসা বেশির ভাগ পশু ওটার সামনে দিয়েই যাবে। ইতোমধ্যে তার জুনিয়র অফিসাররা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বেশি শিকার জোটে তাহলে কি হেনস্তাই না সহ্য করতে হবে। কোনো ক্লান্ত পশু যদি তাদের সামনে দিয়ে যায়, প্রথম গুলিটা কাউন্ট না করার আগে অন্য কেউ সেটার দিকে রাইফেল পর্যন্ত তুলতে পারবে না। এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করায় একজন ক্যাপটেনের পদমর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাকে লেফটেন্যান্ট বানানো হয়েছে, তারপর তাকে আর অভিযানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আইন অমান্যকারী দ্বিতীয় অফিসারকে চাকরিচ্যুত করে ফেরত পাঠানো হয়েছে আসমাড়ায়।

হাত আর কোমর ধ'রে কাউন্টকে রোলস থেকে নামলো জিনো, তিন জন সৈনিক কাঁধে তুলে নিলো তাকে, সিঁড়ি বেয়ে তুলে দিয়ে এলো মাচায়। স্যালাউ করলো গুইসেস্পি, পিছু হটে রোলস-রয়েসে চড়লে আবার, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলো রিজের উল্টো দিকে।

ক্যানভাস চেয়ারে আরাম করে বসলো কাউন্ট। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জ্যাকেটের বোতাম খুললো সে, রবফে ভেজানো একটা রুমাল নিলো জিনোর হাত থেকে। কাউন্ট তার মুখ থেকে ঘাম মুছছে, দামী হুইস্কির একটা বোতল খুললো জিনো, বরফ ভরা বালতিতে আরো কয়েকটা বোতল রয়েছে। হুইস্কি ভর্তি লম্বা গ্লাসটা কাউন্টের সামনে ফোব্লিং টেবিলের ওপর আস্তে করে নামিয়ে রাখলো জিনো। এরপর ম্যানলিকার রাইফেলটা লোড করলো, সদ্য খোলা নতুন প্যাকেট থেকে চককে কার্টিজ বেরুলো।

ভিজে কাপড়টা ফেলে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো কাউন্ট, বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে তাপদন্ধ প্রান্তরে তাকালো, তাপ-তরঙ্গের ভেতর ঘাসের চাপড়া আর কাঁটা ঝোপগুলো নাচছে। ‘আমার কেনো যেনো মনে হচ্ছে, বুঝলে জিনো, আজ আমরা শিকার করে ভারি আনন্দ পাবো।’

‘পাবেনই তো, মাই কাউন্ট!’ বিশ্বস্ততার সাথে সায় দিলো সার্জেন্ট জিনো, খর্বকায় শরীর নিয়ে কাউন্টের চেয়ারের পিছনে সশ্রদ্ধভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, বুকের সাথে আড়াআড়িভাবে ধ’রে রেখেছে ম্যানলিকারটা।

‘কাম অন, ডার্লিং,’ কর্কশ গলা, ক্র্যাক্স হ্যাভেলের ওপর ঝুঁকে দম নিলো, চিবুক থেকে ঘামের ফোঁটা পড়লো বুকের কাছে শাটে, এবার নিয়ে বোধহয় একশোবার হ্যাভেলটা ঘোরালো জেক। ‘স্টার্ট না নিলে আমরা ডুববো, সুইটহার্ট।’

হ্যাচ থেকে প্রিসিলার টারিটে উঠে এলো গ্যারেথ, মরিয়া হয়ে আরেকবার তাকালো পিছন দিকে। অনুভব করলো, ইঠাৎ কি যেনো একটা অচল হয়ে গেলো তার পেটের ভেতর, দমটা আটকে গেলো গলায়। বিশাল হাতি আর মাত্র দুশো গজ দূরে, হেঁটে আসছে সোজা ওদের দিকে, বিশাল কালো কান বাতাসে ঝাপটা মারছে, কুঁৎকুঁতে চোখ জোড়ায় আক্রোশ আর ঘৃণা।

ওটার ঠিক পিছনে, দু’দিকে ছড়ানো, ধাওয়া করে আসছে ইতালিয়দের ট্যাংক বহর। ট্যাংকের নিটোল গোলাকৃতি ফ্রন্টাল আর্মার রোদ লেগে চকচক করছে, ইতালিয়দের বছরঙা পতাকা পতপত করছে বাতাস, প্রতিটি হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আছে কলো হেলমেট পরা ট্যাংক কমান্ডারের মাথা। বাইনোকুলার চোখে থাকায় প্রত্যেক কমান্ডারের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলো গ্যারেথ, এতো কাছে চলে এসেছে তারা।

আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার, প্রিসিলাকে পাশ কাটিয়ে যাবে ইতালিয়দের ট্যাংকগুলো। কমান্ডাররা যে ওদেরকে দেখতে পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাতিটা ট্যাংকগুলোকে সরাসরি নালার দিকে টেনে আনছে, প্রিসিলার টারিটে ডালপালা থাকলেও ইতালিয়রা একশো গজের ভেতর চলে এলে ঠিকই চিনতে পারবে ওটাকে।

পালাবার উপায় নেই, আত্মরক্ষারও সুযোগ নেই। শত্রুরা যদিও থেকে আসছে তার ঠিক উল্টো দিকে মুখ করে রয়েছে ভিকার্স মেশিনগান, সেটা বল মাউন্টিঙের ওপর থাকায় এই মুহূর্তে প্রয়োজন মতো ঘোরানোও সম্ভব নয়। প্রিসিলার ওপর অকস্মাৎ অন্ধ আক্রোশে কঁপে উঠলো গ্যারেথ, ঝেড়ে একটা লাখি মারলো টারিটে। ‘দুশরিত্রা!’ খেকিয়ে উঠলো সে, দাঁত চাপলো, আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাগের সাথে প্রতিবাদ জানালো প্রিসিলা, স্টার্ট নিলো, সাবলীল যান্ত্রিক শব্দে চালু থাকলো কোনো বিরতি ছাড়াই।

বেয়ারা অর্থাৎ খেদাডের চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে সে, ফিরে পেয়েছে যোদ্ধার ভূমিকা।

ক্যাপটেনের উত্তেজনা সংক্রমিত হ'লো অন্যান্য ট্যাংক কমান্ডারদের মধ্যেও। সামনের দুটো ট্যাংকে যারা রয়েছে তাদের নাকের ডগায় ধুলোর মেঘ, লালচে মেঘের ভেতর অতিকায় হাতি, হাতির গুঁড়ের ডগায় আর্মারড কার। ট্যাংক দুটোর জুরা দেখতেই পেলো না নিচে পনেরো ফুট গভীর একটা নালা রয়েছে, কিনারা থেকে ঝপ করে নেমে গেছে খাড়া গা। ওগুলো এমনভাবে বিধ্বস্ত হ'লো যেনো আকাশ থেকে একশো কিলো বোমা ফেলা হয়েছে। সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কায় রাইডিং হুইলগুলো ট্যাংক থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো, ভারি ইস্পাতের ট্র্যাকগুলো আলগা হয়ে একেবেঁকে উড়ে গেলো ঠিক যেনো একজোড়া হিংস্র কেউটে। সেটিং থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লো রিভলভিং টারিট সেই সাথে জুদের শরীর কোমরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লো প্রায় নিখুঁতভাবে, যেনো প্রকাণ্ড এক কাঁচি দিয়ে মাঝখান থেকে কেটে নেয়া হয়েছে।

টারিটের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে গ্যারেথ দেখলো দুটো ট্যাংক অদৃশ্য হয়ে গেলো মাটি থেকে, সাথে সাথে বিশাল ধুলোর পাহাড় লাফিয়ে উঠলো আকাশে। 'দুটো গেলো,' চিৎকার করলো সে।

'আরো চারটে আছে,' বললো জেক, এবড়োথেবড়ো মাটির ওপর দিয়ে প্রিসিলাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। 'কিন্তু জাম্বোজেটের খবর কি?'

'খবর জানতে চেয়ো না!'

মাটি যতোই উঁচু-নিচু হোক, কোনো বাধাই মানছে না জেকের জাম্বো জেট। হাতিটার সামনে আর্মারড কার অনবরত লাফাচ্ছে, ধরা দিয়েও দিচ্ছে না, পিছনে জোড়া ট্যাংকের সংঘর্ষজনিত কর্কশ আওয়াজ, সব মিলিয়ে উন্মাদ করে তুললো তাকে।

'এখনো সে আমাদের প্রতিবেশী, ঘাড়ে চাপতে চায়,' ব্যথকণ্ঠে আবার বললো গ্যারেথ। হাতি ইতোমধ্যে এতো কাছে চলে এসেছে যে সেটার দিকে মুখ তুলে তাকাতে হ'লো তাকে। তাকিয়ে আছে, দেখলো বুক থেকে তুলে গুঁড়ের কুণ্ডলী লম্বা করলো হাতি, তাকে পেঁচিয়ে টারিট থেকে তুলে নেয়ার জন্যে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। 'যতো জোরে পারো, ওল্ড চ্যাপ। তা না হলে অচিরেই দেখতে পাবে হাতি ব্যাটা তোমার ঘাড়ের ওপর ব'সে আছে।'

'গার্ডটাকে আমি বারণ করেছি শিকারকে যেনো বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া না করে,' খেঁকিয়ে উঠলো কাউন্ট। 'কতোবার বলেছি, জিনো? দশ-বারো বার হবে?'

'অবশ্যই, মাই কাউন্ট!'

'প্রথম দিকে খুব তাড়া করতে হবে, এক সময় ক্লাস্ত হয়ে পড়বে ওগুলো, তারপর শেষ একমাইল শান্তভাবে খেদিয়ে মাচার দিকে আনতে হবে।' রাগের সাথে গ্লাসে

পারবে না সে, হঠাৎ দেখলো গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্যাংক বহরের কমান্ডার অর্থাৎ ক্যাপটেন, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে জিজ্ঞেস করলো, ‘শিকার উপভোগ্য হয়েছে তো, মাই কর্নেল?’

আরো অনেক পরে ফিরে এলো জিনো, অতি কষ্টে গর্ত থেকে তুললো কাউন্টকে, গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলো, ধ’রে ধ’রে হাঁটিয়ে নিয়ে এলো রোলস-রয়েসে। পুরোটা সময় ভয়ে ভয়ে তাকালো জিনো, তার কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কারণ একনাগাড়ে অশ্লীল গালিগালাজ আর লোমহর্ষক হুমকি দিয়ে চলেছে কাউন্ট, কার বাপের সাধ্য তার সামনে দাঁড়ায়।

ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। কাউন্টকে গাড়িতে তোলার সময় জিনোকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলো সে, কাউন্ট মার মার করে উঠলো, ‘খরবদার, আমাকে ছুঁয়ে না! আমার গায়ে তোমার মতো কাপুরুষের ছোঁয়া লাগলে কবরে আমার চৌদ্দপুরুষের শান্তি বিনষ্ট হবে। তোমাকে কর্তব্য অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত করা হলো! তুমি দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছো! বানরের লেজের তলায় যে ফুটো থাকে, তুমি তাই!’

রোলস-রয়েসে তোলা হ’লো কাউন্টকে, গাড়ি ছেড়ে দিলো গুইসেন্সি। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিটের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো কাউন্ট, ক্যাপটেনের দিকে থুথুর কণা ছিটিয়ে আবার শুরু করলো, ‘তুমি যুগের কলংক! তুমি জঘন্য বলশেভিক! আমি তোমার জন্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের ব্যবস্থা করবো...’ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেলো তার চিৎকার, রিজ বেয়ে উঠে পড়লো রোলস-রয়েস, ইতালিয়দের ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে ওরা। বহু দূর থেকেও দেখা গেলো আকাশের গায়ে হাত ছুঁচ্ছে কাউন্ট বেলিনি।

ওদের পিছু নিয়ে মরুর আরো বহু পথ পেরিয়ে এলো হাতি, অনেক আগেই পিছিয়ে পড়া ট্যাংক বহর তার নাগাল পাবার আশা ত্যাগ করেছে। শেষ এক মাইল পেরোবার সময় আর্মারড কারের সাথে তার দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়লো, অবশেষে সে-ও গুঁড়ের প্যাচে গ্যারেথ সোয়েলস্কে জড়িয়ে নেয়ার আশাত্যাগ করলো, দাঁড়িয়ে পড়লো খোলা প্রান্তরের মাঝখানে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বিশাল আকৃতি এদিক ওদিক দুলছে, যদিও এখনো কান ঝাপটাচ্ছে সে, সবেগে শূন্য তুলে দিচ্ছে গুঁড়-শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানানোর তার এই ভঙ্গি অনেকাই ক্রোধোন্মত্ত মানুষের সাথে মিলে যায়।

নির্জন ধু-ধু প্রান্তরে হাতিকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে আর্মারড কার, টারিটের পাশে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র ভঙ্গিতে তাকে স্যালুট করলো গ্যারেথ। তারপর দুটো চুরুট ধরালো সে, হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকলো, একটা চুরুট ধরিয়ে দিলো জেকের হাতে। ‘দিনটাকে স্বর্ণ ডিম্বপ্রসবিনী বলা যেতে পারে, ওল্ড চ্যাপ, কি? ইস্পাতের একজোড়া দানবকে প্র্যাং করে দিয়েছি, বাকিগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছি সুস্থ মানসিকতা।’

জুলিয়াস সীজার ও ...ও...,’ তোতলাতে শুরু করলো সে, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে অন্য কোনো বীরের নাম উল্লেখ করতে চায়, কিন্তু নাম খুঁজে পাচ্ছে না। ‘...ও...ঠিক আছে, জুলিয়াস সীজারকেই উদারহরণ হিসেবে ধরুন।’

‘বেশ।’

‘এমনকি স্বয়ং জুলিয়াস সীজারও নিজের হাতে তলোয়ার ঘোরাননি। সত্যিকার যেট কমান্ডাররা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা পরিচালনা করেন, প্ল্যান দেন, আদেশ করেন—নিকৃষ্ট মরণশীলদের।’

‘তা ঠিক, জিনো।’

‘যে কোনো একটা চাষাও তলোয়ার ঘোরাতে বা বন্দুক চালাতে পারে—কিন্তু নেহাতই গাধা-গরু ছাড়া আর কি বলা যায় তাদের, আপনি বলুন?’

‘তাও সত্যি।’

‘নেপোলিয়ানের কথাই ধরুন না, কিংবা ধরুন ইংরেজ ওয়েলিংটনের কথা—’
আবার আমতা আমতা করে থেমে গেলো জিনো।

‘আচ্ছা, নেপোলিয়ান হলেই চলবে—তার কথাই ধরলাম,’ উৎসাহ দিলো কাউন্ট।

‘তিনি যখন যুদ্ধ করলেন, সংঘর্ষের জায়গা থেকে দূরেই থাকলেন, একবারও কাছে ভিড়লেন না। ইতিহাসে আমরা পাই নেপোলিয়ান আর ওয়েলিংটন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছিলেন, ওয়াটারলু-তে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি ছিলো? দু’জনের মাঝখানে ছিলো কয়েক মাইলের ব্যবধান। তারা নিজেদের বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন...।’

‘তুমি আসলে ঠিক কি বলতে চাইছো, জিনো?’

‘মাফ করবেন, মাই কর্নেল—আমার আবেদন, আপনার সাহস যেনো আপনাকে অন্ধ করে না দেয়; আপনি বীরশ্রেষ্ঠ, শত্রুরা আপনার নাম শুনেই আধমরা হয়ে যায়, কাজেই সত্যিকার একজন কমান্ডারের দূরে সরে থাকার ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আপনারও উচিত...,’ দীর্ঘ বাক্যটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গঠনরীতি বদলে প্রশ্নাকারে শেষ করলো সে, ‘...মাই কর্নেল, আমি কি অযৌক্তিক কিছু বলছি?’

অধীর অগ্রহ আর উত্তেজনার সাথে কাউন্ট কি বলে শোনার অপেক্ষায় থাকলো জিনো। কথাগুলো বলার জন্যে সবটুকু সাহস একত্রিত করতে হয়েছে তাকে। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে, কথাগুলো শোনার পর কাউন্ট যদি তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়, তাও ভালো, তবু কাউন্টের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে আর সে যাবে না। কাউন্টের পাশেই তার জায়গা, কাউন্টকে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখ যায় তাহলে তারও নিরাপত্তা নিশ্চিত হ’তে পারে।

‘প্লিজ, মাই কাউন্ট। আপনি আমাদের দিকেও একটিবার মুখ তুলে তাকান। ঈশ্বর না করুন, আপনার যদি কিছু হয়, আমরা শ্রেফ এতিম হয়ে যাবো! মহাপরাক্রমশালী বীরদের মতো আপনিও নিজের নিরাপত্তার দিকটা নিয়ে ভাবুন...।’

কাউন্টের মনের কথাই বলেছে জিনো, সে-ও গত ক’দিন ধ’রে ভাবছে কোনো অজুহাতে যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকা যেতো। পৈত্রিক প্রাণের ওপর কার না মায়া আছে। ‘জিনো,’ কাউন্ট বললো। ‘তুমি একজন দার্শনিক।’

বিনয়ে বিগলিত হ’লো জিনো। ‘আপনি আমাকে অতিরিক্ত সম্মান দিচ্ছেন, মাই কাউন্ট।’

‘না, জিনো! না! এ তোমার ন্যায্য পাওনা। হ’তে পারে তোমার জন্ম হয়েছে রাস্তার ধারে বা নর্দমার পাড়ে, কিন্তু তুমি একটা প্রতিভা।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নত করলো জিনো।

‘আমার সাহসী যোদ্ধাদের প্রতি আমি অন্যায় করেছি,’ বললো কাউন্ট। তার বেদনাকাতর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেলো, উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মুখ, চোখে জ্বলে উঠলো কিসের যেনো একটা আলো, সদ্য মুক্তি পাওয়া কয়েদীর চোখেই সচরাচর দেখা যায় আলোটা। ‘এতোদিন আমি শুধু নিজের কথাই ভেবেছি—নিজের গর্ব, নিজের সম্মান। বেরোয়া হয়ে উঠেছি, বিপদের তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়েছি মৃত্যুর মুখে, ভেবে দেখিনি কি মূল্য দিতে হ’তে পারে। একবারও মনে পড়েনি আমি না থাকলে আমার সাহসী যোদ্ধারা এতিম হয়ে যাবে, নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে।’

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো জিনো। ‘আপনার বিকল্প কোথায় পাবো আমরা?’ প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হ’লো তার।

‘জিনো।’ পিতাসুলভ নরম সুরে ডাকলো কাউন্ট, জিনোর কাঁধে একটা হাত রাখলো। ‘ভবিষ্যতে অবশ্যই আমাকে আরো কম স্বার্থপর হ’তে হবে।’

‘মাই কাউন্ট, শুনে কি যে আমার আনন্দ হচ্ছে সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।’ কেঁদেই ফেললো জিনো, চান্ডি ক্যাম্পে নিরাপদে সময় কাটানোর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, ভাবতেও পারেনি সে। ‘আপনার কাজ হ’লো কমান্ড করা।’

‘প্ল্যান দেয়া,’ বললো কাউন্ট।

‘পরিচালনা করা,’ কাঁদতে কাঁদতে হাসলো জিনো।

‘আমার ভয়, এটাই আমার নিয়তি।’

‘ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব।’ উত্তেজনায় খাটিয়ার ওপর ব’সে পড়েছিল কাউন্ট, তাকে ধ’রে ধীরে ধীরে আবার শুইয়ে দিলো জিনো।

‘জিনো,’ বললো কাউন্ট। ‘শেষবার তোমার বেতন নিয়ে কবে আমরা আলোচনা করি বলতে পারবে?’

‘অনেক মাস পেরিয়ে গেছে, মাই কাউন্ট।’

‘এসো, বিষয়টা নিয়ে এখনি আলোচনাটা সেরে ফেলি,’ বললো কাউন্ট। ‘তুমি তো একটা রত্ন—অমূল্য! ধরো, আরো এক হাজার লিরা, প্রতি মাসে?’

‘মনে উঁকি দিয়েছিল দেড় হাজার লিরার কথা,’ সক্ররুণ সুরে বিড়বিড় করলো জিনো।

লজ্জার লেশমাত্র নেই, জিনোর আবিষ্কৃত সামরিক দর্শন নিজের ব'লে চালিয়ে দিলো কাউন্ট বেলিনি। সেদিন সন্ধ্যায় অফিসার্স মেসে তার অফিসাররা বিপুল উৎসাহের সাথে সমর্থন করলো কাউন্টকে, মদ আর ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে দর্শনের সারমর্ম ব্যাখ্যা করলো সে। ইতালিয় বাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনার ধারণাটি শুধু যে বাস্তবসম্মত তাই নয়, ভারি উৎসাহব্যঞ্জকও বটে। অফিসারদের উৎসাহ হঠাৎ করে ভাটা পড়লো যখন তারা জানতে পারলো যে নতুন দর্শন তাদের কারো জন্যে প্রযোজ্য নয়, একা শুধু কাউন্টের বেলায় খাটবে। বাকি সবাইকে ঈশ্বরের পবিত্র নামে আত্মবলি দেয়ার সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ অকৃপণভাবে দান করা হবে। বলাই বাহুল্য, এই পর্যায়ে দর্শনটির জনপ্রিয়তা সর্ব নিম্ন পর্যায়ে নেমে এলো।

সবশেষে, বেশিরভাগ প্রতিবাদ ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে, কাউন্ট সিদ্ধান্ত দিলো—নতুন দর্শন মাত্র তিনজনের জন্যে প্রযোজ্য হবে। তার আর জিনোর নামের সাথে আরেকটা নাম যোগ হলো, মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। এখন থেকে এই তিনজনই থার্ড ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দেবে।

নতুন ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে খুশি হ'লো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি। এতোদিন ইতালিয় বাহিনীর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে নামকাওয়াস্তে ছিলো সে, কাউন্ট নাক গলানোয় যুদ্ধ পরিচালনায় তেমন কোনো ভূমিকা সে রাখতে পারেনি। নতুন দর্শনের কথা শুনেই সে বুঝতে পারলো, ভয়ে গা বাঁচাতে চাইছে কাউন্ট। সে ভাবলো, এই সুযোগটাই নিতে হবে তাকে। কাউন্টকে পিছিয়ে থাকার উৎসাহ দিয়ে সুযোগ মতো নিজে সামনে এগিয়ে আসবে সে, ইতালিয় বাহিনীকে নিজের খুশিমতো পরিচালনা করবে। বুদ্ধিটা তাকে এতোই আত্মহারা করে তুললো, নিজের তাঁবুতে ফিরলো সে বগলের তলায় এক বোতল স্থানীয় তেজ নিয়ে।

পরদিন সকালে তীব্র মাথাব্যথা নিয়ে বাহিনীর সামনে উপস্থিত হ'লো মেজর, তার চোটপাট আর মারমুখো ভাব দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো ইতালিয়রা। সাত সকালেই দেখা গেলো, মেজরের নির্দেশে সৈনিকরা তাদের রাইফেল পরিষ্কার করতে বসেছে। ইউনিফর্মের তামার বোতাম ঘষে মেজে চকচকে করা হলো, গলার কাছে শেষ বোতামটিও লাগাতে হ'লো সবাইকে। কাজের সময় কেউ সিগারেট ধরাতে পারলো না, নির্দিষ্ট সময়ের পর ল্যাট্রিনের দিকে কাউকে যেতে দেখা গেলে বাধা দেয়া হলো, এমনকি প্রস্রাব করার সময়ও বেঁধে দেয়া হলো, প্রতি দু'ঘন্টায় একবার। বাহিনীর প্রতিটি ফ্রপের সামনে দিয়ে হাঁটাইটি করলো মেজর ক্যাস্তেলানি, দায়িত্ব আর কাজ ভাগ করে দিলো সবাইকে। মোটা ছড়ি দিয়ে দু'চার ঘা লাগালো দু'এক জনকে, শ্রেফ কর্তৃত্ব ফলানোর জন্যে।

বিকেলে অনার গার্ডদের প্যারেড প্রত্যক্ষ করলো মেজর। সদ্য তৈরি এয়ারফিল্ডের শেষ মাথায় থামলো তারা। বিমানবহরের প্রথম চালান হিসেবে একটা প্লেন আজ আসার কথা। অনুষ্ঠানে কাউন্ট বেলিনিও উপস্থিত।

ওটা একটা ক্যাপরনি বম্বার, এঞ্জিনের সংখ্যা তিন। উত্তর আকাশের কোণ থেকে অলসভঙ্গিতে উড়ে এলো সেটা, কাঁচা মাটির দীর্ঘ রানওয়ের ওপর বার কয়েক চক্কর দিলো, তারপর লাল ধুলোর ঝড় তুলে নেমে এলো নিচে।

রুপালি ফিউজিলাজ থেকে প্রথমে নামলো আসমারায় সেই রাজনৈতিক উপদেষ্টা, সিনোর এন্টোলিনো। পড়নে সদ্য ভাঁজ খোলা লিনেনের স্যুট, ভাবগম্ভীর চেহারা। কাউন্টের স্যালুটের উত্তরে মাথার পানামাটা দু'আঙুলের ধরে সম্মান্য একটু উঁচু করলো, তারপর মুহূর্তের জন্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো তারা।

আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে পাইলটের দিকে ফিরলো কাউন্ট। কোনো ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিলো সে, 'আমি তোমার মেশিনে চড়তে চাই।' ইতোমধ্যে ট্যাংকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে, প্রকৃত পক্ষে ট্যাংক বহর আর তার ক্যাপটেনের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে তার।

মানসিক সুস্থতা ফিরে পাবার পর ক্যাপটেন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বদলেছে কাউন্ট। তাকে বহিষ্কার করেনি, আসমারায় ফেরত পাঠায়নি, ফ্যারিং স্কোয়াডের সামনেও দাঁড় করায়নি—লোকটার জন্যে আরো ভীতিকর একটা শাস্তির ব্যবস্থা করেছে সে। ক্যাপটেনের সার্ভিস রিপোর্টে দু'পৃষ্ঠা জুড়ে অভিযোগ আর দুর্নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বলা হয়েছে এর মতো অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেয়াদপ, কাপুরুষ ক্যাপটেন জীবনে কখনো দেখেনি কাউন্ট। কাউন্ট জানে, লোকটার ক্যারিয়ার ধ্বংস করার জন্যে এই রিপোর্ট জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করবে। মনের মতো প্রতিশোধ নিতে পেরে তৃপ্তি বোধ করেছে সে, তবে ট্যাংক সম্পর্কে তার আর কোনো আগ্রহ নেই। এখন তার অধীনে একটা প্লেন পাঠানো হয়েছে। প্লেনে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা অত্যন্ত উত্তেজনক আর রোমান্টিক অভিজ্ঞতা হবে, সন্দেহ কি!

'এনিমি পজিশনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবো আমরা,' আবার বললো কাউন্ট, 'মাটি থেকে যথেষ্ট ওপর থাকবো, সম্মানসূচক, একটা দূরত্ব অবশ্যই থাকা উচিত।' আসলে সে বলতে চাইছে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে ঝাঁকতে হবে প্লেনটাকে।

'পরে,' বললো এন্টোলিনো, তার কথার মধ্যে এমন কর্তৃত্বের সুর ফুটলো যে মর্যাদাসচেতন কাউন্টের শিরদাঁড়া ঝট করে খাড়া হয়ে গেলো। লোকটার দিকে কটমট করে তাকালো সে।

'জেনারেল বাদোগ্লিওর ব্যক্তিগত বার্তা বহন করছি আমি,' বললো রাজনৈতিক উপদেষ্টা, কাউন্টের আগুনে দৃষ্টি গ্রাহ্যই করলো না।

কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেলো কাউন্ট আর তার মর্যাদাবোধ। 'তাহলে এক গ্রাস ওয়াইন,' বিড়বিড় করে বললো সে, এন্টোলিনোর হাত ধরে অপেক্ষারত রোলস-রয়েসের দিকে এগোলো।

‘জেনারেল এই মুহূর্তে আমবা আবাদামের সম্মুখে অবস্থান করছেন। হেভি আর্টিলারি এবং বিমান আক্রমণের সহায়তায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন তিনি। সন্দেহ নেই, ফলাফল কী হবে।’

‘জী, তা বটে।’ একশ মাইল দূরে, উত্তরে যুদ্ধের কথা শুনে গলা শুকিয়ে গেছে তার।

‘আগামী দশদিনের মধ্যে পরাজিত ইথিওপিয় যোদ্ধারা ডেসি রোড ধ’রে লোক টানায়, সম্রাট হাইলে সেলাসির বাহিনীর সাথে একত্র হ’তে চাইবে। কিন্তু সারডি গিরিসংকট তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার দায়িত্ব নিশ্চই বুঝতে পারছেন।’

মাথা ঝাঁকালো কাউন্ট।

‘আমাদের মিত্র, যিনি আমাদের হয়ে ইথিওপিয়ার নেতা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করবেন, সেই রাস গোত্রের প্রধানের সাথে চূড়ান্ত কথাবার্তা বলতে এসেছি আমি। সে আর তার বাহিনী যদি আপনাকে সাহায্য করে, সারডি গিরিসংকট পেরিয়ে ডেসি রোডে যেতে চাওয়া ইথিওপিয় বাহিনীকে বাধা দেয়ার জন্যে আপনিও অ্যাডভান্স করতে পারবেন।’

‘আহ!’ না বুঝেই মাথা ঝাঁকালো কাউন্ট বেলিনি।

‘এবার শুনুন, রাস গোত্রপ্রধানের সাথে দেখা করার কি আয়োজন করা হয়েছে। কয়েকজন লোক আমার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে পাহাড়ে, তারাই তার সাথে দেখা করে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে। আমরা তাঁর সাথে দেখা করে প্রতিশ্রুতি অনুসারে সোনার বাস্তু হস্তান্তর করবো। আজ রাতেই বৈঠক। গাইড হিসেবে লোক আছে আমার সাথে। বৈঠকের স্থান ঠিক করা হয়েছে এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে, সন্ধ্যার পরপরই রওনা হবো আমরা মাঝরাতে বৈঠক, আশা করি সময়মতোই পৌঁছতে পারবো।’

‘ভেরি গুড,’ খুশি মনে বললো কাউন্ট। ‘সৈনিক বা ট্রাক যা লাগে সব আপনি নিয়ে যেতে পারবেন।’

ট্রাফিক পুলিশের মতো একটা হাত তুললো এন্টোলিনো। ‘মাই ডিয়ার কর্নেল, রাস গোত্রপ্রধানের সাথে দেখা করার জন্যে আমাদের যে প্রতিনিধিদল যাচ্ছে, আপনিই তার নেতৃত্ব দেবেন।’

‘অসম্ভব!’ এতো সহজে তার নতুন দর্শন বিসর্জন দিতে রাজি নয় কাউন্ট। ‘এখানে আমার কতো কাজ, আক্রমণের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে।’ সময়সীমা মধ্যরাত, স্থান বিপজ্জনক ডানাকিল মরু, কে জানে নতুন কি বিপদ ওত পেতে আছে ওখানে।

‘চুক্তিপত্রে আপনাকে সবই করতে হবে, সহযোগিতার এই নতুন দুয়ার খুলতে হলে আপনার শারীরিক উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, বুঝতে পারছেন না? আপনার ইউনিফর্ম গালাদের প্রভাবিত করবে-’

‘আমার কাঁধ!’ হঠাৎ ব্যথায় গুঁড়িয়ে উঠলো কাউন্ট। ‘এমন আঘাত পেয়েছি, ডাক্তার আমাকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছে! আমার বদলে আমার একজন অফিসার যাবে। ট্যাংক বহরের ক্যাপটেন। তার ইউনিফর্ম আমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।’

মাথা নাড়লো এন্টোলিনো। ‘না।’

‘তাহলে আমার একজন মেজরকে নিয়ে যান,’ প্রস্তাব দিলো কাউন্ট। ‘মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানি, লোকটা বাকচাতুর্য জানে বটে!’

‘না।’

‘জেনারেল বাদোগ্লিও বলেছেন, প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন আপনি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, রেডিও অপারেটরকে এখনি আসমারার সাথে যোগাযোগ করতে বলুন।’

দীর্ঘশ্বাস ফেললো কাউন্ট, হাঁ করলো, মুখ বন্ধ করলো আবার, মনে মনে ত্যাগ করলো ইতালিয়দের বাহিনীর পিছনে ওয়েলস অভ চান্ডির নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকার সংকল্প। ‘ঠিক আছে, ঈশ্বরের নামে সন্ধ্যার পর রওনা হবো আমরা।’

বোকার মতো আবার বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি নয় কাউন্ট। সন্ধ্যা-উত্তর লালিমার ভেতর চান্ডি থেকে রওনা হ’লো কনভয়, সামনে একজোড়া সিভি, থ্রি ট্যাংক থাকলো এসকর্ট হিসেবে, তার পিছনে চার ট্রাক ভর্তি সৈনিক, মাঝখানে রোলস-রয়েস, আর পিছনে থাকলো বাকি ট্যাংক দুটো।

রোলস-রয়েসে রয়েছে কাউন্টের দু’পাশে এন্টোলিনো আর তার গালা গাইড। কাঠের একজোড়া বাস্কের ওপর পা দিয়ে রেখেছে এন্টোলিনো। সামনের সিটের নিচে রয়েছে আরো দুটো বাস্ক, সিটের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে মাঝে মধ্যেই সেগুলোর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে সে। গাইড গালা লোকটার বয়স হবে তিরিশের মতো, গোত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সে-ও কুৎসিত কদাকার চেহারার অধিকারী, তার ওপর সারা মুখে ফোঁটা আকৃতি বসন্তের আর লম্বা আকৃতির কাটাকুটির দাগ, হিংস্র খুনীর পরিচয় আপনার থেকেই বেরিয়ে আসে। পড়নে সাদা আলখাল্লা, বছরখানেক বা তারও বেশি হ’লো ওটার রঙ কালো হয়ে গেছে। সিকি সেকেন্ড তার ঘ্রাণ নিলো কাউন্ট, পরমুহূর্তে সুগন্ধ মাখানো রুমালটা চেপে ধরলো নাকে। ‘লোকটাকে বলুন সে যেনো সামনের একটা ট্যাংকে গিয়ে বসে, ক্যাপটেনের সাথে,’ এন্টোলিনোকে বললো কাউন্ট। ‘গুইসেপ্পি, গাড়ি থামাও।’

রোলস-রয়েস দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখতে পেয়ে সামনের ট্যাংক জোড়াও থেমে গেলো। সিটের ওপর দাঁড়ালো কাউন্ট, সামনের একটা ট্যাংকের টারিটে ক্যাপটেনকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, ‘এদিকে এসো, তোমার কমান্ডার তোমাকে ডাকছে।’

ট্যাংক থেকে নেমে এলো ক্যাপটেন। ‘তোমাকে ছোট্ট একটা শাস্তি দিলাম, ক্যাপটেন,’ বললো কাউন্ট, পাশে বসা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখালো সে। ‘এ হ’লো একজন গালা, আমাদের গাইড। একে তোমার পাশে বসতে দিতে হবে।’ নির্দেশ দেয়ার সময় কাউন্টের চোখ জোড়া আত্মভৃগুিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো।

গালা গাইডকে নিয়ে ট্যাংকের টারিটে ফিরে গেলো ক্যাপটেন।

আলো না জ্বলে গাড়ি চালালো ওরা, প্রান্তর জুড়ে চাঁদের আলো থাকলেও দু’পাশের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের পাদদেশ অন্ধকারে ঢাকা। নির্দিষ্ট জায়গায় নিঃসঙ্গ একজন অস্থারোহী ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কাঁটাঝোপের কালো আকৃতির পাশে আরো কালো একটা ছায়ামূর্তি। অ্যামহারিক ভাষায় তার সাথে কথা হ’লো এন্টোলিনোর।

‘রাস গোত্র প্রধানের ভয়, তার সাথে বেস্‌মানী করা হ’তে পারে,’ কাউন্টকে বললো এন্টোলিনো। ‘এসকট এখানে রেখে লোকটার সাথে শুধু গাড়িটা নিয়ে যেতে হবে আমাদের।’

‘না!’ টেঁচিয়ে উঠলো কাউন্ট। ‘না! না! অসম্ভব! আমি রাজি হবো না!’

কাউন্টকে রাজি করাতে দশ মিনিট লাগলো, বার কয়েক জেনারেল বাদোগ্নিওর ভয় দেখানোয় কাজ হলো। এই দশ মিনিটে শুকিয়ে যেনো অর্ধেক হয়ে গেলো কাউন্ট, হাঁপাতে হাঁপাতে আবার রোলস-রয়েসে চড়লো সে। ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু পাহাড়ী পথ ধ’রে ধীর গতিতে এগোলো গাড়ি। আধ ঘন্টা এগোবার পর পাথর ছড়ানো ঢালের নিচে থামতে হ’লো গুইসেস্লিকে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। আরো পাঁচ মিনিট ব্যয় হ’লো কাউন্টকে রাজি করাতে। কাঠের দুটো বাস্ক রশি দিয়ে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে রাখা হলো, বাকি দুটো কাঁধে তুলে নিলো গুইসেস্লি আর জিনো। ছোট্ট দলটার মাঝখানে থাকলো কাউন্ট, হাতে পিস্তল। হেঁচট খেতে খেতে এগোলো ওরা।

এঁকেবঁকে উঠে গেছে পাহাড়ী পথ, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় পা ফেলতে সামান্য ভুল করলে সরাসরি চির খাদে পড়তে হবে। পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে তাকলো কাউন্ট, এন্টোলিনো তার একটা হাত ধ’রে আছে। খোলা, চওড়া একটা জায়গায় উঠে এলো ওরা, সামনে পিরিচ আকৃতির একটা বিশাল গর্ত, গর্তের কিনারায় কুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে কালো ভূতের মতো প্রহরীরা। গালাদের সম্পর্কে, তাদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে কাউন্ট, ভাগ্যের ফেরে তাদের মাঝখানে পড়তে হবে তাকে, ঘৃণাক্ষরেও কখনো ভাবেনি সে। পায়ে জোর পেলো না, ধড়ফড় করে উঠলো বুক। ইচ্ছে হ’লো ব’সে পড়ে, কিন্তু এন্টোলিনো তাকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। ভূতগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাদের শুধু চোখের সাদা অংশ দেখা যায়, বাকিসব অন্ধকারের সাথে মিশে আছে। ঢাল বেয়ে পিরিচের ভেতর নামলো ওরা।

নিচে খোলা মাঠে লাল কার্পেটের ওপর অনেকগুলো তাকিয়া, সেগুলোর মাঝখানে বহরঙা সিল্কের আলখান্ধা পরে বিশালকায় এক লোক আধশোয়া ভঙ্গিতে ব’সে রয়েছে, তার মাথার পিছনে কাঠের দুটো নিচু স্তম্ভের মাথায় জ্বলছে একজোড়া প্যারাক্সিন

ল্যাম্প। তার দু'পাশে বসেছে দুই যুবতী, কোমরের ওপর স্বর্ণালংকার ছাড়া কোনো আবরণ নেই। প্রথমেই কাউন্টের চোখ পড়লো মেয়ে দুটোর বুকের ওপর। অন্য কোনো পরিস্থিতি হলে নিজেকে চাঙা হয়ে ওঠায় অনুমতি দিতো সে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সে প্রশ্ন ওঠে না—এখনকার জরুরি কাজটা হ'লো পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে শিফা বাহিনীর যতটা সম্ভব পিছনে ফিরে যাওয়া।

'ইতালির সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তি ইনি,' আদিবাসী নেতার সামনে কাউন্টকে নিয়ে বসলো এন্টোলিনো, পরিচয় করিয়ে দিলো। 'রাস কুল্লাহ, গালা গোত্রের অধিপতি।' কাউন্ট দেখলো, গালা প্রধানের একেকটা আঙুল সাগরকলার মতো মোটা, প্রতিটি আঙুলে পাথর বসানো সোনার আঙটি। কাউন্টকে দেখে, কেনো কে জানে, হেসে গড়িয়ে পড়লো মেয়ে দুটো। রাস কুল্লাহ তাদের নগ্ন উরুতে সশব্দ থাবা মেরে চূপ করালো।

অ্যামহারিক ভাষায় রাস কুল্লাহ বললো, 'খোশ আমদেদ।'

এন্টোলিনোকে হুকুম করলো কাউন্ট, 'যথোপযুক্ত জবাব দিন!' তার কণ্ঠস্বর কর্কশ।

দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করলো এন্টোলিনো। তার কথায় কান না দিয়ে একদৃষ্টে কাউন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো রাস কুল্লাহ গালা। কাউন্টের কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে তার মনে হলো, কর্নেল অত্যন্ত বদমেজাজী, সত্যিকারের বীরযোদ্ধারা যেমন হয়ে থাকে। কাউন্টের চেহারা, ল্যাম্পের আলোয়, থমথমে লাগলো তার চোখে—শক্তিমান পুরুষের নমুনা। কর্নেলের কালো ইউনিফর্মে লটকে থাকা মেডেল, পদক আর ব্যাজগুলো গুণতে শুরু করে শেষ করতে পারলো না সে। শুনতে পেলো কাউন্ট ক্রোবোন্সুওঁর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সব মিলিয়ে সাংঘাতিক প্রভাবিত হ'লো রাস কুল্লাহ গালা।

এরপর ল্যাম্পের আলোয় উদয় হ'লো ঘোড়সওয়ারের পিছু পিছু গুইসেপ্লি আর জিনো, সঙ্গে একজন প্রহরী, প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে কাঠের বাস্ক। বাস্কের ভারে প্রত্যেকের শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে আছে। বাস্কগুলো গালা প্রধানের সামনে নামানো হলো।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো রাস কুল্লাহ, সাথে সাথে থেমে গেলো এন্টোলিনোর বক্তৃতা। কাপেটের বাইরে অন্ধকার, অন্ধকার থেকে বহু লোকের গুঞ্জন ভেসে আসছে, সেদিকে ভয়ে ভয়ে বারবার তাকাচ্ছে কাউন্ট। রক্ত হিম করা আরেকটা চিৎকার বেরিয়ে এলো গালাপ্রধানের গলা থেকে, সাথে সাথে বহুলোকের গুঞ্জনও এবার থেমে গেলো। ফিসফাস থামলো, তবে অদৃশ্য ভিড়টা এগিয়ে এলো কার্পেটের আরো কাছাকাছি, কারণ গোত্রপ্রধানের দেহরক্ষীরা কাঠের বাস্ক খুলতে শুরু করেছে।

দড়িদড়া খোলা হলো। এরপর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো নুল আয়াঙ, কোমরের ছোঁরা বের করে সামনে এগোলো সে, ছোঁরার ডগা দিয়ে একটা বাস্কের ডালা তুললো।

বাস্ক ভর্তি সোনার বার দেখে দপ করে জুলে উঠলো তার চোখ। কয়েক সেকেন্ড নড়লো না সে, তারপর হাত দুটো লম্বা করে দিলো সে, দুই মুঠোর সোনার কয়েকটা বার নিয়ে ছুঁড়ে দিলো অন্ধকারে। গালাদের মধ্যে ছড়োছড়ি শুরু হলো।

উঁকি মেরে কাউন্টও বাস্কের ভেতরটা দেখলো একাবর। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তার সম্পত্তির পরিমাণ কম নয়, তবু এক সাথে এতো সোনা দেখে মাথাটা একবার ঘুরে উঠলো। ‘এ তো সাত রাজার ধন!’ বিড়বিড় করলো সে। ‘আর পাচ্ছে কিনা একটা অসভ্য জল্লাদ!’

নিচু গলায় এন্টোলিনো বললো, ‘কিন্তু ভেবে দেখুন, যুদ্ধ শেষ হলে আপনি কি পাচ্ছেন। গোটা ফ্রান্সের সমান ভূখন্ড!’

থপ থপ পা ফেলে নিজের জায়গায় ফিরে এলো রাস কুল্লাহ, গদিতে ব’সে তাকিয়ায় হেলান দেয়ার বদলে হেলান দিলো কাউন্টের গায়ে, তার কাঁধে আধ মন ওজনের একটা চাপড় মেরে খ্যাক খ্যাক করে হাসলো কিছুক্ষণ, অপর হাতটা দিয়ে মেয়েদের একজনের ঘাড় ধরলো, তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নামিয়ে আনলো কাউন্টের কোলের ওপর। ‘এটা আপনার,’ ক্যামহারিক ভাষায় ঘোষণা করলো সে।

‘যথোপযুক্ত জবাব দিন,’ এন্টোলিনোকে নির্দেশ দিলো কাউন্ট।

সে থামার পর এন্টোলিনো কাউন্টকে বললো, ‘উনি আধুনিক রাইফেল আর মেশিনগান চাইছেন।’

কোলে গালা যুবতীকে নিয়ে কাউন্ট প্রশ্ন করলো, ‘আমাদের পজিশন কি?’

‘অবশ্যই তাঁকে আমরা ও-সব দিতে পারি না। এক মাস, কিংবা এক বছর পর উনি আর আমাদের মিত্র নাও থাকতে পারেন। গালাদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই।’

‘যথোপযুক্ত জবাব দিন।’

‘উনি আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়তা দাবি করছেন যে আদিবাসীদের স্পাই মেয়েটা আর বিদেশী দুই সন্ত্রাসবাদী গ্রেফতার হওয়ামাত্র ওঁর হাতে তুলে দিতে হবে।’

‘আপত্তি করার কোনো কারণ আছে কি?’

‘ওঁর হাতে তুলে দিলেই বরং বেঁচে যাই আমরা, ওদের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হৈ-টচ শুরু হলে বলতে পারবো, আমরা কিছু জানি না?’

‘কিন্তু ওদেরকে তার এতো কেনো দরকার? ওরা তো বরং আমার বীর যোদ্ধাদের টরচার করেছে, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বন্দীদের! ওদের শাস্তি দেয়ার অধিকার একা আমার...।’

‘শাস্তির কথা যদি ওঠে, আপনার চেয়ে বরং উনিই ভালো দিতে পারবেন। উনি যে শাস্তি দেবেন, দুঃস্বপ্নেও আপনি তা কোনো দিন দেখবেন না।’ রাস কুল্লাহ’র দিকে ফিরলো সে, ক্যামহারিক ভাষায় জানালো, ‘আমরা কথা দিলাম, ওদেরকে আপনার হাতে তুলে দেয়া হবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওদের নিয়ে যা খুশি করতে পারবেন আপনি।’

কালো আর মোটা ঠোঁট প্রসারিত করে হাসলো রাস কুল্লাহ, জিভ বুলালো ঠোঁটের উপর দিয়ে।

ইতোমধ্যে রাস কুল্লাহ তাকে কামড়ে বা খামছে দেয়নি দেখে, ধীরে ধীরে তার সাহস ফিরে আসতে শুরু করেছে। এন্টোলিনোকে সে বললো, ‘রাস প্রধানকে বলুন,

বিনিময়ে আমার কিছু তথ্য দরকার। শত্রুপক্ষের শক্তি কতোটুকু জানতে চাই আমি—রাইফেল আর মেশিনগানের সংখ্যা, লোকবল, গিরিসংকটে ঢোকার মুখে ক’টা আর্মারড কার রয়েছে। জানতে চাই ট্রেন্ডগুন্ডলার পরিশন, স্ট্রিং পয়েন্ট, আর বিশেষ করে, রাস কুল্লাহ’র বাহিনী এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছে।’ আঙুলের গিট গুণে প্রতিটি বিষয় উল্লেখ করেছে সে, মাথা একদিকে কাত করে গভীর মনোযোগের সাথে তার কথাগুলো গিলছে রাস কুল্লাহ।

‘ফাঁদে ফেলতে হলে টোপ দিতে হবে?’ প্রশ্ন করলো গ্যারেথ সোয়েলস। ‘হ্যাঁ, তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।’

প্রিসিলার ছায়ায় পাশাপাশি উবু হয়ে ব’সে রয়েছে ওরা, জেকের হাতে ছোটো একটা শুকনো ডাল সেটা দিয়ে বালির ওপর ম্যাপ আঁকছে সে, গ্যারেথের সাথে আলোচনা করছে ইতালিয়দের নতুন শক্তিকে কিভাবে ঠেকানো যায়।

‘অশ্বরোহী পাঠিয়ে কোনো লাভ হবে না। একবার কাজ হয়েছে, দ্বিতীয়বার আশা করা বোকামি হবে।’

কথা বললো না গ্যারেথ, জেকের আঁকা জটিল ম্যাপটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো।

‘ট্যাংক কমান্ডারকে ওষুধ যা দেয়ার দেয়া হয়েছে। এরপর আর্মারড কারের ছায়া দেখলেই হয়, তেড়ে আসবে ঠিক তোমার পোষা...।’

‘হ্যাঁ, জানি।’ গ্যারেথলে হাসছে না।

‘আমরা একটা কার পাঠাবো—এখানে।’ বালির ম্যাপে আঙুল রাখলো সে। ‘প্রথম কারটা যদি কোনো বিপদে পড়ে বা....।’

‘যদি হাই-এক্সপ্লোসিভ একটা শেল গুটাকে গুঁড়িয়ে দেয়, বলতে চাইবো?’

‘ঠিক তাই। তা যদি ঘটে, দ্বিতীয় কারটা গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠবে, আর গুটার দিকে ধেয়ে আসবে ওরা।’

‘পানির মতো সোজা, ওল্ড চ্যাপ, কোনো ব্যাপারই না। প্রতিভা গ্যারেথ সোয়েলসের প্রতিভার ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে আমার।’

‘প্রথম কারে কে থাকবে?’ জিজ্ঞেস করলো জেক।

‘এসো টস করি,’ প্রস্তাব দিলো গ্যারেথ, রূপালী মুদ্রাটা ভোজবাজির মতো বেরিয়ে এলো তার হাতে, জেক হেড বলায় আঙুলের টোকা দ্বিগুণে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলো সে, সশব্দে দু’হাতের তালু এক করে ধ’রে ফেললো।

এক করা তালু খুললো গ্যারেথ। ‘তোমার কপাল খারাপ, ওল্ড চ্যাপ। হেডসই বটে।’

আফ্রিকার মামবা সাপের মতো ছোবল মারলো জেকের হাত, গ্যারেথের কজি চেপে ধরলো ও।

‘কি হলো!’ প্রতিবাদ জানালো গ্যারেথ। ‘তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না যে আমি....’ অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে।

‘নো অফেন্স,’ আশ্বস্ত করলো জেক গ্যারেথের হাতটা টেনে নিলো নিজের দিকে, তালুতে রাখা মুদ্রাটা পরীক্ষা করলো এপিঠ-ওপিঠ।

‘পয়সার গায়ে ওটা কার ছবি আমি জানি না,’ সহাস্যে বললো গ্যারেথ। ‘কিন্তু তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, খাসা একখানা মাল, কি? ঠোঁটের হাসিটা দেখছো? যেন, চুমো খেতে বলছে...।’

জেক তার কজি ছেড়ে দিলো, ঠিকই আছে মুদ্রা। ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, অপ্রতিভ ভাবটা লুকোবার জন্যে হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়লো। ‘চলে এসো, গ্রেগোরিয়াস,’ ডাকলো ও। ‘আমরা বরং এখনি তৈরি হয়ে নিই।’ ওদিকে প্রস্তুতি চলছে, তার তদারকিতে ব্যস্ত গ্রেগোরিয়াস মারিয়াম, নিজের দায়িত্ব আরেকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে পা বাড়ালো জেকের দিকে।

‘গুড লাক, ওল্ড চ্যাপ,’ জেকের পিছন থেকে বললো গ্যারেথ। ‘মাথা নিচু করে রেখো।’

টারিটের কিনারায় ব’সে হ্যাচের ভেতর পা ঝুলিয়ে দিয়েছে জেক, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে পাহাড়গুলোর দিকে। ওগুলোর শুধু নিচের ঢাল দেখা গেলো; খাড়াভাবে উঠে হারিয়ে গেছে। ওগুলোর শুধু নিচের ঢাল দেখা গেলো খাড়াভাবে উঠে হারিয়ে গেছে আকাশ-ছোঁয়া, দিগন্ত বিস্তৃত ঘন কালো মেঘের ভেতর।

ধীরে ধীরে গোটা আকাশ দখল করে নিচ্ছে মেঘ। ডানাকিল মরুতে প্রবেশ করার পর এই প্রথম অদৃশ্য হ’লো সূর্য। মেঘ থেকে হিম বয়ে নিয়ে এলো ঝড়ো বাতাস, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো জেকের।

ওর পাশে টারিটে ব’সে রয়েছে গ্রেগোরিয়াস, কালো মেঘের দিকে চোখ। ‘তুমুল বৃষ্টি হবে।’

‘এদিকে?’

‘নাহ। তবে পাহাড়গুলো একেবারে ভেসে যাবে।’

মেঘেদের নড়াচড়া দেখে জেকের মনে হলো, ওখানে যেনো ব্যাপক রণ-প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণ পর সেদিকে পিছন ফিরলো ও, তাকালো পূব দিকে। বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে খানক পর পর এক আধটা গাছ বা কাঁটারোপ কোনো প্রানী নেই, কিছুই নড়ছে না। স্কাউটারা রিপোর্ট করেছে, ইতালিয়রা অ্যাডভান্স করবে। কিন্তু তার কোনো আলামত চোখে পড়লো না। আবার গুরলো জেক, চোখে বাইনোকুলার তুলে

গিরিসংকটের নিচে ঢালগুলোয় দৃষ্টি বুলালো, ওদিক থেকে শত্রুক্ষের গতিবিধি টের পেলে সঙ্কেত দিয়ে জানাবে গ্যারেথ। পাথরের বিশাল স্তূপ আর অসংখ্য চার ছাড়া দেখার কিছু নেই।

অনুসন্ধানী দৃষ্টি আরো নিচে নামিয়ে আনলো জেক, পাহাড়শ্রেণীর পাথুরে বিস্তৃতির পর ছোটো ছোটো লার বালিয়াড়ি মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে, যেনো স্থির হয়ে আছে অসংখ্য ঢেউ। প্রান্তরের মাটি ওদিকে আঁচড়ানো, কোঁচকানো; কর্কশ ঘাসে মোড়া, তারপর শুরু কয়েক শো আদিবাসী অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। জেক জানে, এই মুহূর্তে ধৈর্যের সাথে কর্কশ মাটির ওপর শুয়ে রয়েছে তারা।

গোটা প্ল্যানটা গ্যারেথের। শুধু টোপ দিয়ে ইতালিয়দের ট্যাংকগুলোকে ফাঁদে ফেলা নয়, সেগুলোকে কিভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হবে সে বুদ্ধিও ওরা মাথা থেকে গজিয়েছে।

থ্রেগোরিয়াসের নেতৃত্বে একশো আদিবাসী আর পঞ্চাশটা উট সারডি শহর থেকে ঘুরে এসেছে। রেল স্টেশনের শান্টিং ইয়ার্ড থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে মরুভূমিতে নামিয়ে আনা রয়েছে অনেকগুলো লম্বা আর ভারি স্টীল রেইল।

রেইলগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেছে জেকর কাছ থেকে। প্রতিটি ফ্রন্টে বিশজন লোক রেখেছে সে, রেইল নিয়ে ট্রেনিংও দিয়েছে তারা। এখন শুধু দেখতে হবে ইতালিয়রা উদয় হয় কিনা, উদয় হলে তাদের ট্যাংকগুলোকে জেকের প্রিসিলা নিচু বালিয়াড়ির দিকে টেনে আনতে পারে কিনা।

আর্মার-এর সাহায্য ছাড়া, গ্যারেথের ধারণা, ইতালিয়দের ওরা এক হপ্তা আটকে রাখতে পারবে গিরিসংকটের মুখে। ওদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আয়োজনে হারারিরা পজিশন নিয়েছে বাঁ দিকে আর মাঝখানে, আর গালার পজিশন নিয়েছে ডান দিকে। ডিকার্স মেশিনগানগুলো এমন পজিশনে রাখা হয়েছে, আর্মারড কাভার ছাড়া ইতালিয়রা এগুতে চেষ্টা করলেই শয়ে ময়ে মারা পড়বে।

গিরিসংকটে ঢুকতে হলে কামান আর বোমারু বিমানের সাহায্য পেতে হবে তাদের।

গিরিসংকটের মুখ দখল করা এক কথা, ভেতরে ঢুকে এগুতে পারা সম্পূর্ণ অন্য কথা। প্রতিটি বাকি অ্যামবুশ পাতা আছে, নিরাপদ আড়াল থেকে ইতালিয়দের ওপর পাথর আর গুলিবর্ষণ করবে আদিবাসীরা। তবে শেষ পর্যন্ত ইতালিয়রা সারডি শহরে পৌঁছতে পারবে, কারণ সংখ্যায় তারা আদিবাসীদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু ততে আরো সাতদিন সময় লাগবে।

গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে সারডিতে ইতালিয়রা পৌঁছবার পর কি ঘটবে সবাই তা জানে, কিন্তু কেউ আলোচনা করতে চায় না। এক কি দু'দিন হয়তো আর্মারড কারের সাহায্যে তাদেরকে গিরিসংকটের মুখে আটকে রাখতে পারবে জেক, তার বেশি নয়। সারডি দখল করার পর ইতালিয়রা দ্রুতগতিতে ডেসি রোডের দিকে ছুটবে—তাদের চোয়াল বন্ধ করার জন্যে। কার ভাগ্যে কি ঘটবে তা নির্ভর করবে কে পালাতে পারবে আর কে পারবে না তার ওপর।

পরিস্থিতি ও আয়োজন সম্পর্কে সবই প্রিন্স লিজ মিখায়েলকে আদিসআবাবায় টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছে। ইথিওপিয় সম্রাটের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উত্তর পাঠিয়েছে প্রিন্স, আশ্বস্ত করে বলেছে, দুই সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যাবে।

‘আরো দুই সপ্তাহ গিরিসংকটের দখল বজায় রাখুন, এরপর আপনাদের দায়িত্ব শেষ। সম্রাট এবং ইথিওপিয়ার জনসাধারণ চিরজীবন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।’

তার মানে মরু প্রান্তরে আরো এক হপ্তা টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। তা সম্ভব কিনা নির্ভর করছে লিফটাদের আর্মার এর সাথে প্রথম সংঘর্ষটা কি পরিণতি দাঁড়ায় তার ওপর। জেক আর গ্যারেথের হিসেবে, স্কাউটদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারেও বটে, শিফটদের ট্যাংকের সংখ্যা চারটে। একটা মাত্র আঘাতে চারটেই অচল করে দিতে হবে ওদের, গিরিসংকটের গোটা প্রতিরক্ষা এই একটি বিষয়ের ওপর ঝুলে আছে।

এক সময় জেকের মনে হলো, দিবাস্বপ্ন দেখছে সে। অপত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটতে পারে, হিসেবের মধ্যে যেগুলো ধরা হচ্ছে না। ওর কাঁধে একা হাত রাখলো শ্বেগোরিয়াস।

‘জেক! সংকেত!’

ঝট করে পাহাড়ী চালগুলোর দিকে তাকালো জেক, চোখে বাইনোকুলার তোলার দরকার হ’লো না। টয়লেট ব্যাগ থেকে শেভিং মিরর বের করে সাথে রেখেছে গ্যারেথ, হেলিয়োগ্রাফের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে স্কুদে আয়নাটা। অতো দূর থেকেও আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন জেকের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

‘উপত্যকা ধ’রে এগিয়ে আসছে ওগুলো, পাশাপাশি চারটে ট্যাংক সাপোর্ট হিসেবে রয়েছে ট্রাক ভর্তি পদাতিক বাহিনী।’ সংকেত পড়া শেষ করলো জেক, হ্যাচ গ’লে ঝুপ করে নেমে গেলো প্রিসিলার ড্রাইভিং সিটে, একই সাথে লাফ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেলের সামনে পড়লো শ্বেগোরিয়াস।

‘দ্যাট’স মাই ডালিং!’ প্রিসিলার এঞ্জিন জ্যাস্ত হয়ে উঠতেই ধন্যবাদ দিলো জেক, শ্বেগোরিয়াস হ্যাচ গ’লে টারিটে উঠে আসতেই তাকে বললো, ‘ঘোরার সময় প্রতিবার জানানো তোমাকে।’

‘ইয়েস, জেক।’ ছেলেটার চোখ দু’টুকরো অঙ্গারের মতো জ্বলছে দেকে নিঃশব্দে হাসলো জেক।

‘দাদার মতোই রক্তপিপাসু!’ ক্লাচ ছেড়ে দিरो ও। প্রিসিলার গতি দ্রুত বাড়লো, ঢালের নিচে থেকে কিনারা পেরিয়ে উঠে এলো ওরা, খোলা প্রান্তরে ধুলোর মেঘ উঠে দুনিয়ার সবাইকে জানিয়ে দিলো ওদের অস্তিত্ব।

ইতালিয়দের ট্যাংকের রেখাটা সোজা ওদের দিকে ছুটে আসছে, ওদের পাশে দেড় মাইল দূরে এখনো ।

‘ঘুরছি,’ সতর্ক করলো জেক ।

পাল্টা চিৎকার করে গ্রোগোরিয়াস জানালো, ‘রেডি!’ টারিটের ওপর, ভিকার্স মেশিনগানের পিছনে উবু হয়ে বসে রয়েছে সে, মেশিনগানের মাজল বরাবর ট্যাংকগুলোকে পেলেই গুলি করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ।

দ্রুত, বন বন করে হুইল ঘোরালো জেক । দূরবর্তী গাড় রঙের পোকা আকৃতির ইতালিয়দের আর্মার-এর দিকে ঘুরে গেলো প্রিসিলা, সরাসরি ওগুলোর দাঁত লক্ষ্য করে ছুটলো ।

জেকের মাথার ওপর গর্জে উঠলো ভিকার্স, খালি কার্তুকগুলো পাথর বৃষ্টির মতো নেমে এলো হ্যাচ গলে, ঠন ঠন আওয়াজ করলো ইস্পাতের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, পোড়া করডাইটের আকস্মিক ঝাঁঝে চোকের চোখে পানি বেরিয়ে এলো ।

চোখ পিট পিট করে জেক দেখলো বিদ্যুৎ-সাদা ট্রেসার খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে ছুটছে । সামনের একটা ট্যাংকের কাছাকাছি পড়লো সেটা । প্রায় দেড় মাইল দূরে হলেও, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে লাফিয়ে ওঠা ধুলোর ক্ষুদ্রে ঝর্ণাগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেলো ও । ‘গুড বয়!’ গ্রোগোরিয়াসের প্রশংসা করলো, কারণ প্রিসিলা অনবরত ঝাঁকি খাওয়া সত্ত্বেও এতা দূর থেকে লক্ষ্যভেদে প্রায় সফল হয়েছে সে । অবশ্য সিভি, থ্রির মোটা আর্মার ভেদ করতে পারবে না বুলেটগুলো, তবে কোনো সন্দেহ নেই ক্রুদের খেপিয়ে তুলতে পারবে, প্ররোচিত করতে ধাওয়া করে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে ।

ঘটলোও ঠিক তাই । কমাণ্ডার টার্গেটের দিকে লক্ষ্য স্থির করার নির্দেশ দেয়ায় ট্যাংকটার টারিট ঘুরে গেলো । স্প্যাডাউ এর মোট ব্যারেল দ্রুত খাটো হলো, তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো, সরাসরি ওটাল মাজল-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেক ।

ধীরে ধীরে তিন পর্যন্ত গুনলো ও । ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করে তৈরি তে তার বেশি সময় লাগবে না । তারপই ওরা চেষ্টায়ে উঠলো, ‘ঘুরছি ।’

দ্রুত হুইল ঘোরালো জেক, ফলে দুই চাকার ওপর সচল থাকলো প্রিসিলা, শত্রুদের সামনে থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে । চোখের কোণে মাজল ফ্ল্যাশ-এর আভা দেখতে পেলো ও, প্রায় পরমুহূর্তেই পাশ ঘেঁষে ছুটে যাওয়া শেলের গর্জন শুনতে পেলো ।

‘সান অভ আ গান-দ্যাট ওয়াজ ক্রোজ!’ বিড়বিড় করলো ও, ভাইজর আর হ্যাচ খোলার জন্যে হাত তুললো । বন্ধ প্রিসিলার ভেতর থাকায় কোনো লাভ নেই, আর্মারড কারের যে-কোনো অংশ পাতলা কাগজের মতো ছিঁড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে স্প্যাডাউ । বিপজ্জনক শেষ মুহূর্তগুলোয় দৃষ্টিসীমা বরং অব্যবহৃত থাকা দরকার ।

ইতালিয়দের লাইনের সাথে সমান্তরাল রেখায় ছুটছে প্রিসিলা, পাশে তাকিয়ে জেক দেখলো চারটে ট্যাংকই এখন ফায়ার করছে, তবে এবড়োখেবড়ো মাটিতে ঝাঁকি খাচ্ছে

সব ক'টা। প্রিসিলার দিকে ঘোরার জন্যে দিক বদলাতে বাধ্য হয়েছে ওগুলো, পদাতিক বাহিনীকে পিছনে রেখে এগিয়ে আসতে হয়েছে লাইনের বাইরে, দ্রুত ধাবমান প্রিসিলাকে ধাওয়া করবে নাকি থেকে শেল ছুঁড়বে সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তর করার মন্ত্র হয়ে পড়েছে গতি। চারটে ট্যাংক, প্রায়ই একটার সামনে পড়ে যাচ্ছে আরেকটা।

‘আয় শালারা!’ বিড়বিড় করলো জেক। ‘যুদ্ধের সাধ তোদের মিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি,’ বিপজ্জনক এই মুহূর্তেও নিঃশব্দে হাসছে জেক।

কাঝেই একটা শেল বিস্ফোরিত হলো, বালি আর কাঁকর বৃষ্টি হ'লো হ্যাচের ভেতর। এতোক্ষণে সঠিক রেঞ্জ আন্দাজ করতে পেরেছে ইতালিয়রা। যে কোনো পরবর্তী শেল আর্মারড কার ভেদ করতে পারে। একটা কিছু করা দরকার।

মুখ থেকে বালি ফেলে চিৎকার করলো জেক, ‘ঘুরছি! গুলি চালাও!’

সাবলীলভাবে ইতালিয়দের লাইনের দিকে ঘুরে গেলো প্রিসিলা। চোখ ভরা অবিশ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে ইতালিয়রা দেখলো ওদের দিকে তেড়ে আসছে আর্মারড কার।

মাঝখানের দূরত্ব ভয়ানক কমে এলো। একনাগাড়ে গুলি করছে গ্রেগোরিয়াস। ইতালিয়দের লাইন এতো কাছে চলে এসেছে যে সামনের ট্যাংকটার গায়ে ভিকাস বুলেটের মাতা ঠোকার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেলো রা। বাঁকের প্রথম ট্যাংকটাকে বেছে নিয়েছে গ্রেগোরিয়াস, ওটাতেই রয়েছে বহরের কমান্ডার।

‘ঠিক,’ বিড়বিড় করে সায় দিলো জেক, ‘ব্যাটার রক্ত গরম করে তোলো...’ থেকে গেলো জেক, মাথার কাছে বজ্রপাতের মতো বিকট আওয়াজ হয়েছে, যেনো কোনো দানব হাজার মন ওজনের একটা হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরেছে ইস্পাতের খোলে—প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আরেক দিকে ছুটলো প্রিসিলা, চাকাগুলো ঘুরে গেছে।

‘শেল লেগেছে!’ ভাবলো জেক, মুখে গেছে ঠোঁটের হাসি। বিকট শব্দে কানে তাল লেগে গেছে ওর, পোড়া রঙ আর গরম ধাতুর উৎকট গন্ধ পেলো নাকে। ভয়ে ভয়ে ছইল ঘোরালাও, পরম স্বস্তি বোধ করলো প্রিসিলা ঘুরতে শুরু করায়। ইতালিয়দের লাইনের দিকে পিছন ফিরলো আর্মারড কার।

নিজের কমপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে পড়লো জেক, বাইরে মাথা বের করেই বুঝলো ভাগ্য কতোটুকু সহায়তা করেছে ওদের। ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে গাড়ির মাথায় একটা লোহার আঙটা লাগিয়েছিল ও, অ্যামুনিশনের বাস্ক রশি দিয়ে বাঁধার জন্যে, শেল সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। খোলের গায়ে দাঁতে বমিখায়েলও, ফুটো করতে পারেনি।

‘তুমি ঠিক আছো, গ্রেগোরিয়াস?’ নিজের সিটে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো জেক।

‘ওরা পিছু নিয়েছে, জেক,’ পাল্টা চিৎকার করে জানালো গ্রেগোরিয়াস, আঘাতটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। ‘ধাওয়া শুরু করেছে—ওরা সবাই।’

‘ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছি—এই রওনা হলাম!’ বললো জেক, ইতালিয়দের দিকে আগেই পিছন ফিরেছে প্রিসিলা, এবার গুলি বাড়িয়ে একেবেকে ছুটলো—রেঞ্জ আর লক্ষ্য বদলাতে বাধ্য হবে ইতালিয়দের গানাররা।

শেলের বিরতিহীন বিস্ফোরণ ক্রমশ কাছে এগিয়ে এলো, তবে একটাও প্রিসিলাকে ছুঁতে পারলো না। প্রতিটি বিস্ফোরণের সাথে কঁপে উঠলো ওরা।

‘অনেক দূরে চলে আসছি আমরা, জেক,’ হাঁক ছেড়ে বললো থ্রেগোরিয়াস, ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই জেক দেখতে পেলো নিজের অজান্তেই কখন যেনো হ্যাচ খুলে মাতাটা বাইরে বের করে রেখেছেও।

‘আহত পাখি.’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বললো জেক। ইতালিয়দের কাছ থেকে বেশি দূরে সরে এলে, সমূহ আশংকা আছে ধাওয়া বাদ দিয়ে নিজেদের পথে ফিরে যাবে তারা।

পাশে, কাছাকাছি আরেকটা শেল বিস্ফোরিত হলো, ম্লান ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেলো আর্মারড কার, এই সুযোগে জেক বাণ করলো আহত হয়েছে ওরা—থ্রটলের ওপর থেকে চাপ কমালো, ফলে নাটকীয়ভাবে মন্তর হ’লো প্রিসিলার গতি, এঁকেবঁকে এগোবার মধ্যে কোনো নিয়মিত প্যাটার্ন থাকলো না, ডানা ভাঙা পাখির মতো ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে।

‘কাছে চলে আসছে এবার,’ উল্লাসে চোঁচিয়ে উঠলো থ্রেগোরিয়াস।

‘এতো খুশি হবার কিছু নেই,’ বিড়বিড় করলো জেক, কান ঘেঁষে ছুটে যাওয়া একটা শেলের গর্জনে চাপা ডে গেলো ওর কথা।

‘এখনো ওরা আসছে, দূরত্ব কমে যাচ্ছে!’ জেককে সাবধান করলো থ্রেগোরিয়াস। ‘এখনো ফায়ার করছে।’

‘জানি!’ প্রিসিলার সাথে নির্দয় ব্যবহার করছে জেক, ঘন ঘন এক দিক থেকে আরেক দিকে ঘোরালো চাকাগুলো। চোখ কুঁচকে সামনে তাকালো ও। ঢেউ আকৃতির প্রথম বালিয়াড়িটা আধ মাইল সামনে। কিন্তু সেটার কাছে পৌঁছতে মনে হ’লো এক যুগ পরিয়ে গেছে। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে মাটি, হেলে দুলে বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলো প্রিসিলা, ধুলো আর কাঁকরে স্তূপ বাতাসে উড়িয়ে আরেক দিকে নামতে শুরু করলো, ধাওয়ারত ইতালিয়দের ট্যাংকগুলো ওদেরকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না।

বালিয়াড়ি থেকে নামার সময় প্রিসিলাকে ঘুরিয়ে আড়াআড়ি পজিশনে নিয়ে এলো জেক, পিছলে নামতে দিলো গাড়িটাকে, তারপর হঠাৎ ব্রেক করে দাঁড় করালো। পিছু হটলো আর্মারড কার বালিয়াড়ির মাথার দিকে ঘুরে গেলো নাক, ধীরগতিতে আবার উঠতে শুরু করলো মাথার দিকে।

প্রিসিলার খোলটা বালিয়াড়ির আড়ালে থাকলো, চূড়ার ওপর জেগে থাকলো, শুধু টারিট।

‘সাবাস জেক, সাবাস।’ টারিটের ওপর দাঁড়িয়ে এক পাক নেচে নিলো থ্রেগোরিয়াস, সে তার ভিকার্স আবার শত্রুদের দিকে তাক করতে পারছে। বুপ করে ব’সে পড়ে থেমে থেমে গুলি ছুঁড়লে সে খোলা প্রান্তর ধ’রে চুটে আসা চারটে ট্যাংক লক্ষ্য করে।

বালিয়াড়ির পিছনে স্থির পজিশন থেকে গুলি করার প্রতিটি বিস্ফোরণের প্রতিটি বলেট ধয়ে আসা খোলগুলোয় গায়ে লাগাতে পারলো সে।

‘যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে,’ বললো জেক, আন্দাজ করলো এরপর নাকে সামনে মুলো না থাকলেও ধাওয়া করবে গাধাগুলো। বালিয়াড়ি থেকে ট্যাংকগুলো এখন আর পাঁচশো গজও দূরে নয়, ক্ষুদ্রে টার্গেট প্রিসিলার টারিটেও যে কোনো সময় একটা শেল লাগিয়ে দিতে পারে। ‘চলো হে, পালাই।’

আর্মাড কার ঘুরিয়ে নিলো জেক, বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে সবেগে নেমে এলো ওরা। দু’পাশে আর সামনে কাঁটাঝোপ আর গাছপালা চলে এলো, ওগুলোর আড়ালে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে পলকের জন্যে দেখতে পেলো জেক। কৌপীন ছাড়া কারো পড়নে কিছু নেই, বুকে স্টীলের লম্বা রেইল নিয়ে একজনের পিছনে একজন, এক লাইনে শুয়ে আছে—তাদের মধ্যে দু’জন উন্মাদের মতো গড়ান দিয়ে প্রিসিলার পথ থেকে সময় থাকতে সরে গেলো।

এক বালিয়াড়ি থেকে নেমে আরেক বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলো প্রিসিলা, চূড়ার ওঠার পর শ্লথ হ’লো গতি, ধুলোর ভেতর ঢাকা পড়ে গেলো খোলটা, থ্রটলে চাপ দিতে গতি বাড়াতেই লাফ দিয়ে অপরদিকের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো।

দ্বিতীয় বালিয়াড়ি থেকে পুরোপুরি নামার আগেই প্রিসিলার ব্রেক কষলো জেক, খোলা হ্যাচ থেকে বেরিয়ে গাড়ির পাশে বালির ওপর লাপিয়ে পড়লো, থ্রেগোরিয়াসও অনুকরণ করলো ওকে। বালিতে পড়েই সিধে হলো, ঢাল বেয়ে ছুটলো চূড়ার দিকে।

চূড়ার কিনারা থেকে উঁকি দিলো ওরা, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলো ইতালিয়দের চারটে ট্যাংক। সগর্জনে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ওগুলো।

ট্র্যাকের নিচে চ্যাপ্টা হ’লো কাঁটাঝোপ আর গাছপালা। এক নিমেষে জ্যাস্ত হয়ে উঠলো জঙ্গল নগ্ন কালো মূর্তিতে। দানবীয় গর্জন বেরিয়ে আসছে খোলগুলো থেকে, কিন্তু কোনো কিছু পরোয়া না করে হাজার হাজার পিপড়ের মতো আদিবাসী যোদ্ধারা ছেঁকে ধরলো ওগুলোকে।

প্রতিটি স্টীল রেইল বিশজন লোকের হাতে রয়েছে, বিশাল গাছের কাণ্ডের মতো সেটাকে ধরাধরি করে ছুটলো তারা, প্রতিটি ট্যাংককে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো, রেইলের শেষ মাথা সবেগে ঢুকিয়ে দিলো শিকলের আঙটার সাথে সংলগ্ন চাকার দাঁতের মাঝখানে।

রেইল সাথে সাথে আটকে গেলো, ইম্পাতের সাথে ইম্পাতের তীব্র তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে রিরি করে উঠলো গা, বিশজনের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো রেইলের অপর প্রান্তটা, আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে চিৎপটাং হ’লো সবাই। দরদী একজন এঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থাকলে মেশিনগুলো নিজেদের ভেঙে টুকলো টুকরো করতে গিয়ে যে শব্দ করছে তা শুনে হয়তো ভাবতো জ্যাস্ত প্রাণীরাই যেনো যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

স্টীলের রেইল জকি হইল ছিঁড়ে বের করে আনলো, সেটিং থেকে ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের তো বেরিয়ে এলো ট্র্যাকগুলো, সপাং সপাং শব্দে চাবুক মারলো বাতাসে, ধুলোর শেষ আর গাছপালার ভেতর ঘন ঘন আছাড় খেয়ে একসাথে যেনো একশো অজগর মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের ভেতর থেকে গেলো সব, চারটে ট্যাংক স্থির হয়ে গেছে, অঙ্গহানির ফলে মেরামতের অযোগ্য, ওগুলোর চারপাশে পড়ে আছে চার-পাঁচজন আদিবাসীর লাশ, ট্রাকগুলো বিছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ার সময় আঘাত করেছে ওদেরকে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেয়ে শরীরগুলো, কারো হাত আছে তো মাথা নেই, দশ মণী পাথর দিয়ে যেনো প্রত্যেককে খেঁতলানো হয়েছে।

যারা বেঁচে আছে, সংখ্যায তারা কয়েক শো, নিরাপদ আড়াল আর দূরত্ব থেকে ছুটে এসেছে এরই মধ্যে ঘিরে ফেলেছে ট্যাংকগুলোকে। প্রায় নগ্ন, লু-লু আওয়াজের সাথে উল্লাসে নৃত্যরত, গলা ছেড়ে হাসছে, খালি হাতে দমাদম ঘুসি মারছে ইস্পাতের খোলে।

খোলের ভেতর ইতালিয়দের অথবা ইতালিয়ান গানাররা এখনো মরিয়া হয়ে শেল ছুঁড়ছে, কিন্তু এখন আর তাদের টারিট ঘুরছে না, একটা কামানও টার্গেটের ওপর লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। তারা অন্ধও বটে—কারণ বারোজন আদিবাসীকে একটা করে বালতি দিয়ে রেখেছে জেক, বালতিতে আছে ইঞ্জিলের তেলের সাথে ধুলো মেশানো কাদা—ড্রাইভার আর গানারের ভাইজরে মুঠো মুঠো কাদা লাগিয়ে দিয়েছে তারা। ট্যাংকের ভেতর ইতালিয়দের ক্রুরা বন্দী, বাইরে কয়েক শো লোকের বিজয়োল্লাস, দ্বিতীয় করে আওয়াজটা তাই শুনতেই পেলো না জেক।

জেক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টো দিকের বালিয়াড়ির মাথায় থামলো গাড়িটা। ঘটাং করে খুলে গেলো জোড়া হ্যাচ কাভার, খোল থেকে লাফিয়ে নিচে নামলো গ্যারেথ আর বৃদ্ধ রাস গোলাম।

গোত্রপ্রধানের সাথে তলোয়ার রয়েছে, ঢাল বেয়ে দমকা বাতাসের মতো নেমে আসার সময় মাথার ওপর সেটা বন বন করে ঘোরালেন তিনি, তাঁর সাদা আলখাল্লা ফুলে উঠলো পিছনে, রণহংকার ছাড়তে ছাড়তে ছুটলেন নিজের যোদ্ধাদের সাথে মিলিত হবার জন্যে। আদিবাসীদের উল্লাস আর অচল ট্যাংকগুলো দেখে প্রাচীন যোদ্ধার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

দুই বালিয়াড়ির সমতল মেঝেতে নেমে এলো গ্যারেথ, মুখ তুলে জেকের দিকে তাকালো, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করলো ওকে—কিন্তু বিদ্রূপাত্মক ভাবটুকুর মধ্যে সত্যিকার সম্মান লুকিয়ে রয়েছে, উপলব্ধি করলো জেক। পাশাপাশি ছুটে দু'জনেই ওরা ঝোপের মাঝখানে নেমে এলো, এখানে বালির নিচে লুকানো রয়েছে গ্যাসোলিন ভরা কয়েকটা ক্যান।

কাজে হাত দেয়ার আগে জেকের বাহুতে হালকা ঘুসি মারলো গ্যারেথ। 'একাই ছ'টাকে পঙ্গু করে দিয়েছো, ওস্ত চ্যাপ।'

আদিবাসীরা বালি সরিয়ে ফেলেছে, জেক আর গ্যারেথ দুটো করে ক্যান নিয়ে রওনা হ'লো ট্যাংকগুলোর দিকে। একটা ক্যান খেগোরিয়াসের হাতে ধরিয়ে দিলো জেক, এরই মধ্যে কাছের ট্যাংকটার টারিটে উঠে পড়েছে সে, তার পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ারের ডগা দিয়ে একটা হ্যাচ খোলার চেষ্টা করছেন রাস গোলাম। জ্বলন্ত

অঙ্গারের মতো আলো বিকিরণ করছে বৃদ্ধের চোখ জোড়া, লু-লু রণহংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মুক্তোর মতো সাদা কৃত্রিম দাঁতগুলো নড়বড় করছে মুখের ভেতর, শত্রু হননের সুযোগ পেয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

গ্যাসোলিন ভর্তি ক্যানটা টারিটের ওপর রাখলো গ্রেগোরিয়াস, ড্যাগারটা কোমর থেকে টেনে নিয়ে ধাতব ছিপির মাঝখানে গাঁথলো। হিসহিস শব্দে স্বচ্ছ তরল গ্যাসোলিন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

‘ভালো করে ভেজাও,’ চিৎকার করলো জেক, ঘাড় ফিরিয়ে নিঃশব্দে হাসলো গ্রেগোরিয়াস, ক্যান উপুড় করে তরল গ্যাসোলিন ঝরালো ট্যাংকের গায়ে। গন্ধটা তীব্র, গরম ইম্পাত পড়ামাত্র বাষ্প হয়ে উড়ে গেলো খানিকটা।

পরবর্তী ট্যাংকের দিকে ছুটে এলো জেক, বিধ্বস্ত জকি হুইলে পা রেখে টারিটে ওঠার সময় প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুললো ক্যানের। ফরয়ার্ড মেশিনগানের স্থির ব্যারেলটাকে এড়িয়ে টারিটের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, খালের মাথায় গ্যাসোলিন ঢাললো যতোক্ষণ না ভিজে গিয়ে রোদের ভেতর চকচক করে উঠলো ইম্পাত। নাট-চল্টু-স্কু আর নগণ্য ফুটো-ফাকা দিয়ে তরল ফুয়েল ট্যাংকের ভেতরও চুইয়ে চুইয়ে ঢুকলো।

পরবর্তী ট্যাংকের দিকে ছুটে এলো জেক, বিধ্বস্ত জকি হুইলে পা রেখে টারিটে ওঠার সময় প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুললো ক্যানের। ফরওয়ার্ড মেশিনগানের স্থির ব্যারেলটাকে এড়িয়ে টারিটের ওপর সিধে হয়ে দাঁড়ালো ও, ঘোরের মাথায় গ্যাসোলিন ঢাললো যতোক্ষণ না ভিজে গিয়ে রোদের ভেতর চকচক করে উঠলো ইম্পাত। নাট-বল্ট-স্কু আর নগণ্য ফুটো-ফাটা দিয়ে তরল ফুয়েল ট্যাংকের ভেতরও চুইয়ে চুইয়ে ঢুকলো।

‘পিছাও,’ হাঁক ছাড়লো গ্যারেথ। ‘সবাই পিছাও!’ বাকি দুটো ইম্পাতের লাশ নিজের হাতে ভিজিয়েছে সে, পিছিয়ে গিয়ে উঠে পড়েছে বালিয়াড়ির মাথায়, ঠোঁটের কোণে বুলছে লম্বা কালো একটা চুরুট, এখনো ধরায়নি, হাতে একটা দিয়াশলাই।

হালকা লাফ দিয়ে ট্যাংক থেকে নিচে নামলো জেক, ক্যান উপুড় করে ছুটলো গ্যারেথের দিকে, পিছনে রেখে আসছে গ্যাসোলিনের মোটা একটা রেখা।

‘তাড়াতাড়ি! জলদি!’ আবার তাগাদা দিলো গ্যারেথ।

গ্রেগোরিয়াসও তার পিছনে গ্যাসোলিনের মোটা একটা রেখা তৈরি করছে, ছুটে আসছে গ্যারেথের দিকে।

‘এমন কেউ নেই ওই বুড়ো ভামটাকে এদিকে সরিয়ে আনে?’ অসহায় চোখে জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ। সবচেয়ে কাছে ট্যাংকটার কাছে একটা মাত্র মূর্তি উন্মাদের মতো লাফালাফি করছে, রণহংকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মাথার ওপর তলোয়ার ঘুরিয়ে ট্যাংকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দম্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে জুদের। হাতের ক্যান ফেলে দিয়ে সেদিকে ছুটলো গ্রেগোরিয়াস, কিন্তু তলোয়ারের ভয়ে কাছে ঘেঁষতেই সাহস হ’লো না তার, সাহায্যের জন্যে জেকের দিকে

তাকালো। হাতের খালি ক্যানটা ফেলে এগিয়ে গেলো জেক। ঘুরন্ত তলোয়ারের নিচে মাথা নিচু করে ঢুকলো ও, এক হাতে জড়িয়ে ধরলো বৃদ্ধের হাড়সর্বশ্ব কোমর, শূন্যে তুলে নিলো শরীরটা, ধরিয়ে দিলো গ্রেগোরিয়াসের বাড়ানো জোড়া হাতে। গ্রেগোরিয়াস তাকে বুকে নিয়ে ছুটলো, এখনো হাত-পা ছুঁড়েছেন রাস গোলাম, তলোয়ারটা মাথার ওপর খাড়া করে রেখেছেন।

দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে চুরুট ধরালো গ্যারেথ, তারপর কাঠিটাকে ভালোভাবে জ্বলতে দিলো।

গ্যাসোলিনে ভেজা মাটিতে অগ্নিসংযোগ করলো গ্যারেথ। প্রথমে কিছই ঘটলো না। তারপর একটা ধাক্কা অনুভব করলো ওরা, কানের পর্দার বাড়ি খেলো বাতাস, দপ করে আগুন ধ'রে গেলো গ্যাসোলিনে। চোখের পলকে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সগর্জনে আগুনের কয়েকটা রেখা ট্যাংকগুলোর দিকে ছুটলো। রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা নাচলো, মোচড় খেলো, দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো ট্যাংকগুলোর চারধারে। এক সময় আগুনের পাঁচিলে ঢাকা পড়ে গেলো ওগুলো।

বালিয়াড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আদিবাসী যোদ্ধারা, নিজেদের আয়োজন করা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। একা শুধু রাস গোলাম আগুনের কিনারায় নাচানাচি করছেন, তাঁর তলোয়ারের ফলায় প্রতিফলিত হচ্ছে লাল আগুন।

সামনের ট্যাংকের হ্যাচগুলো সশব্দে খুলে গেলো, উত্তপ্ত বাতাসে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো তিনটে মূর্তি, লাল পাঁচিলের ভেতর অস্পষ্ট, দেখে মনে হ'লো তিনজনই বুক চাপড়াচ্ছে, আসলে ইউনিফর্মের আগুন নেভানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে জুরা। পাঁচিল ভেদ করে বেরিয়ে এলো লোকগুলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন ধ'রে গেছে, আক্ষরিক অর্থেই তিনটে অগ্নিমূর্তি।

তাদের দিকে ছুটে গেলেন রাস গোলাম, বাতাসে শিশু কাটলো তার তলোয়ারের ফলা। ট্যাংক কমাভারের মাথা আগুনে পোড়া কালচে কাঁধ থেকে লাফ দিয়ে বিছিন্ন হলো, নিখুঁতভাবে তলোয়ার চালিয়েছেন বৃদ্ধ। মাথাটা কমাভারের পিছনে পড়লো, একটা বলের মতো গড়িয়ে নেমে এলো ঢাল বেয়ে। ধড়টা ধীরে ধীরে নিচু হলো, প্রথমভাঁজ হ'লো হাঁটু জোড়া, ঘাড় থেকে শূন্য খাড়া হ'লো রক্তস্রোত।

রক্ত হিমকরা ছংকার ছেড়ে বাকি দু'জনের দিকে তেড়ে গেলেন রাস গোলাম, তাঁর লোকেরা হিংস্র পশুর মতো গর্জে উঠে অনুসরণ করলো তাঁকে। বিড়বিড় করে কি যেনো বললো জেক, রাগে লাল হয়ে আছে চেহারা, কিন্তু পা বাড়াতেই ওকে ধ'রে ফেললো গ্যারেথ।

‘ইজি, ওল্ড চ্যাপ,’ জেককে টেনে রাখলো সে। ‘তোমার বয়স্কাউট ভূমিকা এখানে কোনো কাজে আসবে না।’

কয়েক শো আদিবাসী যোদ্ধা বাকি দুই ট্যাংকের বেরিয়ে আসা ক্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, হিংস্র আক্রোশে ফুঁসে উঠেছে জনতা, কে তাদের ঠেকাবে।

জেককে টেনে সরিয়ে নিয়ে এলো গ্যারেথ। ‘তোমার বা আমার কোনো ব্যাপারে নয়, ওল্ড চ্যাপ। খেলায় তো হারজিত আছেই—ওরা হেরে গেছে, খেসারত দিতে হবে

না?’ হঠাৎ উপলব্ধি করলো জেক, ওকে নয়, নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে গ্যারেথ। চোখের সামনে নিরুপায় লোকগুলোকে মেরে ফেলছে আদিবাসী যোদ্ধারা, তার ভালো না লাগারই তো কথা।

খানিকদূর হেঁটে এসে প্রিসিলার গায়ে হেলান দিলো ওরা, দু’জনেই একটু একটু হাঁপাচ্ছে। পকেট হাতড়ে সামান্য দোমড়ানো একটা চুরুট বের করলো গ্যারেথ, যত্নের সাথে সিধে করলো সেটাকে, আস্ত করে দুঁজে দিলো জেকের ঠোঁটে। ‘তোমাকে আমি আগেও বলেছি, প্র্যাকটিক্যাল হবার চেষ্টা করো—ভাবাবেগ কোনো কাজের জিনিস নয়। ওদের বাধা দিতে গেলে তোমাকেও ওরা ফেড়ে ফেলবে।’ চুরুটটা ধরিয়ে দিলো সে।

কানিক থেমে প্রসঙ্গ বদল করলো গ্যারেথ, ‘বড় সমস্যাটার সমাধান হয়েছে। ট্যাংক নেই তো দুশ্চিন্তাও নেই। এখন আর গিরিখাদের মুখে ইতালিয়দের এক হপ্তা আটকে রাখা কোনো সমস্যা নয়।’

হঠাৎ করে আবছা হয়ে গেলো সূর্য, দ্রুত নেমে গেলো তাপমাত্রা। দু’জনেই ওরা একযোগে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। গত এক ঘণ্টায় মেঘের বিপুল সমাবেশ পাহাড়ের মাথা থেকে সরে এসে গোটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে, সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলেছে গোটা পাহাড়শ্রেণীর মাথা। ডানাকির মরুর ওপরে এমন কোনো ফুটো নেই যার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। প্রান্তরের দূর প্রান্তে এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দু’এক ফোঁটা ওদের গায়েও পড়লো।

‘ভালো লক্ষণ, নাকি?’ সাথে সাথে প্রতিবাদে গর্জে উঠলো মেঘ, দপ করে নিভে গেলো গ্যারেথের হাসি, গোটা আকাশ জুড়ে ছুটোছুটি শুরু করলো সরু সরু বিদ্যুৎ রেখা।

মেঘের গর্জন সত্ত্বেও আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। পরস্পরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো, তারপর কান পাতলো।

‘মা জননী মেরীর কিরে, ব্যাপারটা অদ্ভুত।’ মেঘের গুরুগুরু ডাকের ভেতর থেকে মেশিনগানের আওয়াজ আলাদাভাবে চিনতে পারছে গ্যারেথ, জেকের দিকে তাকাতে সে-ও মৃদু মাথা ঝাঁকালো। ‘ওদিক থেকে তো কোনো ফায়ারিং হাবার কথা নয়!’ ওদের পিছন, অর্থাৎ সরাসরি যেনো গিরিখাদের মুখ থেকে আসছে আওয়াজটা।

‘এসো দেখি!’ বললো জেক, প্রিসিলার হ্যাচ থেকে বাইনোকুলারটা তুলে নিয়ে আলগা লাল বালির ওপর দিয়ে সবচেয়ে উঁচু বালিয়াড়ির দিকে ছুটলো ও।

মেঘ আর বৃষ্টি গিরিখাদের মুখ ঝাপসা করে রেখেছে, তবে মেশিনগানের আওয়াজ এখন বিরতিহীন।

‘দুর্ঘটনা বা ছোটোখাটো কোনো সংঘর্ষ নয়,’ বিড়বিড় করলো গ্যারেথ।

‘ফুল-স্কেল ফায়ার ফাইট,’ একমত হ’লো জেক, চোখে এখনো বাইনোকুলার।

‘কি ব্যাপার, জেক?’ বালির ঢাল বেয়ে বালিয়াড়ির মথায় ওদের পাশে উঠে এলো গ্রেগোরিয়াস। তার পিছু পিছু আসছেন বৃদ্ধ রাস গোলাম, পরিশ্রম এবং উত্তেজনায় এখনো হাঁপাচ্ছেন তিনি।

‘ঠিক বুঝতে পারছি না, গ্রেগোরিয়াস ।’ চোখ থেকে জেক বাইনোকুল্যার নামায়নি ।
‘রহস্যময়, কি?’ মাথা নাড়লো গ্যারেথ । ‘দক্ষিণ থেকে ইতালিয়রা এগোলে, পাহাড়ের নিচে আমাদের পজিশনের সামনে পড়বে তারা, আর উত্তর থেকে এলে গালাদের সামনে পড়বে । ওদিকে রাস কুল্লাহ খুব শক্ত ঘাঁটি গেড়ে আছে । ইতালিয়দের সাথে ওদের যুদ্ধ হলে আমরা শুনতে পেতাম । না, গালাদের হটিয়ে দিয়ে ইতালিয়রা আসতে পারে না... ।’

‘আর আমরা রয়েছি মাঝখানে,’ বললো জেক । ‘ইতালিয়রা তাহলে ঢুকলো কিভাবে?’

‘কিছুই তো বুঝতে পারছি না ।’ গোলাগুলির আওয়াজ আগের মতোই শোনা যাচ্ছে ।

এই সময় বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এলেন রাস গোলাম । দুই কোমরে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, একটু জিরিয়ে নিলেন, তারপর মুখ থেকে বের করলেন দাঁতগুলো । সাদা একটা রুমালে জড়ালেন সেগুলো, রেখে দিলেন আলখাল্লার গোপন একটা পকেটে । দাঁত খুলে নেয়ায় তাঁর মুখের চেহারা বিধ্বস্ত দেখালো, আবার তিনি তাঁর প্রকৃত বয়স ফিরে পেলেন ।

বুড়ো দাদার কাছে ধাঁধার উত্তর জানতে চাইলো গ্রেগোরিয়াস, তার আগে নিজেদের ও গালাদের পজিশন সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলো সে । শোনার সময় দুই পায়ের মাঝখানে ঘষে তলোয়ারের ফলায় লেগে থাকা কালচে রক্ত মুছলেন তিনি । কথা বলতে শুরু করলেন হঠাৎ করে, বুড়ো মানুষের কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর ।

‘আমার দাদা বলছেন, রাস কুল্লাহ হ’লো গণোরিয়ায় আক্রান্ত একটা হাযেনার শুকনো বিষ্ঠা,’ দ্রুত অনুবাদ করলো গ্রেগোরিয়াস । ‘তিনি আরো বলছেন, আমার কাকা, প্রিন্স লিজ মিখায়েল, তাকে বিশ্বাস করে মারাত্মক ভুল করেছেন ।’

‘বুঝলাম! কিন্তু এর মানে কি?’ জানতে চাইলো জেক । বাইনোকুল্যারটা আবার সারডি গিরিখাদের মুখের দিকে তুলে কিছু দেখা যায় কিনা পরীক্ষা করলো । হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলো ও, ‘ধেত্তেরি! সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! মেয়েটার কি মাথা খারাপ? । কিরে খেয়ে বললো, এই একবার অন্তত নাক গলাবে না... কিন্তু ঠিকই এসে পড়েছে ।’

বৃষ্টির ভেতর অস্পষ্ট, মাথার ওপর ঘন কালো মেঘ নিয়ে, হেলেদুলে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো রসিলাকে । একনো খানিকটা দূরে, তবু সারার মাথাটা পরিষ্কার চিনতে পারলো জেক টারিটের ওপর । বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে ছুটলো ও ।

‘জেক ।’ এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো ভিকির গলা, রসিলা এখনো খামেনি । ড্রাইভারের হ্যাচ থেকে বেরিয়ে রয়েছে তার মাথা, বাতাসে তার ভিজে চুল উড়ছে, সাদা মুকে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো ।

‘এর মানে কি? রাগের সাথে পাল্টা চিৎকার করলো জেক ।

‘গালারা!’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাহাকার করে উঠলো ভিকি ‘ওরা চলে গেছে! সবাই! চলে গেছে।’

অকস্মাৎ ব্রেক করে হ্যাচ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়লো ভিকি, তাকে ধ’রে সিঁধে করলো জেক।

‘কি বলছো! চলে গেছে মানে?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, এইমাত্র পৌঁছলো সে।

টারিটের মাথা থেকে, জ্বলন্ত চোখ নিয়ে, জবাব দিলো সারা, ‘চলে গেছে মানে ধোঁয়ার মতো গায়ের হয়ে গেছে। পালিয়েছে!’

‘তার মানে আমাদের বা দিকের পজিশন...? গ্যারেথ হতবাক হয়ে পড়লো।

‘খালি। কেউ নেই সেখানে। ইতালিয়রা এগিয়ে এসেছে, ঢুকে পড়েছে ভেতরে, কোনোগুলি খরচ না করেই। দলে দলে, শয়ে শয়ে। আমাদের ক্যাম্প ছাড়িয়ে এসে পড়েছে গিরিখাদের মুখে।’

‘জেক, আমাদের হারারি আর রাসটা গোত্রের সব ক’জন মারা পড়তো! পাইকারী গণহত্যা ঘটতে যাচ্ছিলো। ওর দাদার নামে হুকুম দেয় সারা ডান দিকের পজিশন চেড়ে এগিয়ে এসেছে আমাদের যোদ্ধারা!’

‘ও গড, ক্রাইস্ট!’

‘ওর এখন লড়াই করে গিরিখাদে ফেরার চেষ্টা করছে—কিন্তু মেশিনগানের সাহায্যে গিরিখাদের মুখ কাভার দিয়ে রেখেছে ইতালিয়রা। কি যে অবস্থা, মুখে বললে তুমি বুঝবে না! মরুভূমি ঢাকা পড়ে গেছে রক্ত আর রাশে।

‘সব শেষ! যা কিছু অর্জন করেছিলাম, এক ধাক্কায় সব হারিয়েছি! আজকের ব্যাপারটা একটা ফাঁদ ছিলো, ট্যাংকগুলোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আক্রমণটা ছিলো বাঁ দিক থেকে—কিন্তু ইতালিয়রা জানলো কিভাবে গালারা পালিয়ে গেছে?’

‘আমার দাদা যেমন বলেন, একটা সাপ বা একজন গালাকে বিশ্বাস করতে নেই।’

‘জেক, আর দেরি করা উচিত নয়!’ ওর হাত ধ’রে বাঁকালো ভিকি। ‘আমাদের ফেলার পথ বন্ধ করে দেবে ওরা।

‘ঠিক,’ বললো জেক। ‘গিরিখাদে ফিরে যেতে হবে আমাদের, ভেতরে নিয়ে গিয়ে ডিফেন্সের প্রথম লাইনে দাঁড় করাতে হবে যোদ্ধাদের, তা না হলে ছুটতে ছুটতে সেই একেবারে আন্দিস আব্বায় পৌঁছে যাবে ইতালিয়রা।’ ঝুট করে গ্রেনেগোরিয়াসের দিকে ফিললো সে। ‘আমরা যদি এই লোকগুলোকে সাথে নেই,’ হাত তুলে বালিয়াড়ির নিচে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধনগ্ন নিরস্ত্র আদিবাসীদের দেখালো ও, ‘যদি ওদেরকে গিরিখাদের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করি, ইতালিয়দের মেশিনগান সব ক’টাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যেতে পারে না ওরা, পায়ে হেঁটে ঘুর পথ ধ’রে গিরিখাদে পৌঁছতে পারবে না?’

‘ওরা পাহাড়ী লোক,’ শান্তভাবে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো গ্রেনেগোরিয়াস।

‘গুড। ওদের তাহলে ব’লে দাও, গিরিখাদে নেমে প্রথম জলপ্রপাতের কাছে যেনো অপেক্ষা করে। প্রথম জলপ্রপাত, আমাদের এক হবার জায়গা।’

‘আর আমরা কি করবো?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

‘গিরিখাদের মুখ হয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের,’ বললো জেক। ‘আর্মারড কারগুলোকে সাথে না রেখে আর কোনো উপায় নেই। আঁটসাঁট একা ঝাঁক বেঁধে ছুটবো আমরা। প্রার্থনা করো, ইতালিয়রা আর্টিলারি বসানোর কাজ এখনো শেষ করার সুযোগ পায়নি। লেট’স গো।’

রাস গোলামের পাঁজরে খোঁচা দিলো গ্যারেথ, ‘চলো।’

‘গাড়িতে ওঠো,’ ভিকিকে নির্দেশ দিলো জেক। ‘এঞ্জিন স্টার্ট দাও। বাকি দুটো গাড়ি নিয়ে আসছি আমরা। লাইনের মাঝখানে থাকবে তোমার রঙ্গিলা, ফুলস্পীডে ছুটবে। গিরিখাদে না পৌঁছে কোনো কারণেই থামবে না। বুঝতে পারছো কি বলছি?’

থমথমে চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকালো ভিকি।

‘গুড গার্ল,’ বললো জেক, ঘুরে চলেই যাচ্ছিলো, আচমকা এক হাত টেনে ধ’রে ওর শরীর ঘেষে এলো ভিকি। পায়ের পাতার উপর উঁচু হয়ে চুমো খেলো জেকের ঠোঁটে। ভেজা, নরম আর মিষ্টি ভিকির মুখের ভেতরটা।

বিড়বিড় করলো ভিকি, ‘জেক, আমি তোমাকে ভালোবাসি।’

‘ওহ, ডার্লিং, কী একটা সময়ই না বেছে ছো তুমি আমার জন্যে!’

‘এইমাত্র বুঝলাম যে।’ নিজের বুকের সাথে মেয়েটাকে পিষে ফেলবে যেনো জেক।

মুখে কিছু কললো না, চটাস চটাস আওয়াজ তুলে ঘন ঘন হাততালি দিলো সারা।

‘এখন যাও, গাড়িতে উঠো!’ তাড়া লাগালো জেক।

‘লাভলি! ওয়াভারফুল!’ চৈচিয়ে উঠলো সারা। এখনো হাততালি দিচ্ছে সে। ‘ওহ, মিস কেমবারওয়েল, আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে!’

‘সারা, ডিয়ার, আর কিছু বোলো না,’ স্নান গলায় বললো ভিকি। ‘কেননা, পুরো ব্যাপারটা না হয় আবার ওলট-পালট হয়ে যাবে।’

ক্লান্ত আর নিজীব হয়ে পড়েছেন রাস গোলাম, তাঁকে টেনে ঢালের ওপর তুলতে হিমশিম খেয়ে গেলো গ্যারেথ। পায়ে বেঁধে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারে ভেবে তাঁর কাছ থেকে তলোয়ারটা চাইলো সে, কিন্তু বৃদ্ধ গোত্রপ্রধান ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে বিপুলবেগে মাথা ঝাঁকালেন, বোঝাতে চাইলেন নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে রাজি নন তিনি।

হঠাৎ ওদের মাথার ওপর আকাশে একটা শব্দ হলো, যেনো নরকের সমস্ত বাতাস ছুটে এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো স্বর্গটাকে। তীক্ষ্ণ শব্দটা পাশ কাটালো, ওদের সামনে আর পাশে ঢালের গায়ে বিস্ফোরিত হ’লো বারি আর অগ্নিশিখা, টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে উঠলো আর্মারড কারের পঞ্চাশ ফিট নিচে।

‘কামান!’ বললো গ্যারেথ। ‘এবার রওনা হ’তে হয়, ওল্ড ম্যান।’ বৃদ্ধের পিঠে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু তার আর দরকার হ’লো না। কামানের গোলা

বিস্ফোরিত হ'তে দেখে সাহস ও শক্তি দুটোই ফিরে পেয়েছেন তিনি, শূন্য লাফ দিলেন একটা, গলা চিরে বেরিয়ে এলো রণহংকার, আলখাল্লার গোপন পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন নকল দাঁতের খোঁজে।

‘আরে করো কি, না!’ আঁতকে উঠে দু’হাত বাড়লো গ্যারেথ, অনেক কষ্টে আবার জাপটে ধরলো বৃদ্ধকে, টেনে নিয়ে চললো গাড়ির দিকে। রাস গোলাম খেপে গেছেন, পায়ে হেঁটে নাক্সা তলোয়ার হাতে যুদ্ধযাত্রা করতে চান। গ্যারেথ তাঁকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেলে কি হবে, পিছন ফিরে অদৃশ্য শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যে বিরতিহীন রণহংকার ছাড়ছেন তিনি।

পরবর্তী গোলাটা বিস্ফোরিত হলো চুড়ার নেক সামনে, আওয়াজ পেলেও দেখতে পেলো না ওরা।

‘প্রথমটা কম দূরত্ব পেরোলো, দ্বিতীয়টা বেশি,’ বিড়বিড় করলো গ্যারেথ, রাস গোলামকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে হিমশিম খাচ্ছে সে। ‘তৃতীয়টা কোথায় পড়বে?’

প্রায় গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় এলো সেটা। এলো ধূসর রঙা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা পথ ধরে, নিচু মেঘের ভেলা ভেদ করে, আকাশ কাঁপিয়ে। ভেতরে ঢুকলো টারিটের পিছন দিয়ে, গাড়ির মোটা প্লেট ভেঙে। বিস্ফোরিত হ'লো ক্রাব এর ইম্পাত মেঝেতে।

কাগজে ঠোঙার মতো ফেটে গেলো গাড়িটা। সাথে আগুনের লালচে শিখা আর কমলা রঙের ধোঁয়া নিয়ে গোটা টারিট আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেলো।

হ্যাঁচকা টানে রাস গোলামকে বালির ওপর ফেলে দিলো গ্যারেথ, তাঁর পিটের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়লো নিজে। ওদের চারদিকে আগুন আর ইম্পাতের টুকরো বৃষ্টির মতো ঝরলো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর আবার গ্যারেথের নিচে মোচড় খেতে শুরু করলেন রাস গোলাম। কিন্তু গ্যারেথ তাঁকে ছাড়লো না, সে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত আর্মারড কারের দিকে। বিধ্বস্ত খোল থেকে বেরিয়ে এলো চোখ ধাঁধানো আলোকমালা—গ্যাসোলিন আর ভিকার্সের অ্যামুনিশন আতসবাজির মতো ছোটোছুটি শুরু করলো।

বিস্ফোরণের আওয়াজ এক সময় থামলো। সামধানে মাথা তুলে তাকালো গ্যারেথ। সেই মুহূর্তে আরেকটা অ্যামুনিশন বেস্টে আগুন ধরলো, সাদা ট্রেসার ছুটে এলো ওদের দিকে। ঝট করে আবার মাথা নামিয়ে নিলো গ্যারেথ।

‘উঠে পড়ো, গোলাইম্মা, দোস্তো,’ অবশেষে বললো গ্যারেথ। ‘চলো দেখি, লিফট নিয়ে বাড়ি ফেরার উপায় হয় কিনা।’ এই সময় সগর্জনে অপর দিকের ঢার বেয়ে চুড়ায় উঠে এলো কুণ্ঠসিত দর্শন প্রিসিলা, ওদের মাথার ওপর ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

‘গড!’ চিৎকার করলো জেক, ড্রাইভারের হ্যাচ খুলে মাথা তুললো ও। ‘আমি ভেবেছিলাম তোমাদের নিয়ে মারা গেছে হেনরিয়েটা। ভাবলাম, যাই, টুকরোগুলো পাওয়া যায় কিনা দেখি।’

রাস গোলামকে তুলে' দিয়ে, নিজেও আঁচড়ে-খামছে প্রিসিলার টারিটে উঠে পড়লো গ্যারেথ। 'ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে,' গম্ভীর গলায় বললো সে। 'তোমাকে আমার শোধ করতে হবে দুটো ঋণ।'

'হিসাবটা পাঠিয়ে দেবো,' কথা দিলো জেক, পরমুহূর্তে মাথা নিচু করলো, প্রিসিলার পাশ ঘেঁষে ছুটে গেলো একটা গোলা, বিস্ফোরিত হ'লো চূড়ার এক কোণে। চোখেমুখে বালি আর ধোঁয়ার ধাক্কা খেলো ওরা।

'বৈঁচে থাকার স্বার্থে আমাদের বোধহয় এখান থেকে নড়া দরকার, কি?' মৃদুকণ্ঠে বললো গ্যারেথ। 'অবশ্য তোমার যদি অন্য কোনো প্ল্যান না থাকে।'

প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে তীরবেগে নামতে শুরু করলো প্রিসিলা, নিচের শক্ত মাটিতে নেমে এসে দিক বদলালো জেক, মেঘ আর বৃষ্টি ঢাকা গিরিখাদের মুখ লক্ষ্য করে ছুটলো।

ওদেরকে আসতে দেখলো ভিকি কেমবারওয়েল, ওদের সাথে সমান্তরাল একটা রেখায় সে-ও রওনা হলো। সমতল প্রান্তর ধ'রে পাশাপাশি ছুটলো জোড়া আর্মারড কার, বৃষ্টির ভেতর দিয়ে আবার সগর্জনে ধেয়ে এলো একটা গোলা, বিস্ফোরিত হ'লো ওদের পঞ্চাশ ফুট সামনে, ধূমায়িত গর্তটাকে এড়াবার জন্যে সামান্য দিক বদলাতে হ'লো ওদেরকে।

'দেখতে পাচ্ছে, ব্যাটারিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো জেক।

হ্যাচের ওপর ওয়েল্ডিং করা একটা আঁটা ধ'রে নিজেই খাড়া রেখেছে গ্যারেথ, মুখে বৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, চোখ জোড়া কোঁচকালো। 'সম্ভবত গোলাদের ছেড়ে যাওয়া পজিশনে রয়েছে ওরা, যত্ন করে খোঁড়া আমার ট্রেন্ডগুণ্ডলোয়।'

'সরাসরি ওদের ওপর হামলা করা সম্ভব?' পরামর্শ চাইলো জেক।

'না, ওল্ড চ্যাপ। পজিশনগুলো আমার নির্বাচিত, সাংঘাতিক নিরাপদ। সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকেই চলো—ভেতরে দ্বিতীয় পজিশনটাই আমাদের একমাত্র ভরসা, জলপ্রপাতের ধারে।' বৃদ্ধ রাস গোলাম গাড়ি থেকে অর্ধেকটা ঝুলছেন, তাঁর পেটে একটা হাঁটুগেড়ে রেখেছে গ্যারেথ। 'এই শালার বুড়ো আমাকে জ্বালাতন করে মারলো।'

পেটে হাঁটু নিয়ে ঝুলে থাকলে কি হবে, দ্রুতগতি গাড়িতে চড়ার আনন্দে দাঁতহীন মাড়ি বের করে নিঃশব্দে হাসছেন ওাস গোলাম, নিকট ভবিষ্যতে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা থাকায় সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তাঁর। গ্যারেথের পাঁজরে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি, বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

'আরো ভালো থাকতে পারলে ভালো হতো, ওল্ড বয়,' খেদ প্রকাশ করলো গ্যারেথ, পরমুহূর্তে ঝট করে মাথা নিচু করলো সে, প্রায় মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো পরবর্তী শেলটা।

'ব্যাটারা উন্নতি করছে,' স্কোভের সুরে বললো সে।

'প্র্যাকটিস করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছে,' পাল্টা চিৎকার করলো জেক।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলো গ্যারেথ, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।’ সাথে সাথে গর্জে উঠলো মেঘ, গোটা প্রান্তর বৈদ্যুতিক সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, সেই সাথে শুরু হ’লো মুষলধারে তুমুল বৃষ্টি।

‘অবিশ্বাস্য, মেজর সোয়েলস্!’ তাজ্জব ব্যাপার!’ জেকের পাশ থেকে বললো গ্রেগোরিয়াস। ‘আপনি জাদু জানেন নাকি?’

‘এ কিছু না, মাই সান,’ কৃতিত্বের দাবিদার হ’তে অস্বীকৃতি জানালো গ্যারেথ। ‘বলতে পারো, এ স্রেফ ওপরওয়ালার সাথে সরাসরি যোগাযোগ।’

বৃষ্টি যেনো সাদা ঘন কুয়াশা, ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। আন্দাজের ওপর গাড়ি চালাচ্ছে জেক, চারদিকে বিশ গজের বেশি কি আছে দেখার উপায় নেই। মুষলধারে বৃষ্টি শুরুর পর থেকে ইতালিয়রা কামান দাগছে না, টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে তারা।

খানিক পর বিস্ময় প্রকাশ করলো গ্যারেথ, ‘গুড লর্ড, আর কতোক্ষণ এরকম চলবে?’ ভিজে চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে।

‘চার মাস,’ পাল্টা চিৎকার করলো গ্রেগোরিয়াস। ‘এখন থেকে চার মাস চলবে একটানা।’

‘কিংবা তুমি যতোক্ষণ না থামতে বলো,’ বললো জেক, ওর ভিজে আর ক্লান্ত চেহারায়ে নিঃশব্দ হসি ফুটলো, চোখ গুরিয়ে তাকালো পাশের পাড়িটার দিকে।

রঙ্গিলার টারিট থেকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করলো ওকে সারা। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে, অর্ধেক শরীর হ্যাচের ভেতর। ভিজে কাপড় সঁটে আছে বকের সাথে, স্তন জোড়া মনে হচ্ছে উন্মুক্ত, গাড়ির ঝাঁকির সাথে সেগুলোও লাফাচ্ছে অনবরত।

হঠাৎ করে বৃষ্টিতে জাপসা সামনের প্রান্তর ছুটন্ত মূর্তিতে ভরে উঠলো। রাসটা আর হারারি গোত্রের প্রতিটি যোদ্ধা লম্বা আলখাল্লা পরে রয়েছে, হাতে অস্ত্র, হাঁচট খেতে খেতে দৌড়াচ্ছে সবাই গিরিখাদের মুখের দিকে।

টারিটে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিলো গ্রেগোরিয়াস, কথা শেষ করে জেককে বললো, ‘ওদের বললাম, প্রথম জলপ্রপাতের নিচে পজিশন নেবো আমরা-খবরটা ওরা ছড়িয়ে দেবে।’

আদিবাসী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো সে, এই সময় আঁতকে উঠলো জেক, ব্রেক করলো, লাশের একটা বিশাল স্থূপকে পাশ কাটাবার জন্যে ঘুরিয়ে নিলো প্রিসিলাকে।

‘এখানেই ইতালিয়দের মেশিনগানাররা পায় ওদেরকে,’ রঙ্গিলার টারিট থেকে চিৎকার করে জানালো সারা, আর ঠিক যেনো তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে ঘন বৃষ্টি ভেদ করে ভেসে এলো মেশিন গানের আওয়াজ।

লাশের স্থূপ অসংখ্য, সেগুলোকে এড়ানোর জন্যে কিছুটা সময় ব্যস্ত থাকতে হ’লো জেককে, তারপর সুযোগ পেয়ে ঘাড় ফেরালো রঙ্গিলার দিকে, জানতে চায় ভিকি ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারছে কিনা।

‘আরে, কি ব্যাপার!’ জেক বুঝতে পেরেছে ওরা একা। ‘গেল কোথায়!’ প্রিসিলাকে দাঁড় করালো ও। ‘এমন বেয়াদপ মেয়ে তো দেখিনি!’ পিছন দিকে ছুটলো আর্মারড কার, সগর্জনে। বৃষ্টির মধ্যে কিছুই দেখছে না ও।

বৃষ্টির ভেতর হঠাৎ দেখা গেলো রঙ্গিলাকে। গ্যারেথ গুঙিয়ে উঠলো, ‘ও মাই গড!’

রঙ্গিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভিকি আর সারা গাড়ির নিচে। অসংখ্য লাশের ভেতর ছুটোছুটি করছে দু’জন, নিহতদের ভিড়ে যারা আহত অবস্থায় পড়ে আছে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলছে হামাগুড়ি দিয়ে আর্মারড কারে ঢোকে। লজ্জাক্ত এক যোদ্ধাকে ধরাধরি করে তুললো ওরা, রঙ্গিলার দিকে এগোলো, আহতরা অনুসরণ করলো ওদের।

‘ভিকি, চলে এসো!’ হাঁক ছাড়লো জেক।

‘তুমি চাও, এদের এখানে ফেলে যাই আমরা?’ পাল্টা চিৎকার করলো ভিকি।

এক মুহূর্ত কথা বলতে পারলো না জেক, লক্ষ্য করলো গ্যারেথ ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসি। ‘জলপ্রপাতের কাছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে হবে আমাদের,’ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো ও। ‘আহতদের এখনি সাথে না নিলেও চলবে, কারণ ইতালিয়রা ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। আমাদের যোদ্ধারা যারা বেঁচে আছে তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে আমরা দ্বিতীয় পজিশনে পৌঁছতে পারি কিনা তার ওপর...,’ কিন্তু বৃথাই ব্যাখ্যা করছে জেক, মেয়ে দুটো ওর দিকে পিছন ফিরে নিজেদের কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

‘ভিকি!’ আবার ডাকলো জেক।

‘তোমরা যদি সাহায্য করো, সময় আরো কম লাগবে,’ জবাব দিলো ভিকি।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রিসিলার টারিট থেকে নেমে এলা জেক, গ্যারেথ আর থ্রেগোরিয়াসও তাকে অনুসরণ করলো।

আহত হারারি যোদ্ধাদের তোলা হ’লো দুটো আর্মারড কারে। গাড়ি দুটোর খোল ভরাট হবার পর সম্ভ্রষ্ট হ’লো ভিকি।

‘পনেরো মিনিট নষ্ট করলাম,’ ঘড়ি দেখে বললো গ্যারেথ। ‘এই দেরির কারণে আমরা মারা যেতে পারি, হারাতে পারি গিরিখাদটা।’

‘ওগুলোর চেয়ে এই কাজটা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলো ভিকি, আর কিছু শোনার অপেক্ষায় না থেকে স্টার্ট দিলো সে, ছেড়ে দিলো গাড়ি।

সামনে আরো আহত লোক দেখলো ওরা, হামাগুড়ি দিয়ে পথের সামনে চলে এলো, হাত তুলে কাতর অনুরোধ করলো তুলে নেয়ার জন্যে। কিন্তু আর কাউকে নেয়ার জায়গা নেই। করুণ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কারো কিছু করার থাকলো না।

একবার বৃষ্টির বেগ কিছুটা হালকা হয়ে যাওয়ায় চারদিকে এক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হ’লো ওদের দৃষ্টিসীমা, সেই সাথে মঞ্চ ফেলা স্পটলাইটের মতো এক টুকরো রোদ আলোকিত করে তুললো ওদেরকে, চকচকে আলো নিয়ে হেসে উঠলো

ইম্পাতের খোল। সাথে সাথে ইতালিয়দের মেশিনগান গর্জে উঠলো মাত্র দুশো গজ দূর থেকে, বুলেটের আকস্মিক ধাক্কায় ছিটকে পড়লো দশ-বারোজন যোদ্ধা, পরমুহূর্তে ঝপ করে নেমে এলো বৃষ্টির ঘন পর্দা, আবার আড়াল হয়ে গেলো সব।

গিরিখাদের নিচে মেইন ক্যাম্পের পৌঁছলো ওরা, চারদিকে সব এলোমেলো হয়ে আছে। কামানের অসংখ্য গোলা আর মেশিনগানের হাজার হাজার গুলি বিশাল ক্যাম্পটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। ঘোড়ার লাশ আর নিহত মানুষকাদার ভেতর আংশিক ডুবে আছে, এখানে সেখানে পথ ভোলা দু'একটা কুকুর বা হারিয়ে যাওয়া এক-আধটা শিশু ছাড়া জ্যান্ত প্রাণী বলতে কোথাও কিছু নেই।

ক্যাম্পের চারদিকে পাথুরে মাটিতে ছাড়া ছাড়াভাবে এখনো যুদ্ধ চলছে, ঢালের গায়ে ইতালিয়দের ইউনিফর্ম আর মাজল-ফ্ল্যাশ দেখতে পেলো ওরা। মাঝে মধ্যেই একেকটা শেল সগর্জনে ছুটে গেলো মাথার ওপর দিয়ে, দৃষ্টিসীমার বাইরে কোথাও বিস্ফোরিত হলো।

‘সরাসরি গিরিখাদের মুখের দিকে চলো,’ টারিট থেকে বললো গ্যারেথ ‘এখান থেকে না।’

কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে এগোলো প্রিসিলা, যে ঢালগুলোয় যুদ্ধ চলছে তার নিচেও আড়ালে রয়েছে পথটা। সারডি নদী পেরোলো ওরা, হাঁ করে থাকা গিরিখাদের বিশাল মুখের দিকে এগোলো।

‘আমার লোকেরা ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছে!’ গর্বের সাথে চিৎকার করলো শ্বেগোরিয়াস। ‘গিরিখাদ নিজেদের দখলে রেখেছে ওরা! ওদের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।’

‘আমাদের টিকানা প্রথম জলপ্রপাত,’ জেকের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এই প্রথম গলা চড়ালো গ্যারেথ। ‘ওরা লড়ছে, ভালো কথা—কিন্তু ইতালিয়দের এখানে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, বিশেষ করে কামান চলে আসার পর। পথ জলপ্রপাতে জড়ো হ’তে পারলে আমাদের আশা আছে।’ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে, কিন্তু যেখানে থাকার কথা সেখানে রঙ্গিলাকে দেখতে পেলো না। ‘সর্বনাশ হয়েছে! আবার!’

‘কি ব্যাপার, গ্যারেথ?’ হ্যাচ থেকে মাথা তুললো জেক, উদ্ভিগ্ন।

‘ওরা আবার...!’

‘কারা...?’ জিজ্ঞেস না করলেও চলতো জেকের, কারণ ঘাড় ফেরাতেই রঙ্গিলাকে দেখতে পেলো ও, পথ ছেড়ে বাক নিয়েছে ভিকি, আর্মারড কার নিয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে ক্যাম্পের দূর প্রান্তে।

‘দরো ওটাকে!’ গর্জে উঠলো গ্যারেথ। ‘সামনে গিয়ে বাধা দাও।’

প্রিসিলাকে ঘুরিয়ে লো জেক, আঁকাবাঁকা পথ ধরে রঙ্গিলার পথরোধ করার জন্যে ছুটলো। গাছপালা আর বৃষ্টির ভেতর হারিয়ে গেলো রঙ্গিলা।

পাঁচ মিনিট পর আবার সেটাকে দেখা গেলো, ভাঙাচোরা তাঁবুর পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তৈজস-পত্র, কাপড়চোপড়,

খাবার দাবার। টারিটে উবু হয়ে ব'সে গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় লক্ষ্য করে ভিকার্স মেশিনগান থেকে এলোপাখাড়ি গুলিবর্ষণ করছে সারা, জবাবে ইতালিয়দের তরফ থেকে ছুটে আসা বুলেটগুলো সশব্দে লাগছে ইস্পাতের খোলে। ছুটন্ত ইতালিয় সৈনিকদের দু'একজনকে দেখতে পেলো জেক, প্রিসিলাকে ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রেগোরিয়াসকে সুযোগ করে দিলো গুলি করার।

কিছু বলতে হ'লো না, থেমে থেমে গুলি করলো গ্রেগোরিয়াস। ঝোপঝাড় থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেলো ইতালিয়রা। হ্যাচ থেকে বেরিয়ে টারিটে দাঁড়ালো জেক, চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলো নিচের দিকে।

রঙ্গিলা থেকে বেরিয়ে এসেছে ভিকি কেমবারওয়েল, মুম্বলধারে বৃষ্টি আর থকথকে কাদার ভেতর ঘুর ঘুর করছে সে, যেনো মেশিনগানের গুলি সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

‘ভিকি!’ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ডাকলো জেক।

ভিকি তাকালো না, কাদার ভেতর থেকে কী যেনো একটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো সে, চিৎকার করে উঠলো উল্লাসে। এতোক্ষণে ওদের দিকে ফিরলো সে, রঙ্গিলার দিকে ছুটলো, কয়েক ফুট দূর থেকে পাশ কাটালো জেককে।

‘এসব কী শুরু করেছে তুমি...,’ রাগের সাথে বললো জেক।

‘টাইপরাইটার আর টয়লেট ব্যাগ,’ ব্যাখ্যা করলো ভিকি, দুটোই সে বুকের সাথে শক্ত করে ধ'রে আছে। ‘একটার ভেতর রয়েছে আমার মেক-আপ, আর দ্বিতীয়টা ছাড়া কাজ করবো কিভাবে, তুমিই বলো?’ এরপর ভিজ়ে বিড়ালের মতো হাসলো সে। ‘এবার আমরা যেতে পারি।’

গিরিখাদের ভেতর ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে পথ, ঢালু পথে কাকভেজা মানুষ আর পশুর বিশৃংখল মিছিল। ভেজা পাথরে বারবার পা পিছলে যাচ্ছে ঘোড়া আর গাধার। বারোটা উটের পিঠে ভিকার্স মেশিনগানগুলোকে দেখতে পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করলো জেক, কাঁধে টোকা দিয়ে আরো কয়েকটা উটের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো গ্যারেথ, সেগুলো অ্যামুনিশনের বাস্ক বহন করছে। তার লোকেরা যার যার দায়িত্ব ঠিকমতোই পালন করেছে। মেশিনগান বা অ্যামুনিশনের বাস্ক হাতছাড়া করে নি।

‘ওদের সাথে যাও, গ্রেগোরিয়াস,’ নির্দেশ দিলো জেক। ‘দেখবে ওগুলো যেনো নিরাপদে প্রথম জলপ্রপাতের নিচে পৌঁছায়।’ লাফ দিয়ে প্রিসিলা থেকে নেমে গেলো গ্রেগোরিয়াস। গাড়ি দুটো মিছিলের সাথে ধীরগতিতে এগোলো।

‘ওরা কি আর যুদ্ধ করতে পারবে?’ সন্দেহ প্রকাশ করলো জেক, তাকিয়ে আছে বিধ্বস্ত যোদ্ধাদের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজ়ে হি হি করে কাঁপছে সবাই।

‘পারবে,’ আশা প্রকাশ করলো গ্যারেথ, তাকালো গোত্রপ্রধান রাস গোলামের দিকে। ‘আপনি কী বলেন?’

আলখান্নার আন্তিন সরিয়ে বাহুর পেশি ফুলিয়ে জেককে দেখালেন রাস গোলাম।

প্রথম জলপ্রপাতের নিচে চুলের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ একটা বাঁক, সাবধানে মোড় ঘুরলো প্রিসিলা।

‘এখানে থামো,’ বললো গ্যারেথ, রাস গোলামকে নিয়ে নেমে গেলো সে।

দাঁড়ালো গ্যারেথ, ঘুরলো, মুখ তুলে তাকালো জেকের দিকে।

‘গাড়ি নিয়ে তুমি আর ভিকি সারডি শহরে চলে যাও,’ ইঙ্গিতে খোলের ভেতরটা দেখালো গ্যারেথ, ‘ওদের চিকিৎসা দরকার। যেকোনো বড় একটা বাড়ি দখল করবে, হাসপাতাল বানাবে সেটাকে। কাজটা বরং ভিকির ওপর ছেড়ে দাও, ব্যস্ত থাকলে মাথায় কুবুদ্ধি চাপবে না। যদি দেখো তাতেও কাজ হচ্ছে না, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে ওকে—’ হাসলো গ্যারেথ, পরমুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে উঠলো চেহারা। ‘প্রিন্স লিজ মিখায়েলর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। এখানকার পজিশন সম্পর্কে জানাবে তাকে। বলবে গালারা পালিয়েছে, চেষ্টা করে আমি বড়জোর এক হণ্ডা দখলে রাখতে পারবো গিরিখাদ। বলবে, অ্যামুনিশন দরকার আমাদের—দরকার খাবার, ওষুধ, কম্বল। সাপ্রাই সহ একটা ট্রেন যদি সারডিতে পাঠাতে পারে, সবচেয়ে ভালো হয়। ট্রেন পেলে আহতদেরও আমরা পাঠাতে পারবো...।’

এক মুহূর্তে থেমে কথা গুছিয়ে নিলো গ্যারেথ। ‘কাজগুলো সেরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছো তুমি। আসার সময় যতো বেশিসম্ভব খাবারদাবার নিয়ে আসবে,’ ইঙ্গিতে গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী যোদ্ধারে দেখালো ও। ‘খালি পেটে এরা যুদ্ধ করবে কিভাবে?’

গাড়ি রিভার্স করে রাস্তায় নিয়ে এলো জেক।

‘শোনো হে,’ রাস গোলামের কাঁধে হাত রেখে জেকের দিকে মুখ তুললো গ্যারেথ, ‘যদি পারো কিছু চুরুট নিয়ে এসো। ধোঁয়া না গিলে প্রাণত্যাগ করতে আমার কষ্ট হবে। দেখো, বৃষ্টিতে আবার ভিজিয়ে ফেলো না যেন।’

প্রিসিলাকে পিছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্যে তৈরি হ’লো জেক, দেখলো যোদ্ধাদের বিশৃংখল ভিড়টাকে খেদিয়ে পজিশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে গ্যারেথ।

‘চলো, যোদ্ধারা,’ হাসিমুখে হুঙ্কার ছাড়লো সে। ‘পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনবো আমরা!’

‘আমবা আরাদামের সম্মুখ থেকে আফ্রিকা অভিযানের নেতা, জেনারেল বাদোগ্লিও; ডানাকিল কলামের নেতৃত্বদানকারী কাউন্ট আলদো বেলিনির প্রতি। সময় এসে গেছে। গত পাঁচদিন থেকেই মূল শত্রু বহরের উপর একটানা বোমা ফেলে যাচ্ছি আমি। আগামীকাল সকাল থেকে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো, উঁচু

এলাকা হ'তে ডেসি রোডে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো তাদের। ডেসি রোডে পজিশন নিয়ে শত্রুস্রোত সামাল দেবেন আপনি। এতে করে দুই দিক থেকেই তাদের কজা করতে পারবো আমরা।'

আমবা আরাদামের উপর নিজেদের তৈরি ষ্ট্রেশন নয়তো গুহায় লুকিয়ে আছে চল্লিশ হাজার যোদ্ধা। এরা হ'লো ইথিওপিয় সেনাবাহিনীর প্রাণ। তাদের নেতা, রাস মুগলেতু, অভিজ্ঞতায় এবং সাহসের দিক থেকে পুরো দেশের সেরা সমরনায়ক। কিন্তু এমন প্রচণ্ড হামলার বিপরীতে অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করছেন তিনি। এমন কিছু প্রত্যাশা করেন নি, দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে ভ্রু, নিজের লোকেদের সঙ্গে জল-কাদায় উঁবু হয়ে শুয়ে আছেন। কোনো শত্রু যোদ্ধা নেই সামনে, কার বিরুদ্ধে লড়াইবেন তারা? কেবল আকাশ থেকে বিস্তৃত উপত্যকায় গুলি আর বোমা বর্ষণ করছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকা ক্যাপরনি বোমারু বিমানগুলো।

মাথা আর কান ঢেকে একটানা বিস্ফোরণের শব্দ শুনছে যোদ্ধারা। বাতাসে জঘন্য, পেট মুচড়ে আসা ধোঁয়া।

দিনের পর দিন বিস্ফোরণের ঝড় তাদের সঙ্গী হয়ে আছে, এই মুহূর্তে যোদ্ধারা ক্লান্ত, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ, বধির— একটানা শুধু সহ্য করেই যাচ্ছে তারা।

ষষ্ঠ দিনে বিশাল তিন এঞ্জিনের বোমারু বিমান উড়ে গেলো মাথার উপর দিয়ে। ভয়ে ভয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে দেখলো রাস মুগলেতুর যোদ্ধারা।

বোমারু ঝাঁক নেমে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই, কিন্তু বেশ কয়েক মিনিট ধ'রে চ্যাপ্টা মাথা পর্বতের উপরে শুধু উড়ছে বিমানগুলো। এরপর, নাক ঘুরে চলে গেলো বিমান বহর, ধীরে মিলিয়ে এলো গুগুলোর এঞ্জিনের শব্দ।

এর পরপরই রাতের শান্ত আকাশ থেকে পাক খেয়ে নেমে এলো নরম, ধীরগতির শিশির। আলতোভাবে নেমে এলো উপর দিকে তাকিয়ে থাকা মুখ আর খালি হাতপায়ের উপর।

খোলা ত্বক পুড়িয়ে দিলো সেই ধোঁয়াশা, মুহূর্তে ফোঁসকা পড়ে গেলো চামড়ায়, মাংস পর্যন্ত পুড়িয়ে দিতে লাগলো। কোটরের ভেতর লাল রক্তপিণ্ডে পরিণত হ'লো চোখ, হলুদ শ্লেষ্মা ঝরছে ক্ষত থেকে। গাড় এসিড আর গনগনে কয়লার আগুন নিয়ে ব্যথায় অবশ করে দিতে লাগলো যোদ্ধাদের।

সকাল হ'তে দেখা গেলো, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করছে রাস মুগলেতুর হাজার হাজার বীর সেনা; তাদের নেতারা নিজেরাও অবিন্যস্ত, নাইট্রোজেন ধোঁয়ার আক্রমণে বিপর্যস্ত। ঠিক এই সময়েই পর্বতের মুখ দিয়ে উঠে এলো ইতালিও সেনাবাহিনীর প্রথম ডেউটা। কিছু বুঝে উঠার আগেই দখল হারালো ষ্ট্রেশন থাকা আদিবাসী যোদ্ধারা।

সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি চমকাচ্ছে ইতালিও সৈনিকদের বেয়োনেটের পরে।

হাইল্যান্ডের ওপর ঘন কালো শেষে ঢাকা পড়ে আছে আকাশ, দুই দিন আর তিন রাত ধরে বিরতিহীন বৃষ্টি প্রথম দলটাকে লব্ধা করেছে। আশ্বা আরাদামের কাছাকাছি ছিলো দ্বিতীয় দলটা, আকাশে মেঘ না থাকায় ক্যাপরোনি বম্বারগুলো নগ্ন ও অসহায় অবস্থায় পায় তাদের, বোমা বর্ষণের পর যারা বেঁচেছিল তারা প্রাণ হারায় ইতালিয়দের বাহিনীর অতর্কিত হামলায়। দশ হাজার ইতালিয়কে নিয়ে ডেসি রোডের দিকে রওনা হয়েছে জেনারেল বাদোগ্লিও। পনেরো হাজার আদিবাসীকে খতম করে এখন তারা ধাওয়া করেছে প্রথম দলটাকে, আশ্বা আরাদাম থেকে আগেই যারা রওনা হয়ে গেছে।

হাইল্যান্ডের আকাশ মেঘে ঢাকা হলে কি হবে, প্রিন্স লিজ মিখায়েল ক্যাপরোনি বম্বারগুলোর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। মাঝে-মধ্যে বিরতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চক্র দিচ্ছে ওগুলো, ক্ষুধার্তের মতো খুঁজছে মেঘের গায়ে কোনো ফাঁক পাওয়া যায় কিনা। মেঘ সরে গেলে কি লোভনীয় টার্গেটই না পাবে তারা—ডেসি রোডের বারো মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আদিবাসী বাহিনীর আঠারো হাজার গেরিলা। থকথকে কাদায় পথ চলা দায়, যোদ্ধারা ঠাণ্ডায় কাঁপছে, পেট খালি, মনে ভয় যেকোনো মুহূর্তে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইতালিয়দের ট্যাংক বা আকাশ থেকে নেমে আসবে আগুনে বোমা।

তুমুল বৃষ্টি ইতালিয়দের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করেছে। কাদা আর গর্তের ভেতর তাদের প্রকাণ্ড ট্রুপ-ক্যারিয়ারগুলো ঘনঘন আটকা পড়ছে, শুকনো নালাগুলো ভরে উঠেছে তীব্রগতি পানিতে। ভাড়াটে ইতালিয়ান এহিজনিয়াদের বিশ্রাম নেই, প্রতি দু'পাঁচশো গজ পরপর একটা করে ব্রিজ তৈরি করতে হচ্ছে তাদের।

ইতালিয় জেনারেল বাদোগ্লিও একটা বিশাল বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হলেন।

আদিবাসী বাহিনীর এই দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছিলো প্রিন্স লিজ মিখায়েল, সন্ম্রাটদের সন্ম্রাট হাইলে সেলাসির নির্দেশে। ডেসি রোড ধরে ত্রিশ হাজার যোদ্ধার দল নিয়ে সারডিতে পৌঁছানোর কথা লিজ মিখায়েলের, বাহিনীর সিংহভাগ চলে যাবে লেক টানার দিকে, যেখানে সেলাসিবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছে আদিবাসীদের মূল শক্তি। আদিবাসীদের হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরি বার্তা এসেছে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে লেক টানায় পৌঁছুতে হবে তাকে। বাহিনীর গতি মন্থর হলেও, প্রিন্স হিসাব করে দেখেছে, ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছুতে পারবে সে।

কাদায় লেপা ফোর্ড সেডান-এর ব্যাক সিটে বসে রয়েছে প্রিন্স, গায়ে ভিজে গ্রেটকোট, গাড়ির ভেতর বৃষ্টি না থাকলেও ঠাণ্ডায় অসার হয়ে গেছে তার হাত, শেষ করে ঘুমিয়েছে মনে করতে পারছে না।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে প্রিন্স লিজ মিখায়েল। পনেরো হাজার দক্ষ-অদক্ষ গেরিলা যোদ্ধা রয়েছে তার দায়িত্বে। তাদের নিয়ে সময়মতো লেক টানায় পৌঁছুতে হবে

তাকে। ছিনে ধাওয়া করে আসছে জেনারেল বাদোগ্নিও আর তার বিশাল বাহিনী। সামনে কী অবস্থা তার জানা নেই। তবে আন্দাজ করতে পারে সে-ইতালিয়দের ডানাকিল কলাম ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সারডি গিরিখাদ দখল করে নিয়েছে, কিংবা হয়তো উঠে এসেছে সারডি শহরে। সে জানে, রাস গোলামের ক্ষুদ্রে বাহিনী সমতল প্রান্তরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে গিরিখাদের মুখ দখল করে রাখতে। তার ভয়, জেক আর গ্যারেথের ভঙ্গুর প্রতিরোধ তখনই করে দিয়ে একপাল হিংস্র নেকড়ের মতো ডেসি রোডে ছুটে আসবে ইতালিয়রা, আদিবাসী বাহিনীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

তার আরো একটা ভয়, দলত্যাগী গালাদের নিয়ে। হারারি নেতৃত্ব তদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ভুল করেছিল। আশা আরদামে যেমন, তেমনি ডানাকিল মরুতেও বেঈমানী করেছে তারা। ডেসি রোডের দু'পাশে পাহাড়ী ঢাল আর গুহার আড়ালে লুকিয়ে আছে দলত্যাগী গালারা, সুযোগ পেলেই আদিবাসীদের ছোটোখাটো দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস চপলো প্রিন্স-সারডি গিরিখাদ বা সারডি শহরে জেক আর গ্যারেথের বিরুদ্ধে রাস কুল্লাহ গালা কী করেছে কে জানে।

সামনের দিকে ঝুঁকে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালো প্রিন্স। রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক মাঝখানে দেখা গেলো রেল লাইন। সন্তুষ্টিবোধ করলো সে, ড্রাইভারের দিকে ফিরে গাড়ির স্পীড বাড়াতে বললো। যোদ্ধারে মিছিল দু'পাশে রেখে সামনে এগোলো ফোর্ড সিডান।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে পৌঁছুলো গাড়ি, রাস্তার ধারে অপেক্ষারত গেরিলা অফিসারদের পাশে থামলো ড্রাইভার। মাথার হ্যাঁট পরে গাড়ি থেকে নামলো প্রিন্স, সাথে সাথে তাকে ঘিরে ধরলো অফিসাররা। কার কী দরকার, নতুন দুঃসংবাদ, অস্তিত্বের পক্ষে হুমকি-স্বরূপ পরিস্থিতি, সবাই একযোগে জানাতে শুরু করলো। শুনতে শুনতে মন আরো খারাপ হয়ে গেলো প্রিন্সের।

ওরা না থামা পর্যন্ত চুপ করে শুনলো প্রিন্স, তারপর বললো, 'সারডির টেলিফোন লাইন এখনো খোলা?'

'গালারা এখনো ওটা কাটে নি। ওটা রেললাইন ধ'রে যায় নি, গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে, সেজন্যেই বোধহয় এখনো ওদের নজরে পড়ে নি।'

'সারডি স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করো, ওখানে কারো সাথে আমার কথা বলতে হবে। গিরিখাদে কী ঘটছে জানতে হবে আমাকে।'

লেলাইনের ধারে অফিসারদের রেখে পাহাড়ের দিকে রওনা হ'লো প্রিন্স, গাড়িতে বসে সে তার বাবা, মেয়ে, ভাই আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবলো। মাত্র কয়েক মাইল দূরে রয়েছে তারা, বেঈমান গালা আর অত্যাচারী ইতালিয়দের হাতে প্রাণ দিচ্ছে।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর গাড়ির পাশে ছুটে এলো একজন টেকনিশিয়ান। 'কমরেড, সারডির লাইন খোলা। আপনি কথা বলবেন?'

সারডি-ডেসি টেলিফোন লাইনে একটা ফিল্ড-টেলিফোন ফিট করা হয়েছে। মাথার ওপর টেলিগ্রাফ পোল থেকে ঝুলছে তামার তার। হ্যান্ডসেট-টা ধরিয়ে দেয়া হ'লো প্রিন্সের হাতে।

সারডির রেলওয়ে চত্বরে, স্টেশন মাস্টারের অফিস কামরার পাশে, লম্বা গুদাম ঘরে ঠাই পেয়েছে ছয় শো আহত যোদ্ধা। টিনের ছাদ বহু জায়গায় ফুটো, বৃষ্টির পানি অনবরত ঝরছে। অল্প কিছু গমের বস্তা ছাড়া গোটা গুদাম খালিই ছিলো, আহতদের জায়গা করে দিতে অসুবিধে হয় নি। তবে বিছানা, কম্বল, কাদর ইত্যাদি কিছুই নেই, চটের খালি বস্তা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

নরক কি এরচেয়ে খারাপ কিছু? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কোনো আড়াল বা সরঞ্জাম নেই, পানি নেই, নেই অ্যান্টিসেপটিক, ওষুধ, শুকনো কাপড় বা গরম খাবার। ক্ষতগুলোয় ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। আহতদের চিৎকারে কান পাতা দায়। দুর্গন্ধে প্রাণ বাঁচে না।

দু'দিন আগে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ভিকি কেমবারওয়েল। সেই থেকে সার সার পড়ে থাকা আহতদের মাঝখানে কেটে গেছে তার সময়, অতীত আর ভবিষ্যৎ তুলে শুধু বর্তমান নিয়ে বেঁচে আছে সে, মনে রাখে নি নিজের অস্তিত্বের কথাও। গুদামের আবছা আলোয় মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, চোখের নিচে ঘন কালি জমেছে, পিঠ আর কাঁধ ব্যথায় আড়ষ্ট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকায় দুটো পা ফুলে গেছে তার। তার লিনের পোশাকে রক্তের দাগ তো আছেই, দুর্গন্ধময় আরো একাধিক তরল পদার্থ শুকিয়ে গেলেও দাগগুলো মুছ যায় নি। এখনো অবিরাম কাজ করে চলেছে সে, ব্যথায় টন টন করছে বুকেটা; আহতদের জন্যে তেমন কিছু কিরতে পারছে না বলে।

করার মধ্যে পানির জন্যে কেউ ছটফট করলে তার মুখে মগ ধরছে ভিকি, নিজের ত্যাগ করা ময়লা থেকে অচল কাউকে সরিয়ে আনছে, কেউ মারা যাচ্ছে দেখলে তার করুণ আবেদন ভরা কালো হাত নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে লোকটার মুখ ঢেকে দিচ্ছে চটের বস্তায়, ইঙ্গিতে অতি পরিশ্রমে শ্রান্ত পুরুষ সহকারীদের ডেকে লাশ সরাবার নির্দেশ দিচ্ছে। কিছু বলার দরকার করে না, লাশ সরিয়ে নেয়ার পর লোকগুলো বাইরে থেকে আরেকজন আহতকে নিয়ে আসছে। বৃষ্টির মধ্যে এরকম আরো অনেক আহত লোক কাতরাচ্ছে, কেউ মারা গেলে তবে তাদের একজনের জায়গা হবে গুদামের ভেতর।

হারারির সহকারীদের একজন তার কাঁধে টোকা দিলো। তাকালো ভিকি, কিন্তু লোকটা কী বলতে চায় বুঝতে সময় নিলো খানিক। সামলালো, একবার মনে হ'লো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তারপর লোকটাকে অনুসরণ করে কাদা আর বৃষ্টি ভেতর দিয়ে উঠান পেরুলো, চলে এলো স্টেশন অফিসে।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো ভিকি, খসখসে গলায় নিজের নামটা উচ্চারণ করলো।

‘মিস কেমবারওয়েল, আমি প্রিন্স লিজ মিখায়েল,’ তার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা আর অস্পষ্ট, টিনের ছাদে বৃষ্টির শব্দ হ’তে থাকায় আরো আবছা শোনালো। ‘আমি ডেসি ক্রসরোড থেকে বলছি।’

‘ট্রেন’ বললো ভিকি, গলায় জোর ফিরে আসছে। ‘প্রিন্স মিখায়েল, তুমি কথা দিয়েছিলেন ট্রেন পাঠাবে, সেটা কোথায়? এই মুহূর্তে ওষুধ দরকার আমাদের— অ্যান্টিসেপটিক, অ্যাসেথৈটিক— বুঝতে পারছো না? এখনে আমাদের হাতে ছয়... প্রায় সাতশো আহত লোক রয়েছে!’ হঠাৎ বুঝতে পারলো উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করছে সে।

‘মিস কেমবারওয়েল। ট্রেন... আমি দুঃখিত। ট্রেন আমি পাঠিয়েছিলাম। সাপ্লাই সহ। মেডিসিন। আর একজন ডাক্তার। কাল সকালে রওনা হয়েছিল ওটা, কাল সন্ধ্যায় এই ক্রসরোড পেরিয়ে গেছে...।’

‘তাহলে কোথায় সেটা?’ দ্রুত জিজ্ঞেস করলো ভিকি। ‘ট্রেনটা এখানে পৌঁছায় নি কেনো? তুমি বুঝতে পারছো না এখানে কী পরিস্থিতিতে রয়েছি আমরা....।’

‘আমি দুঃখিত, মিস ভিকি। ট্রেনটা তোমাদের ওখানে পৌঁছুবে না। সারডিঁর পনেরো মাইল দূরে লাইন থেকে ফেরে দেয়া হয়েছে সেটাকে। রাস কুল্লাহ’র লোকেরা... গালারা। লাইন তুলে ফেলেছে তারা, ট্রেনে যারা ছিলো সবাই কে মেরে ফেলেছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোচগুলোয়...।’

দু’জনের মাঝখানে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো, যান্ত্রিক শব্দগুঞ্জন ছাড়া কেউ কিছু শুনতে পেলো না।

‘মিস কেমবারওয়েল, লাইনে আছো?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি কী বলছি বুঝতে পারছো তুমি?’

‘হ্যাঁ, পারছি।’

‘ওখানে কোনো ট্রেন পৌঁছুবে না।’

‘না।’

‘তোমরা কোনো সাহায্য পাচ্ছে না, সারডিঁ থেকে রেলওয়ে লাইন ধ’রে পালিয়ে আসার পথও তোমাদের জন্যে বন্ধ। পাহাড় আর পথের ওপর দশ হাজার লোক নিয়ে অপেক্ষা করছে রাস কুল্লাহ। রাস্তার পাশে ঢালের ওপর তার অবস্থান এতোই শক্তিশালী যে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে। আমরা চেষ্টা করবো সারডিঁতে পৌঁছুতে, আমাদের সাথে পনেরো হাজার যোদ্ধা রয়েছে, কিন্তু পারবো কিনা জানি না....।’

‘আমরা আটকা পড়েছি,’ তারপর প্রিন্স জানতে চাইলো, ‘ইতালিয়রা এখন কোথায়, মিস কেমবারওয়েল?’

‘গিরিখাদের প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে তারা, শেষ জলপ্রপাতটা যেখানে পথের ওপর ঝুলে আছে...,’ থামলো ভিকি, কান থেকে রিসিভার সরালো, গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো, তারপর আবার কানে রিসিভার ঠেকিয়ে বললো, ‘ইতালিয়দের মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো তুমি। এখন তারা সারাক্ষণ ফায়ার করছে। একেবারে কাছে।’

‘মিস কেমবারওয়েল, তুমি একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে পারবে জেক আর মেজর সোয়েলসের কাছে?’

‘পারবো।’

‘তাদের বলো, আরো আঠারো ঘণ্টা দরকার আমার। তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত ইতালিয়দের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে ওরা কাল সন্ধ্যার আগে ক্রসরোডে পৌঁছুতে পারবে না। তাতে করে আরেকটা দিন ও আরেকটা রাত সময় পাবো আমি। বলবে, তারা যদি কাল দুপুর পর্যন্ত ইতালিয়দের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, গোটা ইথিওপিয়া জাতি তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। সে, তুমি আর মিঃ জেক—তোমাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো আমরা।’

‘ঠিক আছে,’ বললো ভিকি, গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চায় না।

‘ওদের বলো, কাল দুপুরের মধ্যে আমার সাধ্যের মধ্যে যা কিছু সম্ভব সব আমি করবোসারডি থেকে তোমাদের উদ্ধার করার জন্যে। ওদের বলো, দুপুর পর্যন্ত যেনো ঠেকিয়ে রাখে ইতালিয়দের, তারপর আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো তোমাদেরকে....।’

‘বলবো।’

‘আরো বলবে, কাল দুপুরে আমাদের যোদ্ধাদের নির্দেশ দিতে হবে তারা যেনো পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে আমি কী করতে পারলাম তা টেলিফোন করে জানানো তোমাকে....।’

‘প্রিন্স মিখায়েল, আহতদের কী হবে? যারা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়তে অক্ষম?’

আবার নিস্তব্ধতা; তারপর প্রিন্সের অস্পষ্ট, ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ‘গালাদের হাতে পড়ার চেয়ে ওদের বরং ইতালিয়দের হাতে পড়া ভালো।’

‘হ্যাঁ,’ শান্তভাবে সায় দিলো ভিকি।

‘আরেকটা কথা, মিস কেমবারওয়েল।’ ইতস্তত করলো প্রিন্স, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, ‘কোনো অবস্থাতেই ইতালিয়দের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না তুমি। এমনকি চরম কোনো পরিস্থিতিতেও নয়। তারচেয়ে...,’ শব্দটার ওপর জোর দেয়ার জন্যে দু’বার উচ্চারণ করলো সে, ‘তারচেয়ে অন্য যেকোনো পরিণতি তোমার জন্যে ভালো হবে।’

‘কেনো?’

‘আমাদের গুণ্ডচরদের কাছ থেকে জেনেছি, তোমাদের তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তোমাকে বলা হয়েছে আদিবাসীদের চর, আর ওদের দু’জনকে টেরোরিস্ট।

তোমাকে তুলে দেয়া হবে রাস কুল্লাহ'র হাতে, সে-ই তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। তারচেয়ে যেকোনো পরিণতি তোমার জন্যে ভালো।'।

'বুঝেছি,' ফিসফিস করে বললো ভিকি, রাস কুল্লাহ'র কুৎসিত চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতে শিউরে উঠলো সে।

'শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই যদি করতে না পারি, তোমাদের জন্যে পাঠাবো আমার..., ' এখানেই শেষ, হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, এমকি যান্ত্রিক শব্দ-কোলাহলও শুনতে পেলো না ভিকি। আরো এক মিনিট যোগাযোগ পাবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু নিস্তব্ধতা ভাঙলো না। ফ্রেডলে রিসিভার রেখে চোখ বুঝলো সে, দেয়ালে হেলান দিলো ভারসাম্য রক্ষার জন্যে। জীবনে কখনো এতোটা নিঃশব্দ বোধ করে নি সে, এতটা ক্লান্ত হয় নি কখনো, এ রকম ভয়ও কখনো পায় নি।

উঠনে নেমে মুখ তুললো ভিকি, আকাশের দিকে তাকালো। বুঝতে পারে নি সময় কিভাবে বয়ে গেছে, দিনের আলো আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে। তবে মেঘের রাজ্যে ভাঙচুর শুরু হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক ওপরে উঠে গিয়ে ইতস্তত করছে পাহাড়চূড়ার কাছাকাছি, গায়ে কোথাও কোথাও আলোর পৌঁচ চোখে পড়লো-মেঘ ভেদ করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে রোদ।

তা যেনো না ঘটে, মনে মনে প্রার্থনা করলো ভিকি। এই ক'দিন একটানা বৃষ্টির মধ্যে দু'বার কিছুক্ষণের জন্যে সরে গিয়েছিলো মেঘ, প্রতিবার ইতালিয়দের বোমারুগুলো একেবারে নিয়ে দিয়ে সগর্জনে ছুটে আসে গিরিখাদের ওপর। দু'বারই ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে প্রচুর, ট্রেন্স ছেড়ে পরবর্তী পজিশনে পিছিয়ে না এসে উপায় ছিলো না। বন্যার পানির মতো গুদামে এসে ঢুকছে আহত লোকজন।

'বৃষ্টি হোক,' প্রার্থনা করলো ভিকি। 'প্লিজ গড, লেট ইট রেইন অ্যান্ড রেইন।'।

মাথা নিচু করে গুদামে পড়লো সে, নাকে প্রচণ্ড ঘুসির মতো লাগলো উৎকট দুর্গন্ধ। মৃত্যুপথযাত্রীরা গোঙাচ্ছে। চারদিকে চিৎকার। ভিকি দেখলো, কাটের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে এখনো ডাক্তারকে সাহায্য করছে সারা। ছেঁড়া ক্যানভাস টাঙিয়ে যৎসামান্য পাড়াল পাবার চেষ্টা করা হয়েছে, টেবিলের ওপর রশির শেষ মাথায় ঝুলছে একজোড়া পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্প।

জার্মান ডাক্তার ভদ্রলোক বিধ্বস্ত একটা পা কাটছেন, হাঁটুর নিচে। যুবক হারারি যোদ্ধাকে গায়ের জোরে চেপে ধ'রে রেখেছে চারজন সহকারী।

রোগীকে সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ভিকি, তারপর সারাকে ডাকলো। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো দু'জনে, বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে তাজা বাতাস নিলো বুক

ভরে, দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকলো, প্রিন্সের সাথে কী কথা হয়েছে ধীরে ধীরে ব'লে গেলো ভিকি। 'তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কোনো শব্দই আর হ'লো না।'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকালো সারা। 'তার কেটে দিয়েছে। আরো আগে কেনো কাটে নি রাস কুল্লাহ, সেটাই আশ্চর্য। তারটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে তো, নাগাল পেতে সময় লেগেছে।'

'গিরিখাদে নামবে তুমি, সারা? জেক আর গ্যারেথকে খবরটা দেয়া দরকার। রঙ্গিলাকে নিয়ে আমিই যেতাম, কিন্তু ট্যাংকে ফ্যুয়েল নেই বললেই চলে। জেককে আমি কথা দিয়েছি একটা ফোঁটাও অপব্যয় করবো না। পরে আমাদের কাজে লাগবে....।'

'ঘোড়া নিয়ে গেলে বরং তাড়াতাড়ি হবে,' ক্ষীণ হাসলো সারা। তাছাড়া, গ্রেগোরিয়াসকে কাছে পাবার এই সুযোগ আমি ছাড়ি কেনো?'

'না, সময় খুব বেশি লাগবে না,' বললো ভিকি। 'ওরা তো একবারে কাছে সরে এসেছে।'

ইতালিয়দের মেশিনগানের আওয়াজ শোনার জন্যে দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। শুধু মেশিনগান নয়, একই সাথে বিস্ফোরিত হচ্ছে কামানের গোলা, ওদের পায়ের নিচে ঘনঘন কেঁপে উঠছে মাটি।

'মিস ভিকি, জেককে তুমি কোনো ব্যক্তিগত মেসেজ পাঠাতে চাও না?' ধনুকের মতো পিঠ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো সারা। 'সে হয়তো তোমার আশায় খাবি খাচ্ছে। আমি কি তাকে বলবো যে, তার অভাবে তোমার শরীরের চাহিদা মিটছে না....?'

'সারা!' আঁতকে উঠলো ভিকি। 'তাকে যদি তুমি এ-ধরনের অশ্লীল ইঙ্গিত দাও....।'

'অশ্লীল কথাটার মানে কী, মিস ভিকি?' সাথে সাথে আগ্রহ বেড়ে গেলো সারার।

'নোংরা, অভদ্র।'

'অশ্লীল,' পুনরাবৃত্তি করলো সারা, মুখস্ত করে রাখছে। 'ভারি সুন্দর একটা শব্দ।' শব্দটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করলো সে, 'আমার শরীরের অশ্লীল চাহিদা তোমার অভাবে মিটছে না!'

কিছু বলতে যাচ্ছিলো ভিকি, অকস্মাৎ হিংস্র উল্লাসধ্বনির সাথে শোনা গেলো আর্তচিৎকার, সেই সাথে উঠনটা চূতন্ত মানুষের ভিড়ে ভরে উঠলো। রেল লাইনের দু'পাশের গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো তারা, উঠানে ঢুকে সদ্য আগত আহত যোদ্ধাদের ওপর একদল নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। বারান্দার অন্ধকার কোণ থেকে ওরা দেখলো, গালারা সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে এলো, পড়ে থাকা অসহায় আহতদের ওপর এলোপাতাড়ি হোরা চালাচ্ছে।

বাধা দেয়ার জন্যে চুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন জার্মান ডাক্তার, করুণা ভিক্ষার ভক্তিতে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, একটা লম্বা তলোয়ারের ধাক্কা খেলেন বুকে, ফলার ডগাটা ভোজভাজির মতো আধ হাত বেরিয়ে এলো দুই শোল্ডার ব্রেডের মাঝখান দিয়ে।

‘ওরা গালা!’ ফিসফিস করলো সারা, আতংকে পশু হয়ে গেয়ে দু’জনই। পৈশাচিক আনন্দে উলু-ধ্বনির মতো আওয়াজ করতে করতে গুদামের ভেতর ঢুকে পড়লো কয়েক শো গালা, গুরু হ’লো অবিশ্বাস্য হত্যাযজ্ঞ।

টিনের দেয়ালে অনেক ফুটো, তার একটায় চোখ রেখে একজন গালাকে দেখলো ভিকি, হাতে লোড করা রাইফেল, সার সার শুয়ে থাকা আহতদের সামনে দিয়ে হাঁটছে, গুলি করছে প্রত্যেকের মাথায় মাজল ঠেকিয়ে।

আরেকজন গালাকে দেখলো ভিকি, হাতে লম্বা ড্যাগার, আহত হারারি যোদ্ধার গলা কাটার জামেলায় না গিয়ে হ্যাঁচকা টানে চটের বস্তা সরিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে ড্যাগার গাঁথছে তলপেটের নিচে।

আহত যোদ্ধাদের আর্তনাদ আর খুনিদের উল্লাসধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। ভিকিকে টেনে সরিয়ে নিলো সারা, লাফ দিয়ে উঠলে নামলো ওরা। ‘গাড়ি!’ হাঁপিয়ে উঠলো ভিকি। ‘ঈশ্বর, গাড়ির কাছে পৌঁছে দাও আমাদের।’

রঙ্গিলা রয়েছে স্টেশন বিল্ডিংয়ের পিছনে, লোকো শেডের প্রসারিত ছাদের নিচে। পাশাপাশি ছুটলো ওরা, শেডের কোণে পৌঁছে বাঁক ঘুরলো, উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা দশ-বারোজন গালায় ঠিক সামনে পড়ে গেলো।

বৃষ্টি মধ্যে কুৎসিত কালো চেহারাগুলো পলকের জন্যে দেখতে পেলো ভিকি, খোলা মুখের ভেতর নেকড়ে সুলভ দাঁত, খুনের নেশায় আধবোজা চোখ। নামে ঢুকলো উৎকট ঘামের গন্ধ।

পরমুহূর্তে মোচড়া কেলো ভিকির শরীর, বাঘের সামনে হরিণ যেমন মোচড় খেয়ে আরক দিকে বাঁক নেয়। ঘুরে পিছন ফেরার সময় পেলো সে, কিন্তু ছুটে পালানোর সুযোগ হ’লো না, একটা শক্তিশালী হাত খামচে ধরলো তার কাঁধ।

ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেলো ব্লাউজটা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটলো ভিকি, কিন্তু শুনতে পেলো লোকগুলো তাকে ধাওয়া করে আসছে, রোমহর্ষক লু-লু চিৎকার পাগল করে তুললো তাকে।

তার সাথে ছুটছে সারা। স্টেশন বিল্ডিংয়ের কোণ লক্ষ্য করে ছুটছে ওরা, তার চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে সে। আগুনের ফুলুকি দেখা গেলো, ওদের বাঁ দিক থেকে গর্জে উঠলো একটা রাইফেল, ওদের সামনে দেয়ালে লাগলো বুলেটটা। চোখের কোণ দিয়ে ভিকি আরো অনেক ছুটন্ত গালাকে দেখতে পেলো, শহরের মেইন রোড থেকে কাছে চলে আসছে, ওদের সামনের পথে বাধা দেয়ার ইচ্ছে।

ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সারা, প্রিসিলা হরিণীর মতো দ্রুতগতি তার পা, তার সাথে সমান তালে পা ফেতে পারছে না ভিকি। দশ কদম স্টেশনের বিল্ডিংয়ের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেলো সারা।

বাঁক ঘুরেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সারা, তার সামনে রঙ্গিলাকে ঘিরে কমলা রঙের আগুন নাচানাচি করছে, হ্যাঁচগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। ওদের আগেই আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেছে গালারা।

রঙ্গিলা জ্বলছে, পনেরো-বিশজন গালা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে ধেই ধেই করে নাচছে ওটার চারধারে। ভিকার্স অ্যামুনিশন বিস্ফোরিত হ'তে শুরু করায় ছিটকে দূরে সরে গেলো তারা।

মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়িয়েছে সারা, তার কাছে পৌঁছুতে ওই এক সেকেন্ডই লাগলো ভিকির।

‘সীডার জঙ্গল!’ ফুঁপিয়ে উঠলো সারা, দিক বদলানোর সময় ভিকির বাহু খামছে ধরলো সে।

রেলাইনের ওপারে জঙ্গলটা দুশো গজ দূরে, তবে গভীর আর অন্ধকার এবড়োথেবড়ো মাটি আড়াল করে নদীর পাড় ঘেঁষে উঁচু হয়ে আছে। এক ছুটে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা, সাথে সাথে বিশ-বাইশজন গালা পিছু নিলো, আবার শুরু হ'লো লু-লু উলু-ধ্বনি।

গালাদের সামনে ছুটছে ভিকি, খোলা উঠানটা যেনো অন্ত বিস্মৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করছে তাকে। মাটি পিচ্ছিল, কাদার ভেতর গোড়ালি ডেবে যাচ্ছে, এক দিকে কাত হয়ে ছুটলো সে।

দীর্ঘ পা ফেলে অনায়াসে ছুটে চলেছে সারা, এক লাফে রেললাইন পেরিয়ে গেলো সে, জঙ্গলের কিনারা আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট সামনে।

রেললাইন পেরোতে গিয়ে ভিকি অনুভব করলো তার একটা পা বেঁধে গেছে, পরমুহূর্তে কাদার ওপর আছাড় খেলো সে। উঠতে চেষ্টা করলো, খাড়া হ'লো হাঁটুর ওপর। জঙ্গলের কিনারা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো সারা, ইতস্তত করলো, মসৃণ গাঢ় মুখে বিস্ফারিত হয়ে আছে বিশাল সাদা চোখ জোড়া।

‘পালাও!’ চিৎকার করলো ভিকি। ‘পালাও! জেককে বলো!’ অন্ধকার জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো সারা, একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেলো ডালপালা।

রাইফেলের একটা বাঁট শরীরের পাশে আঘাত করলো ভিকিকে, পাঁজরের নিচে। ঠাণ্ডা পিচ্ছিল কাদার ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে, ব্যথায় অন্ধকার দেখলো চোখে। শুধু টের পেলো অনেকগুলো নির্দয় হাত ওর পড়নের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে নিচ্ছে। চোখ খোলার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু সারা মুখে ভেজা চুল থাকায় কিছুই দেখতে পেলো না। হাত-পা ছুঁড়লো, বৃথাই, কারণ পুরুষগুলো সংখ্যায় অনেক। ওকে ধ'রে দাঁড় করালো তারা, হঠাৎ কর্তৃত্বসূচক একটা ভারি কণ্ঠস্বর চাবুকের মতো শব্দ করলো। শরীর থেকে সরে গেলো হাতগুলো।

মুখ তুললো ভিকি, চামড়া ছেঁড়া কোমর আর তলপেটে ব্যথা নিয়ে কুঁজো হয়ে আছে। কাদা আর চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, কিন্তু তবু ক্ষত-বিক্ষত চেহারা দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গালা সদাঁরকে চিনতে পারলো সে। এই কুৎসিতদর্শন পণ্ডটাই গিরিখাদে তাকে অপমান করেছিল, সেবার তার হাত থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল গ্যারেথ। এখনো লোকটা নীল আলখাল্লা পরে আছে, বৃষ্টির পানিতে ভেজা, তার বীভৎস মুখে নিঃশব্দ হাসি দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো ভিকির।

টেবিলগুলোর সামনের কিনারায় বালির বস্তা আর ডালপালা ফেলে নিরাপদ আড়াল তৈরি করা হয়েছে, চৌকো অবজারভেশন ফাঁলের সামনে গিরিপথের নিচের দৃশ্য দেখতে কোনো বাধা নেই।

বালির বস্তার ওপর একটা কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিলো গ্যারেথ, ফাঁকে চোখ রেখে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভেতর তাকালো। ক্রল করে এগিয়ে এসে ফায়ারিং স্টেপ-এর ওপর সিঁধে হয়ে দাঁড়ালো জেক, গ্যারেথের মুখভাব লক্ষ্য করছে। আভিজাত্যের গর্বে মাটিতে যার পা পড়তো না সেই গ্যারেথ সোয়েলসের সারা মুখ লাল মাটিতে লেপা, গায়ে আর কাপড়ে দুনিয়ার ময়লা লেগে আছে। চোয়াল ঢাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি বিবর্ণ রঙের পোঁচ ব'লে মনে হলো, গৌফটা আকৃতি হারিয়ে হাস্যকর লাগছে দেখতে। গত এক হুণ্ডায় গোলস করার বা কাপড় পাল্টানোর সুযোগ হয় নি। মুখে নতুন কয়েকটা রেখা আর ভাঁজ দেখতে পেলো জেক, বিশেষ করে ঠোঁটের কোণে আর চোখের চারদালে—উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর ব্যথার প্রতিনিধিত্ব করছে ওগুলো। কিন্তু জেকের দিকে চোখ পড়তে নিঃশব্দ হাসলো সে, একা ভুরু খানিকটা ওপরে তুলে নাচালো, শয়তানী বুদ্ধি ঝিক ঝিক করে উঠলো চোখে।

কথা বলতে যাবে গ্যারেথ, এই সময় ওদের নিচে থেকে গিরিখাদের গভীর গাঢ় ছায়া ধ'রে ওপর দিকে ছুটে এলো একটা গোলা। দু'জনেই ওরা মাথা নিচু করলো, গোলাটা বিস্ফোরিত হ'লো কাছাকাছি, কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। গত কয়েক দিনে এতো কাছাকাছি এরকম দু'তিনশো গোলা পড়েছে।

‘মেঘ সরে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই,’ বললো গ্যারেথ, দু'জনেই ওরা পাহাড়ের মাঝখানে সরু আকাশের দিকে তাকালো।

‘হ্যাঁ,’ বললো জেক। ‘কিন্তু যথেষ্ট দেরি করে সরছে। আর বিশ মিনিট পর অন্ধকার হয়ে যাবে।’

দেরি হয়ে গেলো বম্বারগুলোর জন্যে, কারণ মেঘ সম্পূর্ণ সরে গেলেও চান্ডির এয়ারফিল্ড থেকে উড়ে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে পাইলটদের।

‘কাল যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, আবার আসবে ওগুলো।’

‘কালকের কথা কাল ভাববো,’ বললো জেক, কালো বম্বারগুলোর কথা মনে করতে না চাইলেও চোখের সামনে ফুটে উঠলো দৃশ্যগুলো।

যতোবার আকাশ সামান্য পরিষ্কার হয়েছে, গিরিখাদের ওপর বম্বারের আওয়াজ পেয়েছে ওরা। ইতালিয়দের আর্টিলারি স্মোক মার্কার ছুঁড়তে শুরু করে ওদের ট্রেস লক্ষ্য করে। ক্যাপরোনি বম্বারগুলো একেবারে নিচে দিয়ে উড়ে আসে, গিরিখাদের দু'পাশের পাথুরে পাঁচিলে ডানাগুলো এই লাগে এই লাগে অবস্থা। এতো কাছ দিয়ে উড়ে গেলো সেগুলো, কাচ ঘেরা ককপিটে হেলমেট রা এয়ারম্যানদের পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে ওরা।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বন্সারগুলো, ফিউজিলাজ থেকে খসে পড়লো কালো জিনিসগুলো। একশো কিলো বোমাগুলো সরাসরি খাড়া নেমে এলো, বিস্ফোরণের শব্দে শরীর ও মন অসাড় হয়ে গেলো ওদের। ওগুলোর তুলনায় কামানের গালাকে পটকা বলা যায়। নাইট্রোজেন মাসটারড ভরা ক্যানগুলো প্রথমে ড্রপ খেলো বার কয়েক, তারপর পাথুরে ঢালের ওপর বিস্ফোরিত হলো—হলুদ, জেলির মতো তরল পদার্থ, চারদিকে একশো ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এ নিমেষে।

প্রতিবার ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে একের পর এক আসতে থাকলো বন্সারগুলো, ফেরার আগে ওদের প্রতিবোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিলো যে ইতালিয়দের পদাতিক বাহিনীকে ঠেকানোর কোনো উপায় থাকলো না। প্রতিবার ট্রেন্ড ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ওরা, পিছু হটে উঠে আসতে হয়েছে পরবর্তী পজিশনে।

এটাই ওদের শেষ পজিশন, ওদের দু'মাইল পিছনে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিট পাথরের প্রাকৃতিক তোরণ, গিরিখাদের নামার মুখে। আরো সামনে সারডি শহর আর ডেসি রোডের দিকে খোলা পথ।

'চেপ্টা করে দেখো না একটু ঘুমোতে পারো কিনা,' বললো জেক, নিজের অজান্তেই গ্যারেথের বাম হাতের দিকে তাকালো। ছেঁড়া শার্ট দিয়ে বাঁধা গোটা হাতটাই ফুলে আছে, গলার সাথে একা স্লিঙে ঝুলছে বুকের কাছে। ব্যান্ডেজে তেমন কোনো কাজ হয় নি, রক্ত আর পুঁজ অবাধে বেরিয়ে আসছে কিনারা দিয়ে। ক্ষতটার নগ্ন চেহারা কী রকম জানে জেক, যতোবার তাকিয়েছে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ও। কাঁধ থেকে কবজি পর্যন্ত ছাল তুলে নিয়েছে নাইট্রোজেন মাসটারড, যেহেতু গোটা হাত ফুটন্ত পানিতে চেপে ধরা হয়েছিল। ওষুধ কোথায় পাবে, গ্রিজ ঢালা হয়েছে ক্ষতের ওপর, কী উপকার হবে কে জানে।

'আগে অঙ্ককার হোক,' বিড়বিড় করলো গ্যারেথ, ভালো হাতটা দিয়ে চোখে বাইনোকুলার তুললো। 'কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার। নিচেটা বড় শান্ত।'

'বড় বেশি চুপ চাপ,' আবার বললো গ্যারেথ, হ্যাঁ সরাতে গিয়ে ব্যথায় উফ করে উঠলো। 'গ্যাঁট হয়ে বসে থাকার সময় নেই ওদের। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোনোর কথা।' তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললো, 'তুমি বিশ্বাস করবে, ওল্ড চ্যাপ, একটা চুরুরটের বিনিময়ে এই মুহূর্তে একটা টেসটিকল হারাতেও আপত্তি করবো না আমি, কি?' হাসলো সে। 'যখন সবচেয়ে বেশি দরকার...'

হঠাৎ থেমে গেলো সে, পরমুহূর্তে দু'জনেরই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো।

'আমি যা শুনছি, তুমিও কি তাই শুনছো?' জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ।

'আমারও তাই ধারণা।'

'আসার তো কথাই, হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললো গ্যারেথলে। 'এতো দেরি হ'লো কেনো সেটাই আশ্চর্য। তবে আসামারা থেকে দূরত্বও তো কম নয়। চুপচাপ থাকার কারণটা তাহলে বোঝা গেলো, ওগুলো আসার অপেক্ষায় ছিলো ওরা।'

নিস্তদ্ধ গিরিখাদের ভেতর নতুন শব্দটা চিনতে ভুল হবার কোনো কারণ নেই। এখনো অস্পষ্ট, তবে পাথরের ওপর ইস্পাতের ঘর্ষণ টের পেতে অসুবিধে হ'লো না। প্রতি মুহূর্তে শব্দটা বাড়ছে। এখন ওরা এঞ্জিনের মৃদু গর্জনও শুনতে পাচ্ছে।

ট্র্যাংক,' বললো গ্যারেথ। 'ব্লাডি ট্যাংক।'

'সক্কোর আগে এখানে ওরা পৌঁছুতে পারবে না,' আন্দাজ করলো জেক। 'রাতে হামলা করার ঝুঁকি নেবে বলেও মনে হয় না।'

'না,' সমর্থন করলো গ্যারেথ। 'কাল সকালে আসবে ওরা।'

'সেদ্ধ ডিম আর গরম কফির বদলে ট্যাংক আর বোমারু?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো গ্যারেথ। 'সেরকমই ভয় করছি, ওল্ড সান।'

নিজের কর্মকাণ্ডে কোনো আস্থা নেই কাউন্ট আলেদো বেলিনির। জিনোর আতঙ্কিত দৃষ্টির সামনে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো সে। চান্ডি কুয়ার নিরাপদ আশ্রয়ে যেখানে থাকার কথা তার, উচ্চ মহলের চাপে পরে শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গনে নামতে হয়েছে।

জেনারেল বাদোগ্লিওর হেডকোয়ার্টার থেকে করা রেডিও মেসেজগুলোর ভূমিকা আছে এর পছন্দে, ডেসি রোড যেকোনো মূল্যে দখলে রাখতে বলা হয়েছে তাকে। প্রতিমুহূর্তে আরো কর্কশ হয়ে উঠছে জেনারেলের মেসেজের ভাষা। কাউন্টের কলামের নেতৃত্বে থাকা মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানির কাছে মুহূর্তে নির্দেশ ছুটে যাচ্ছে।

শেষমেষ, মেজর ক্যাস্তেলানি গিরিসংকটের মাথার দিকে উঠে যেতে সক্ষম হ'লো তার বাহিনী নিয়ে। আর একটা লড়াই ওদের সারডির দখল দেবে। রেডিও মেসেজ করে কাউন্টকে জানালো মেজর ক্যাস্তেলানি। বহুক্ষণ চিন্তার পর কাউন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সামান্য বিপদের হুমকি ধর্তব্যে না এনে এই বিজয়ের মুহূর্তে তার উচিত সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া। মেজর ক্যাস্তেলানি অবশ্য বার বার করে জানিয়েছে, শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে দেয়া হয়েছে, কোনো ভয় নেই। কাজেই, সাহসের পালা হাওয়া লেগেছে কাউন্ট বেলিনির।

অবশেষে, ক্যাম্প ছেড়ে, নিজের সামরিক দর্শন জলাঞ্জলি দিয়ে সতর্কভাবে সারডি জলপ্রপাত ধ'রে উপরে উঠে এলো সে, আসমারা থেকে আসা আর্মারড কলামের মধ্যে। জংলী আদিবাসীরা যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে, তার ক্ষতিপূরণ করতে পাঠানো হয়েছে এগুলো। মাসাওয়া থেকে, আসমারা হয়ে ডানাকিল মরু পার হয়ে শুধুমাত্র কাউন্টের অনুরোধে এসেছে বাহনগুলো।

পৌছামাত্র একটা ট্যাঙ্কে নিজের নিরাপদ অবস্থান নিয়ে ফেলেছে কাউন্ট। ভারী আর্মারের ভেতরে বসার পর বেশ নিরাপদ বোধ করতে লাগলো সে।

‘সারডি পথে এগোও, ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে নতুন করে লিখবো আমরা!’ গর্জে উঠলো বেলিনি।

এখন, ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে, খাড়া-সাদা পাহাড়প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করলো কাউন্ট।

কমান্ড ট্যাক্সের টারিট থেকে, বিশাল কালো চোখে, চকচকে শিরস্ত্রাণ মাথায়, হাত কোমড়ের বেরেটা পিস্তলে রেখে উঁকি দিলো সে। তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পরে আছে জিনো, ভয়ে পাণ্ডুর মুখ।

সেই মুহূর্তে, তাদের সামনে কোথাও গর্জে উঠলো মেশিনগান। জলপ্রপাতের খাড়া দেয়ালে লেগে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হ’তে লাগলো সেই আওয়াজ।

‘খামো! এই মুহূর্তে খামো!’ নিজের ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে বললো কাউন্ট আলদো বেলিনি। ‘এখানে ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার বানাবো আমরা।’ কাউন্টের কথার সমর্থনে মাথা বাঁকালো জিনো।

‘মেজর ক্যাস্তেলানি এবং মেজর ভিটোকে ডেকে পাঠাও। এই মুহূর্তে আমার কাছে রিপোর্ট করবে তারা।’

কাঁধে হাত আর চোখে আলোর ছোঁয়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেলো জেকের। উঠে বসার চেষ্টা করার জন্যে সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি এক করতে হলো। আধ ভেজা কম্বলটা গা থেকে সরিয়ে চোখ কুঁচকে ল্যাম্পটার দিকে তাকালো ও, কিছুই দেখতে পেলো না। ঠাণ্ডায় প্রতিটি পেশি অসাড় হয়ে গেছে ওর, কপাল আর মাথা লোহার মতো ভারি। সকাল হয়ে গেছে বিশ্বাস হ’তে চাইলো না।

‘কে?’

‘আমি, জেক।’

এতক্ষণে ল্যাম্পের পিছনে গ্রেগোরিয়াস মারিয়ামের থমথমে চেহারাটা দেখতে পেলো জেক। ‘চোখ থেকে আলোটা সরাবে?’ কর্কশ গলায় বললো ও।

জেকের পাশে হঠাৎ উঠে বসলো গ্যারেথ সোয়েলস্। ভিজ়ে কাপড় পরে দু’জনেই ওরা ট্রেঞ্চের ভেতর কাদার ওপর ঘুমিয়ে ছিলো। ‘কিছু ঘটেছে, কি? জড়ানো গলায় বললো সে, ক্লান্তিতে মস্তুর হয়ে গেছে সে-ও।

ল্যাম্প সরিয়ে নিলো গ্রেগোরিয়াস, তার পাশে দাঁড়ানো একহারা গড়নের সারার ওপর পড়লো আলোটা। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে মেয়েটা, ব্লাউজ আর স্কার্ট দুটোই ভিজ়ে, ঝোপের কাঁটা আর গাছের ডাল লেগে তার হাত ও পায়ের চামড়া কেটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে স্কার্ট আর ব্লাউজ।

জেকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো সে, জেক দেখলো আতংকে বিকৃত হয়ে আছে মেয়েটার মুখ। কথা বলতে চেষ্টা করলো সারা, কিন্তু থরথর করে শুধু ঠোঁট কাঁপালো,

কোনো শব্দ বেরুলো না। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে জেকের বুক জাঁপিয়ে পড়লো সে। ‘মিস কেমবারওয়েল,’ নিজেকে সামলে নিয়ে পিছিয়ে এলো সারা। ‘ওরা তাকে ধ’রে নিয়ে গেছে....!’

‘তোমাকে এখানে থাকতে হবে,’ বললো জেক, ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা, ট্রেন্ডগলার কাছ থেকে আধ মাইল পিছনে রয়েছে প্রিসিলা। ‘ভোরে একটা জোরালো হামলা হবে, তুমি না থাকলে ওরা ঠেকাতে পারবে না।’

‘আর্মারড করে আমিও থাকছি জেক,’ শান্তভাবে বললো গ্যারেথ, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে। ‘ভিকি ওদের হাতে বন্দী, আর আমি এখানে ব’সে থাকবো, এ তুমি....,’ হঠাৎ থেমে ক্ষীণ হাসলো সে। ‘তোমার ওপর একটা পিতৃসুলভ চোখ রাখার জন্যেও আমার উপস্থিতি দরকার, ওল্ড চ্যাপ। অন্তত এই একবার রাস গোলামকে নিজেদের গা বাঁচানোর জন্যে ঝুঁকি নিতে হবে।’

কথা বলতে বলতে আর্মারড কারের কাছে পৌঁছে গেলো ওরা, গিরিখাদের মাথার নিচে এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা। হাত বাড়িয়ে প্রিসিলার গা থেকে ক্যানভাস কাভারটা সরালো গ্যারেথ, শ্বেগোরিয়াসের কাঁধে একটা হাত রাখলো জেক।

‘যাই ঘটুক না কেনো,’ তাকে বললো ও, ‘ভোরের আগেই ফিরে আসবো আমরা। যদি না ফিরি, কী করতে হবে তুমি জানো। এই ক’দিন ভলো ট্রেনিং পেয়েছো তুমি।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো শ্বেগোরিয়াস।

‘যতক্ষণ পারো ঠেকিয়ে রাখবে। তারপর পিছিয়ে গিরিখাদের মাথায় চলে এসে শেষ কর্তব্যটি সারবে। ঠিক আছে? মাত্র দুপুর পর্যন্ত, তাই না? চেষ্টা করলে ওদেরকে আমরা ওই সময় পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারবো—ট্যাংক নিয়ে আসুক আর যাই নিয়ে আসুক, কী বলো?’

‘হ্যাঁ, গ্যারেথ, পারবো ঠেকিয়ে রাখতে।’

‘আরেকটা কথা, শ্বেগ,’ বললো গ্যারেথ। ‘তোমার দাদাকে আমি আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসি—কিন্তু শালার বুড়োটাকে যেভাবে হোক সামলে রাখতে হবে তোমার। দরকার হলে বেঁধে রাখবে।’ শ্বেগোরিয়াসের কাঁধে চাপড় মারলো সে, দখল করা ইতালিয়দের রাইফেলটা হাত বদল করলো, ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে পড়লো প্রিসিলার টারিটে।

কোমর ধ’রে সারাকে গাড়ির মাথার তুলে দিলো জেক, প্রিসিলার সামনে এসে ক্র্যাঙ্ক হ্যান্ডেল ঘোরালো।

প্রায় খাড়া শেষ কয়েক শো গজ ঢাল বেয়ে গিরিখাদের মাথায় উঠে এলো প্রিসিলা, পাশ কাটালো মশালের আলোয় মাটি কাটার কাজে ব্যস্ত রাসটা আর হারারি

লোকজনদের। গিরিখাদ ধ'রে ইতালিয়দের ট্যাংক আসছে জানার পর থেকে ওদেরকে কাজে লাগিয়েছে জেক আর গ্যারেথ, কোনো বিরতি ছাড়া পালা করে মাটি কেটে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে ওরা।

ভিকিকে নিয়ে উদ্ভিগ্ন হলেও, দু'জনেই ওরা লক্ষ্য করলো আদিবাসী কর্মীরা নিখুঁতভাবে কাজটা করছে। অ্যান্টি-ট্যাংক পাঁচিল, প্রায় সাত ফুট উঁচু করা হয়েছে, গ্রানিট পাথরের তৈরি, তার ওপর মাটি ফেলা হয়েছে—পাঁচিলের সামনে গভীর গর্ত। পাঁচিলের মাঝখানে সরু একটা ফাঁক রয়েছে এখনো, প্রিসিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা।

‘ওদের বলো, সারা, ফাঁকটা এবার বন্ধ করে দিক,’ নির্দেশ দিলো গ্যারেথ। ‘গাড়ি নিয়ে আমরা আর গিরিখাদে ফিরবো না।’

পাঁচিলটার সবচেয়ে উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন হারারি কমান্ডার, তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো সারা। জবাবে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো লোকটা।

প্রকৃতির তৈরি গ্রানিট পাথরের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো প্রিসিলা, ওদের সামনে পিরিচ আকৃতির উপত্যকা আর সারডি। শহর জ্বলছে।

আর্মারড কার থামালো জেক, খোলের মাথায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলো ওরা লাল অগ্নিশিখার দিকে, মেঘের গায়েও লালচে আভা ফুটে রয়েছে। উপত্যকার চারদিকে আকাশ-ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় পাঁচিলগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা গেলো।

‘সে কি এখনো বেঁচে আছে?’ ওদের সবার ভয় একযোগে বেরিয়ে এলো জেকের গলা থেকে, তবে জবাব দিলো একা শুধু সারা।

‘ও ধরা পড়ার সময় রাস কুল্লাহ শহরে ছিলো কিনা জানি না, থাকলে বেঁচে নেই।’

নিশ্চিন্ততার ভেতর ঠাণ্ডা বাতাস করুণ বিলাপের মতো লাগলো ওদের কানে। পুরুষ দু'জন অটল পাথরের মতো তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারে, দু'জনেই রাগ আর ভয়ের হাতে বন্দী।

‘তবে রাস কুল্লাহ'র স্বভাব হ'লো পাহাড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা,’ আবার বললো সারা। ‘যুদ্ধ থামলে লুটপাট করার জন্যে নেমে আসে সে। সে না আসা পর্যন্ত তার লোকেরা খুন-খারাবিতে হাত দেয় না। আর ভিকির ব্যাপারটা তো আরো আলাদা—রাস কুল্লাহ ওকে কষ্ট পেয়ে মরতে দেবে, গাভীদের সাথে বসে। শুনেছি, ছোটো ছোটো ছুরি দিয়ে জ্যান্ত একজন মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারে ওরা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপরও নাকি মানুষটা অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে.....।’

সংবিলে ফিরলো গ্যারেথের ডাকে। ‘আমি তৈরি, ওল্ড চ্যাপ। তোমার কী খবর?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরলো জেক। হ্যাচ গ'লে ড্রাইভারের সিটে নেমে গেলো ও।

ফুন্ট-লাইন ট্রেঞ্চগুলোর কাছে ফিরে এলো গ্রোগোরিয়াস মারিয়াম। গিরিখাদের মাথার ওপর সরু আকাশের ক্ষীণ আলোর আবাস দেখে দ্বিধায় পড়ে গেলো সে, ঠিক

বুঝতে পারলো না ভোর হ'তে যাচ্ছে কিনা। এরইমধ্যে ট্রেঞ্চের ভেতর নড়াচড়া শুরু হয়েছে, প্যারারফিন ল্যাম্প তুলে ওর মুখে আলো ফেললো গোত্রপ্রধানের একজন দেহরক্ষী। গ্রেগোরিয়াসকে চিনতে পেরে স্বস্তি বোধ করলো সে। 'উনি আপনার খোঁজ করছিলেন।'।

ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে লোকটার পিছু নিলো গ্রেগোরিয়াস। সাবধানে পা ফেলে এগোতে হ'লো তাকে, কাদার ওপর শয়ে শয়ে আদিবাসী যোদ্ধারা শুয়ে রয়েছে।

ধূসর একটা কবলের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন রাস গোলাম, মেইন ট্রেঞ্চ থেকে খানিকটা দূরে বড় একটা গহ্বরের ভেতর ব'সে রয়েছেন তিনি। গর্তের খোলা মাথাটা তাঁবুরে ক্যানভাস দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে, মাটিতে ছোটো একটা আগুন জ্বলছে, চারদিকে ধোঁয়া। দেহরক্ষী আর সর্দাররা ঘিরে রয়েছে রাস গোলামকে, শান্ত ভাবে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো গ্রেগোরিয়াস। গোত্রপ্রধান মুখ তুলে তাকালেন।

'বিদেশী বন্ধুরা কি চলে গেছে? জিজ্ঞেস করলেন রাস গোলাম, খকখক করে কাশলেন খানিক, প্রাচীন শরীরটা অসম্ভব ঝাঁকি খেলো।

'ভোরে ওঁরা ফিরে আসবেন, হামলা শুরু হবার আগেই,' জেক আর গ্যারেথের পক্ষ নিয়ে তাড়াতাড়ি বললো গ্রেগোরিয়াস, তারপর ধীরে ধীরে ওদের চলে যাওয়ার কারণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলো সে।

মাথা ঝাঁকালেন রাস গোলাম, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন আগুনের দিকে, তার চোখে লাল অগ্নিশিখা নাচতে লাগলো। গ্রেগোরিয়াস থামতেই কাঁপা কাঁপা, ঝগড়াটে গলায় কথা বললেন তিনি, 'এটা একটা সংকেত-স্রষ্টা আমাকে বলছেন, রাস, আর দেরি করো না। বিদেশী সমরনায়কের পরামর্শ অনেক শুনেছি, বহু কষ্টে বহুদিন ধ'রে বুকে চেপে রেখেছি। প্রতিশোধের গনগনে আগুন। আর নয়, গ্রেগোরিয়াস, আর নয়! আমার মা ছিলো সিংহী, বীরঙ্গনার গর্ভে আমার জন্ম-নিজেকে আর কতো দিন দাবিয়ে রাখবো? অনেক দিন হ'লো শত্রুরা আমাকে লাথি মারছে, আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়!'

খকখক করে কাশলেন তিনি।

'অনেক দৌড়েছি আমার, শুধু পেছন দিকে। এবার আমরা রুখে দাঁড়াবো শত্রুর বিরুদ্ধে। যাও, সবাইকে ঘুম থেকে তোলো। সবাইকে বলো, হাজার বছরের পুরনো সংকেত বাজবে-বাজবে আমার ড্রামগুলো।' কবল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে এক লাফে সিঁধে হলেন কামান লিজ। 'ড্রামের শব্দ শুনতে বলো সাইকে।' আশপাশ থেকে চাপা গর্জন শোনা গেলো, দেহরক্ষী আর সর্দারদের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। 'ভোর হওয়া পর্যন্ত বাজবে আমার ড্রাম,' ব'লে চলেছেন রাস গোলাম। 'তারপর যখন ড্রাম থামবে, তখনই সময়!' কারো খেয়াল নেই সম্পূর্ণ নগ্ন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তাঁর নিজরও না। 'আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আমি রাস গোলাম, তোমাদের সামনে থাকবো, ছুটে যাবো শত্রুর উদ্দেশ্যে, তাদের খেদিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো মরুভূমিতে, ঠেলে ফেলে দেবো সাগরে। নিজেদের যারা বীরযোদ্ধা ব'লে মনে করে, পবিত্র মাতৃভূমির ওপর যাদের

এতোটুকু মায়া আছে, যারা স্বাধীনতায় করে, অবশ্যই তারা আমাকে অনুসরণ করবে।' লু-লু উলুধ্বনিতে তাঁর বাকি কথা চাপা পড়ে গেলো, গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন তিনি।

সর্দারদের একজন এক মগ তেজ ধরলো গোত্রপ্রধানের সামনে। মগের ভেতর। তাকিয়ে ঢকঢক করে তেজটুকু গলাধঃকরণ করলেন রাস গোলাম।

লাফিয়ে সামনে এগিয়ে এলো গ্রেগোরিয়াস, বুড়ো দাদার একটা বাহু চেপে ধরলো সে। 'দাদা!'

ঝট করে তার দিকে ফিরলেন রাস গোলাম, চোখে আগুন ঝরছে। 'তুমি যদি মেয়ে মানুষের মতো করো, তোমাকে আমি নাতি ব'লে স্বীকার করবো না! আমার গায়ে যখন হাত দিয়েছো, তখন আমার মতো করে চিন্তা করতে চেষ্টা করো।'

হঠাৎ দাদার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ দিবালোকের মতো পরিষ্কার বুঝতে পারলো গ্রেগোরিয়াস। উপলব্ধি করলো, তার দাদা কী করতে চাইছেন। তার দাদা বুঝতে পেরেছেন, স্রষ্টা আদিবাসীদের ওপর সম্ভ্রষ্ট নন, তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, এখন যুদ্ধ করলেও হারতে হবে, না করলেও মরতে হবে। এই যখন পরিস্থিতি, একটা স্বাধীনচেতা জাতির সামনে আর কী করণীয় থাকে, আত্মত্যাগ করা ছাড়া?

নতুন আর প্রাচীরের মধ্যে নিঃশব্দে বিনিময় হ'লো উপলব্ধি আর সমঝোতার বার্তা।

রাস গোলাম বললেন, 'যদি তোমার বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে থাকে, তাহলে আমার আশীর্বাদ পাবার জন্যে নত হও।'

দাদার পায়ের ওপর মাথা ঠেকালো গ্রেগোরিয়াস। তার নগ্ন ঘাড়ের গরম এক ফোঁটা পানি পড়লো। চোখে বিস্ময় নিয়ে মুখ তুললো গ্রেগোরিয়াস। বৃদ্ধ রাস গোলাম হাসছেন, কিন্তু দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে চোখের পানি।

ছোটো একটা কুঁড়েঘর, মাটির সঁাতসেঁতে মেঝেতে পড়ে আছে ভিকি কেমবারওয়েল। সম্ভ্রবত সারডি শহরের এই একটাই ঘরে আগুন ধরানো হয় নি। ঘরটা শহরের এক প্রান্তে, মেঝেতে কিলবিল করছে কেঁচো, নরম স্পর্শ নিয়ে মোচড় খাচ্ছে ভিকির গায়ে। ইঁদুরগুলো ছোটো, কিন্তু এরইমধ্যে শিকারের অসহায় অবস্থা টের পেয়ে গেছে ওগুলো, ক্ষুদ্রে ধারালো দাঁত দিয়ে কাপড়ে আর চামড়ায় কামড় বসাচ্ছে। কাদার মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে ভিকি।

তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, এক করে বাঁধা হয়েছে গোড়ালি জোড়াও।

বাইরে থেকে ভেসে আসা আগুনের শৌঁ শৌঁ আওয়াজ পরিষ্কারই শুনতে পাচ্ছে ভিকি, মাঝে মাঝে ছাদ ধসে পড়ার আওয়াজও চিনতে পারছে। বুঝতে পারছে, বাইরে বহু গালা ভিড় করে আছে, অনর্গল কথা বলছে তারা, হাসাহাসি করছে। বেহ খেয়ে প্রায় সবাই ওরা মাতাল হয়ে আছে। তাদের শোরগোল ছাপিয়ে মাছে মাছে শোনা যাচ্ছে রাসটা আর হারারি বন্দীদের আতর্জিত্কার। বন্দীদের বেশির ভাগকেই জবাই

করা হয়ে গেছে, দু'পাঁচজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের টেসটিকল কাটার জন্যে—সেটা রাস কুল্লাহ'র উপস্থিতিতে ঘটবে। সবার মধ্যে একটা অপেক্ষার ভাব। দখল করা শহরে যে-কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রাস কুল্লাহ গালা।

ঘরের ভেতর কতোক্ষণ পড়ে আছে ভিকি জানে না। তার হাত আর পায়ে কোনো সাড়া নেই, নাইলনের রশিতে শক্ত গিট দেয়া হয়েছে, মাংস কেটে ভেতরে ডেবে গেছে। পাঁজরের নিচে যেখানে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা হয়েছিল, জায়গাটা ব্যথায় টন টন করছে সারাক্ষণ। আধ খোলা দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস ঢুকছে, টকটক করে কাঁপছে সে। দু'সারি দাঁত বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সাথে। যতোবারই পাশ ফিরতে চেয়েছে ভিকি, বুকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড প্রতিবার লাথি মেরেছে তার পেটে।

এক সময় প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললো ভিকি, তবে পুরোপুরি নয়। আচ্ছন্ন একটা ভাবের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতেও বাইরের কোলাহল শুনতে পেলো সে, মনে হ'লো অস্তিত্ব হারিয়ে শূন্যে ভাসছে তার শরীর, সময় থেকে গেছে নাকি বয়ে চলেছে ধারণা নেই। মনের ভয় দূর হয়ে গেলো, শারীরিক কষ্ট অনুভব করলো না।

এই দুর্দশার মধ্যে কতোক্ষণ কেটেছে জানে না, আরেকটা লাথি খেয়ে সচেতন হ'লো ভিকি। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে। বুঝতে পারলো, বাইরে লোকসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। মনে হলো, কয়েক হাজার লোক একযোগে কী যেনো একটা দাবি জানাচ্ছে। একন লোক টেনে তুললো তাকে, এতোক্ষণে সে দেখলো গার্ডের সংখ্যা বেড়ে তিনজন হয়েছে। তাদের দু'জন তর শরীরে হাত দিলো, বাকি একজন মেঝেতে ব'সে ছুরি দিয়ে কেটে দিলো গোড়ালির বাঁধন। সিঁধে হ'লো লোকটা, ভিকির হাতের বাঁধনও কেটে দিলো সে। পিঠ আর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাকি দু'জনের হাত গা থেকে খসাতে চেষ্টা করলো সে, পরমুহূর্তে অনুভব করলো হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পড়ে যাচ্ছে সে।

কিন্তু না, তাকে পড়তে দেয়া হ'লো না। তিনজন লোক নিজেদের হাতের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখলো তাকে, টেনে নিয়ে চললো দরজার দিকে।

কুঁড়ে ঘরের সামনে সরু রাস্তাগুলো গালাদের ভিড়ে ঢাকা পড়ে আছে। দোরগোড়ায় ভিকিকে দেখামাত্র কুৎসিত চেহারাগুলো সামনের দিকে ঝুঁকলো ভালো করে দেখার জন্যে। চারদিকে ধোঁয়া আর অসংখ্য মশাল, গার্ডদের কর্কশ নির্দেশে ভিড় সামান্য একটা ফাঁক হলো, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে ভিকিকে টেনে নিয়ে চললো তারা। চারপাশের ভিড় থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়লো গালারা। চারদিক থেকে ছুটে এলো বর্বরদের লোভী হাত, হাসতে হাসতে হাতের লাঠি দিয়ে সেগুলো ঠেকালো গার্ডরা। চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারছে না ভিকি, এখনো তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা। রেলওয়ের উঠানে ঢুকলো ভিড়টা, পাশ কাটালো পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে থাকা লাশগুলোকে। এরা সবাই গুদামের ভেতর শুয়ে ছিলো, নিজের হাতে এদের সেবা-শুশ্রূষা করেছে ভিকি। খুন করার পর প্রতিটি লাশের গা থেকে কাপড়চোপড় সব খুলে নিয়েছে গালারা।

গোটা উঠানে কয়েক শো মশাল জ্বলছে। গুদামের বারান্দার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় মোটা গদির ওপর বসা লোকটাকে চিনতে পারলো ভিকি। সরীসৃপের মতো ঠাণ্ডা চোখ ঢুলঢুলু। গায়ের চামড়ার নিচে মাংস যেনো নরম কাদা, কখনো যেনো রোদে বেরোয় নি। ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, কাঁচা মাংসের মতো লালচে। প্রথমবারের মতো, এবারও লোকটা যে শুধু ভিকির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘনঘন দৃষ্টি বুলালো তাই নয়, বৃকের ওপর আর তলপেটের নিচের দিকে একদৃষ্টে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলো। ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো ভিকির সারা শরীর। কিন্তু রাস কুল্লাহ কেনো ওখানে গদির ওপর ব'সে আছে বুঝতে পেরে ঘৃণা বা রাগ নয়, আতংকে কাঁপতে শুরু করলো সে। বারান্দাটা উঁচু, বন্দিণীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপযোগ করার জন্যে দু'পাশে দুই গাভীকে নিয়ে বসেছে রাস কুল্লাহ।

নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো ভিকি, ধস্তাধস্তি শুরু করলো সে। কিন্তু টেনে-হিঁচড়ে সামনে আনা হ'লো তাকে, তারপর তিনজন মিলে শূন্য তুলে ফেললো।

দেড় মানুষ উঁচু অসম্ভব ভারি তিনটে গালা বল্লম মাটিতে গাঁথে একটা তেপায়া তৈরি করা হয়েছে, ইস্পাতের তৈরি ডগাগুলো এক করে বাঁধা হয়েছে দেখতে। তিনজনের সাথে পারলো না ভিকি, তার পা আর হাত টেনে ধরা হলো, আবার সে অনুভব করলো কবজি আর গোড়ালি বাঁধা হচ্ছে।

গার্ডরা কাজ সেরে পিছিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ালো ভিড়ের গায়ে, ভিকি দেখলো তেপায়ার মাঝখানে বুলছে সে, শরীরের ভারে রশি-বাঁধা কবজি হাড় ভেঙে যাবে ব'লে মনে হলো।

মুখ তুললো ভিকি। সরাসরি তার সামনে, গুদাম ঘরের বারান্দার ওপর, ব'সে রয়েছে রাস কুল্লাহ। চিৎকার করে কী যেনো বললো সে, বুঝলো না ভিকি, আতঙ্ক আর ব্যথায় বিস্ফারিত চোখে তার মোটা ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলো শুধু। মোটা ঠোঁট ফাঁক হলো, বাইরে বেরিয়ে এলো সাপের মাথার মতো কালো জিভের ডগা, ঠোঁট চাটলো।

তারপর হঠাৎ খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠলো রাস কুল্লাহ, দুই কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো দু'পাশে বসা যুবতীদের পাঁজরে।

মেয়ে দুটো উঠানে নেমে এলো, বহুরঙা সিল্ক পোশাক মশালের আলোয় ঝলমল করছে, আলোর দ্যুতি ছড়চ্ছে গা-ভর্তি গহনা।

যেন আগেই মহড়া দেয়া ছিলো, ঝুলন্ত ভিকির দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তারা। তাদের চেহারা ভাবগম্ভীর, চোখ ঢুলঢুলু, হাবভাবে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা, দৃষ্টিতে ফুটে আছে প্রায় পবিত্র একটা আলো।

তারা যখন হাত তুলে ওকে স্পর্শ করতে গেলো, চমকে উঠে ভিকি দেখলো তাদের হাতে ছোটো দুটো ছুরি রয়েছে। ভয়ে চিৎকার করতে চাইলো সে, কিন্তু গলা থেকে শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুলো। মোচড় খেলো ভিকি, ঘাড় আর মাথা অসম্ভব বাঁকা করে ছুরির পলাটা দেখার চেষ্টা করলো।

দক্ষ হাতে, অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে ভিকির গা থেকে কাপড়গুলো কেটে নামিয়ে নিলো তারা। গলার কাছে ব্লাউজের কিনারায় ছুরির ডগা ঠেকিয়ে নামিয়ে আনলো নিচের দিকে। ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ার ফাঁক হয়ে গেলো, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো দুধ-আলতা রঙের বুক। ঘ্যাঁচ করে আরেক পোঁচে স্কার্টটা কেটে ফেললো, শুকনো পাতার মতো খসে পড়লো সেটা কোমর থেকে।

হাততালি দিলো রাস কুল্লাহ। কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়লো গালারা। কিন্তু তারপরই আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো উঠানে। সবাই অধীর আশ্রয়ের সাথে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, কারো চোখে পলক নেই, এমন সুন্দর আর উত্তেজনাকর দৃশ্য থেকে মুহূর্তের জন্যের কেউ বঞ্চিত হ'তে চায় না।

সামনের দিকে মাথা নোয়ালো ভিকি, চুলগুলো ঢেকে দিলো তার কান্না ভেজা মুখ। যুবতীদের একজন সরে এলো, দাঁড়লো ভিকির সরাসরি সামনে। হাত তুললো সে। ছুরির ফলাটা ঠেকালো ঠিক গলার নিচে সাদা চামড়ায়। ওখানে একটা শিরা ফাঁদে পড়া ক্ষুদ্র প্রাণীর মতো লাফাচ্ছে। ধীরে ধীরে, অসহ্য রকম মন্ত্রগতিতে, ছুরির ফলাটা নিচের দিকে নামতে শুরু করলো।

ভিকির গোটা শরীর ঝাঁকি আর মোচড় খেতে লাগলো, হাত আর পা আড়ষ্ট, পিঠ এমন বাঁকা হয়ে উঠলো যে মসৃণ ফর্সা ত্বকের নিচে থেকে মাথাচাড়া দিলো প্রতিটি পেশি।

পিছন দিকে নিষ্কিণ হ'লো তার মাথা, নিষ্পলক চোখ বিস্ফারিত, খোলা মথ মস্ত হাঁ হয়ে আছে, গলার ভেতর থেকে রোমহর্ষক চিৎকার বেরিয়ে এলো।

যুবতী গালার কোনো দিকে দ্রক্ষেপ নেই, গভীর ধ্যানমগ্নতার সাথে সে তার কাজে ব্যস্ত। ফোলা কিন্তু টানটান স্তন জোড়ার মাঝখান দিয়ে নামিয়ে আনলো সে ছুরির ফলাটা। ধারালো ডগা সাদা চামড়ায় অগভীর রেখা তৈরি করছে, উজ্জ্বল লাল একটা সরলরেখা দীর্ঘ হ'লো প্রতি মুহূর্তে।

উল্লাসে ফেটে পড়লো জনতা, তাদের চাপা গর্জন অনেকটা যেনো দূর থেকে ভেসে আসা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো, দ্রুত কাছে সরে আসছে। তাদের সাথে হাসছে রাস কুল্লাহ, কিন্তু তার সে হাসি কেউ শুনতে পাচ্ছে না। গদির কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে। তার চোখ পাথরের মতো চকচক করছে, ফাঁক হয়ে আছে ভিজে ঠোঁট।

একই সাথে দুটো ঘটনা ঘটলো। স্টেশন বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে ঘোর অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে রূপকথায় শোনা দৈত্যের মতো ধেয়ে এলো কুৎসিতদর্শন প্রিসিলা, এক পলকে ঢুকে পড়লো মশালের লালচে আলোর ভেতর। এক সেকেন্ড আগেও আর্মারড কারের শব্দ শুনতে পায় নি কেউ-জনতার সম্মিলিত চিৎকারে সেটা চাপা পড়ে ছিলো।

ইস্পাতের ভারি খোল, পুরনো বেস্টলি এঞ্জিনের ঘাড় চেপে, ঝাঁপিয়ে পড়লো নিশ্চিন্ত ভিড়ের গায়ে। মাংস আর হাড়ের নিরেট পাঁচিলটাকে বাধা ব'লে মানলো না প্রিসিলা, ক্ষেত জুড়ে খাড়া হয়ে থাকা আখের ওপর দিয়ে যেনো ছুটলো একটা বুলডোজার। গতি এতোটুকু মন্ত্র না করে ভিড়ের ভেতর দিয়ে নিজের পথ করে নিলো

আর্মারড কার, নাক বরাবর সোজা এগেলো ফাঁকা জায়গাটায় যেখানে বল্লমের তৈরি তেপায়ার মাঝখানে ঝুলছে ভিকি কেমবারওয়েল।

প্রিসিলার সাথে এই মুহূর্তে, অন্ধকার গুদামঘরের দোরগোড়া থেকে বারান্দায় পা রাখলো গ্যারেথ সোয়েলস্, রাস কুল্লাহ যেখানে বসে আছে ঠিক তার পিছনে।

আহত হাতের ভাঁজে দখল করা ইতালিয়দের রাইফেল, সেটার বাঁট কাঁধে না তুলেই গুলি করলো সে।

গালা যুবতীর ছুরি ধরা হাতের কনুই চুরমার করে দিলো বুলেট, শুকনো সরু ডালের মতো মট করে ভেঙে গেলো হাতটা, অনুভূতিহীন আঙুল থেকে উড়ে গেলো ছুরিটা। তার চিৎকার তীক্ষ্ণ বাঁশির মতো বাজলো কানে, আছাড় খেয়ে পড়লো সে ভিকির পায়ের কাছে কাদার ওপর।

দ্বিতীয় যুবতীয় শরীরে যেনো বিদ্যুৎ খেলে গেলো। এক লাফে ভিকির সামনে চলে এলো সে, ডান হাতটা পিছিয়ে গেলো ঠিক যেনো ছোবল মারতে উদ্যত একটা কেউটের মাথার মতো, ছুরিটা সে তাক করলো ভিকির হৃৎপিণ্ডের দিকে। তার চোখ জ্বলছে, নাকের ফুটো ঘনঘন বড় হচ্ছে। ছুরি ধরা ডান হাত ছুটে গেলো, হাতল পর্যন্ত ডেবে যাবে নরম মাংসের ভেতর—রাইফেল মাজল চুল পরিমাণ ঘুরিয়ে আবার ফায়ার করলো গ্যারেথ।

ভারি বুলেট তার তামাতে কপালের ঠিক মাঝখানে ঢুকলো। সদ্য তৈরি কালো গর্তটাকে মনে হ'লো তৃতীয় একটা চোখের খালি কোটর, পিছন দিকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো মাথা।

মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে, বোল্ট টেনে আবার রাইফেল মাজল সামান্য ঘোরালা গ্যারেথ। কিন্তু রাস কুল্লাহ মোচড় খেয়ে পিছন দিকে তাকালো, গদিগুলো আঁকড়ে ধরে সামনে তোলার চেষ্টা করছে সে, আড়াল পেতে চায়। তার মুখ হাঁ হয়ে আছে, ঘড়ঘড়ে কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। রাইফেল মাজলটা আস্তে করে ঢুকে গেলো মুখের ভেতর। তৃতীয়বার গুলি করতেও ইতস্তত করলো না গ্যারেথ।

ঘাড়ের পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেলো বুলেট, গর্তটায় মুঠো পাকানো একটা হাত অনায়াসে ঢুকে যাবে। বারান্দা থেকে উঠানে পড়ে বোবা ব্যাঙের মতো লাফাতে লাগলো রাস কুল্লাহ।

লাফ দিয়ে তাকে টপকালো গ্যারেথ, নেমে এলো উঠনের মাটিতে। মাথার ওপর তলোয়ার খাড়া করে ছুটে এলো একজন গালা। রাইফেল না তুলে আবার গুলি করলো গ্যারেথ, লাশটা টপকে স্থির হ'লো ভিকির পাশে, সেই মুহূর্তে ওদের সামনে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো প্রিসিলা, হাচ গ'লে টারিটে উঠলো জেক, হাতে হারারি ড্যাগার নিয়ে লাফ দিলো।

ওদের মাথার ওপর, টারিটে বসে, ভিকার্স মেশিনগান ঘোরাচ্ছে সারা। একনাগাড়ে, কোনো বিরতি ছাড়াই, গুলি ছুঁড়ছে সে। আতংকে অস্থির গালারা অন্ধকারের ভেতর যে যেদিকে পারলো ছুটলো, পিছনে ফেলে গেলো অগণিত লাশ।

ভিকির হাত আর পায়ের বাঁধন কেটে দিলো জেক, সামনের দিকে চলে জেকের বুক পড়লো সে, দু'হাত দিয়ে তাকে ধ'রে ফেললো জেক।

ঝুকলো গ্যারেথ, ভিকির ছেঁড়া কাপড়গুলো এক করে তুলে আহত বগলের নিচে রাখলো। 'এবার বোধহয় ফেরা উচিত, ওন্ড সন?' দরাজ গলায় প্রশ্ন করলো সে। 'আমার ধারণা এখানে আর কোনো মজা নেই।' দু'জন ধরাধরি করে ভিকিকে তুলে দিলো ওরা প্রিসিলার টারিটে।

কাউন্ট আলদো বেলিনির স্বপ্নিল ঘুম ভাঙলো ড্রামের শব্দে। সটান উঠে বসলো সে ট্যাংকের শক্ত মেঝেতে। চোখ বড় বড়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। পিস্তলটা পাবার জন্যে উন্মাদের মতো হাতড়াতে লাগলো অন্ধকারে।

'জিনো!' প্রায় কেঁদে ফেললো কাউন্ট, ড্রামের শব্দ তার বুক হাতুড়ি ঠুকছে। 'জিনো!' কিন্তু সার্জেন্ট জিনোর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

দ্রিমদ্রিম শব্দটা পাগল করে তুললো তাকে। দু'হাতে কান চাপা দিলো, কিন্তু তবু শুনতে পাচ্ছে, শব্দের সাথে কাঁপছে ট্যাংকের খোল, কাঁপছে তার গোটা অস্তিত্ব। সহ্য করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো, জানে না কোথায় যাচ্ছে। এক সময় পিছনের হ্যাচ ঠেকলো হাতে, সেটা খুলে বাইরে মাথা বের করলো সে। 'জিনো!'

এবার সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেলো। খর্বকায় সার্জেন্ট ট্যাংকের জোড়া স্টীল ট্র্যাক-এর মাঝখানে পাথুরে মাটির ওপর কমল মুড়ি দিয়ে গুয়ে আছে। কাউন্টের ডাক শুনে মুখ থেকে কমল সরালো সে, কাউন্ট শুনতে পেলো জিনোর দাঁতগুলো সচল টাইপরাইটারের মতো শব্দ করছে।

'ড্রাইভারকে পাঠিয়ে এই মুহূর্তে খবর দাও মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানিকে।'

'এই মুহূর্তে।'

কমল গায়ে নিয়েই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো জিনো, কয়েক মিনিট পর এমন হঠাৎ করে আবার উদয় হ'লো সে যে আঁতকে উঠে তার কপাল বরাবর পিস্তল তাক করলো কাউন্ট।

'এক্সপ্লেসী!' করুণা ভিক্ষা করলো জিনো।

'গাধার লেজ!' খেঁকিয়ে উঠলো কাউন্ট, আতংকে খসখসে তার কণ্ঠস্বর। 'আরেকটু হলেই তো খুন হয়ে যাচ্ছিলে-জানো না, পিতার মতো ক্ষিপ্ত আমি?'

'এক্সপ্লেসী, আমি কি ট্যাংকের ভেতর ঢুকতে পারি?'

অনুরোধটা এক মুহূর্ত বিবেচনা করলো কাউন্ট, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো সে। 'আগে আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দাও।' কিন্তু কফি যখন এলো, কাউন্ট বিমর্ষ দৃষ্টিতে দেখলো ড্রামের শব্দ তার নার্ভের এমনই বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে যে,

মগটা হাত দিয়ে ধ'রে রাখতে পারছে না সে, মগের কিনারা দাঁতের সাথে ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে।

‘ছাগলের মৃত বানিয়ে এনেছো!’ মারমুখো হ'লো কাউন্ট, জিনোকে অস্থিরতার মধ্যে রাখতে চায়, যাতে সে দেখতে না পায় তার হাত কাঁপছে। ‘এ তো বিষ! আমাকে খুন করার ফন্দি!’ কফিসহ মগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। ঠিক সেই মুহূর্তে গিরিখাদের গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো মেজর লুইগি ক্যাস্তেলানির বিশাল দেহ।

‘যোদ্ধারা এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে, মাই কর্নেল,’ ভারি গলায় বললো সে। ‘আর পনেরো মিনিট পর দিনের আলো ফুটলে...।’

‘গুড। গুড।’ তাকে থামিয়ে দিলো কাউন্ট, ড্রামের শব্দ এড়াবার বুদ্ধি বের করে ফেলেছে সে। ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই মুহূর্তে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবো। জেনারেল ফাদের সাথে জরুরি একটা বিষয়ে পরামর্শ...।’

‘চমৎকার, মাই কর্নেল,’ এবার মেজরই বাধা দিলো তাকে। ‘আমার কাছে গোপন রিপোর্ট আছে, শত্রুপক্ষের বিরাট একটা দল পাহাড় উপকূলে আমাদের পিছনে, ডানাকিল মরুভূমিতে পৌঁছেছে। আপনি গিরিখাদ থেকে বেরুবার সাথে সাথে, সম্ভাবনা আছে তাদের সামনে পড়ে যাবেন।’ ইতিমধ্যে কাউন্টকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সুযোগ হয়েছে মেজরের, জানে কী রোগের কী দাওয়াই। ‘আপনার সাথে ছোটো একটা এসকর্ট থাকবে, কিন্তু তাতে কী, আপনি একাই তো একশো-শত্রুদের দলটা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

‘কিন্তু আমি সিরিয়াসলি ভাবছি,’ গলায় অপ্রত্যাশিত জোর ফুটিয়ে বললো কাউন্ট, ‘আমার মনটা সন্তানতুল্য সৈনিকদের মাঝখানে রয়ে যাচ্ছে কিনা। মানুষের জীবনে এমন একটা সময়ও আসে যখন মাথার কথা না শুনে, শুনে হয় হৃদয়ের কথা। এবং তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ক্যাস্তেলানি-রক্তে আমার যুদ্ধ করার নেশা জাগছে।

‘শুনে ধন্য হলাম, মাই কাউন্ট।’

‘আমি এই মুহূর্তে অ্যাডভান্স করবো,’ ঘোষণা করলো কাউন্ট, পিছনে শত্রুপক্ষের বিরাট দল আছে শুনে সামনে পালাতে চাইছে সে। ‘সাহসী যোদ্ধারা ভোর হবার অপেক্ষায় ব'সে থাকে না, বুঝলে?’

প্রস্তুতি নিতে নিতে ক্ষীণ আলো ফুটলো আকাশে, আর সেই সাথে অকস্মাৎ থেমে গেলো ড্রাম পেটানোর আওয়াজ। আকস্মিক নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মতো বাজলো কাউন্টের কানে, মুখ তুলে গিরিখাদের ওপর দিকে তাকালো সে।

ধীরে ধীরে নতুন একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়লো স্তব্ধ বাতাসে। রাতের আকাশে পাখির ডানা ঝাপটানোর মতো, অথচ সম্পূর্ণ অচেনা। তারপর আরেকটা শব্দ যোগ হলো,

ক্ষীণ কিন্তু পরিষ্কার-বহুকাণ্ডের সম্মিলিত লু-লু। যেনো কয়েক শো লোক একসাথে আওয়াজ করছে।

‘মাতা মেরী, যীশু, যীশুর বাপ!’ ভয়ে আর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলো কাউন্ট।

প্রথমে মনে হ’লো পাথরের ধস নেমে আসছে। সেই সাথে লুলু ধ্বনিতে কঁপে উঠলো পাথর, মাটি, পাহাড় প্রচীর, ট্যাংকে আর কাউন্টের গোটা শরীর। তারপর চেনা গেলো আকৃতিগুলো-পাথর নয়, মানুষের ঢল।

ক্যাস্তেলানি, তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবো!’ চিৎকার করলো কাউন্ট। ‘তুমি না বলেছিলে শত্রুপক্ষ হামলা করবে না?’ কিন্তু তার চিৎকার চাপা পড়ে গেলো মেজর ক্যাস্তেলানির কর্কশ কমান্ডে। পরমুহূর্তে সামনের লাইনে থেকে গর্জে উঠলো মেশিনগানগুলো।

হারারি যোদ্ধারা ঘরভাঙা পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে গিরিখাদে। দলে দলে, শয়ে শয়ে নেমে আসছে তারা। ঢেউ খেলানো গেমের ক্ষেত যেন, আলাদাভাবে কাউকে চেনার উপায় নেই। লাশের ওপর জমা হ’তে লাগলো লাশ, তবু তাদের অগ্রযাত্রায় বিরাম নেই। মুঘলধারে বুলেট-বৃষ্টি হচ্ছে, ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে জনারণ্য, পিছন থেকে এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় সারি, চোখের পলকে লাশে পরিণত হচ্ছে সবাই, তাদেরকে টপকে এগিয়ে আসছে আরেক দল।

অবিস্বাস্য দৃশ্যটা আতংক ভুলিয়ে দিলো কাউন্টকে। সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকলো সে। বুলেট বৃষ্টি এড়িয়ে শত্রুরা সামনে বাড়তে পারছে না, তবু দু’একজন কিভাবে যে ফাঁক-ফোকর গ’লে একেবারে সামনে চলে এলো কেউ বলতে পারবে না। মেজর ক্যাস্তেলানির নির্দেশে তৈরি কাঁটাতারের বেড়ার সামনে পৌঁছেও থামলো না তারা, ধারালো তলোয়ার দিয়ে তার কাটার চেষ্টা করলো।

কাঁটাতারের বেড়ার কাছে যারা পৌঁছুলো তাদের বেশিরভাগই মারা গেলো প্রথম সারির ইতালিয়দের ট্রেন্কেস সামনে। একটা করে রাইফেল গর্জে ওঠে, একজন করে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেলো, ফাঁক গ’লে ভেতরে ঢুকছে দু’একজন হারারি-মৃত্যুকে তারা বরণ করলো বোয়োনেট বুকে নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দু’জন হারারি, মাটির সাথে সমান হয়ে গেলো বেড়াটা, সেই সাথে মাথায় রাইফেলের বুলেট নিয়ে বেড়ার ওপরই মুখ তুবড়ে পড়লো তারা। পরমুহূর্তে তাদেরকে টপকে ছুটে এলো তিনজন।

তিনজনের নেতৃত্বে রয়েছে কংকালসদৃশ্য এক বৃদ্ধ। সাদা আলখাল্লা পরে আছেন তিনি। মাথায় কোনো চুল নেই, খুলিটা কামানের গোলার মতো চকচক করছে। ঘামের ভেজা মুখে সাদা ধবধবে দাঁত মুক্তোর মতো ঝলমলে। শুধু একটা তলোয়ার বহন করছেন তিনি, অস্বাভাবিক লম্বা আর চওড়া সেটা, মাথার ওপর অনায়াসে বনবন করে ঘোরাচ্ছেন, মেশিনগান আর রাইফেলের বুলেটগুলোকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে পাহাড়ী ছাগলের মতো ক্ষিপ্ততার সাথে প্রতি মুহূর্তে লাফ দিয়ে জায়গা বদল করছেন।

তাকে অনুসরণ করছে দু'জন হারারি, তাদের হাতে মাস্কাতা আমলের রাইফেল। ছুটে আসছে তারা, কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে, তাদের লু-লু চিৎকার চাপা পড়ে গেলো রাস গোলামের রণহংকার।

দলটাকে টার্গেট করে গর্জে উঠলো একটা মেশিনগান। ধরাশায়ী হ'লো সঙ্গী দু'জন, কিন্তু তালগাছের দৈর্ঘ্য নিয়ে আগের মতোই লাফাতে লাফাতে ছুটে এলেন রাস গোলাম।

হতভম্ব কাউন্ট যেনো তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে। তার পাশ থেকে একটা মেশিনগান গর্জে উঠলো, এবার রাস গোলাম সামান্য একটু হেঁচট খেলেন। কাউন্ট দেখলো, বুলেট লেগেছে, টার্গেটের ঢোলা আলখাল্লা থেকে মিহি ধুলো উড়লো, ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো খানিকটা কাপড়, সেই সাথে তাঁর বুকের কাছে ফুটলো লাল রঙ। অথচ এখনো আগের মতোই ছুটে আসছেন তিনি, এখনো তাঁর গলা থেকে রণহংকার বেরুচ্ছে, লাফ দিয়ে পেরিয়ে এলেন প্রথম সারি, নাক বরাবর সোজা এক লাইনে দাঁড়ানো ট্যাংকগুলোর দিকে ধেয়ে আসছেন। তিনি যেনো পরম শত্রুকাউন্ট বাহিনীকে চিনতে পেরেছেন, তাকেই বেছে নিয়েছেন স্বাধীনতা হরণকারীদের অন্যতম হিসেবে। কাউন্টের মনে হলো, একা শুধু তার প্রতিই আক্রোশ নিয়ে ছুটে আসছে লোকটা। লাল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বুকের ওপর, তবু বাতাসে অনবরত শিস তুলছে তলোয়ারের ফলা। হেঁচট খাচ্ছেন তিনি।

মেশিনগানের শেষদফার বুলেটগুলো আঘাত করলো তাঁকে, তাঁর হাত থেকে খসে পড়লো তলোয়ার। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেলো, মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তারপরও ক্রল করে এগোলেন, তাকিয়ে আছেন মুখ তুলে সরাসরি কাউন্টের চোখে। চিৎকার করে কী যেনো বলতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ, কিন্তু আওয়াজের বদলে সাদা দাঁত ডুবে গেলো মুখভরা তাজা রক্তে। গলগল করে রক্তবমি করলেন তিনি। ক্রল করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংকের সামনে পৌঁছে গেলেন। মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন কাউন্টের দিকে, কাউন্ট তার বেরটা তাক করলো রাস গোলামের মাথা লক্ষ্য করে, কিন্তু আঙুল অসাড়া হয়ে গেছে, ট্রিগার টানতে পারলো না।

চোখ বন্ধ করলো কাউন্ট, অনেক চেষ্টা করে এক এক করে পরপর ছ'টা গুলি করলো সে। ছ'ফুট দূরে ছ'বার ঝাঁকি খেলেন রাস গোলাম।

এক মিনিট পর চোখ মেললো কাউন্ট। কৃত্রিম দাঁত মুখ থেকে খসে পড়েছে রাস গোলামের। সেদিকে সভয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। তার শরীর কাঁপছে। রাস গোলাম এখনো তাকিয়ে আছেন তার দিকে, চোখের স্থির মণিতে প্রাণ নেই।

কাউন্টের পাশে এসে দাঁড়ালো মেজর ক্যান্ডেলানি। ঘোষণা করলো, 'গিরিখাদ শত্রুমুক্ত হয়েছে, সারডির পথ সম্পূর্ণ খোলা। তার নির্দেশে একযোগে বেজে উঠলো কয়েকটা বিউগল, দ্রোণ থেকে বেরিয়ে এলো ইতালিয়দের পদাতিক বাহিনী। স্টার্ট নিলো ট্যাংকগুলো।

কমান্ড ট্যাক্টের পথের উপর পরে রইলো প্রাচীন হারারি যোদ্ধার লাশ, যাবার সময় মাটির সাথে পিষে দিয়ে গেলো তাকে স্টিলের চাকাগুলো। যেনো কোনো নেড়ি কুস্তার শব্দেহ ওটা। সারডি গিরিখাদ ধরে ডেসি রোডের উদ্দেশ্যে চলেছে কর্নেল কাউন্ট আলদো বেলিনি।

গিরিখাদের ঠিক ঠোঁটের কাছে বিশাল গ্র্যানিট পাথর সাজিয়ে উঁচু পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে, আর্মারড কলাম দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো। ইতালিয়দের পদাতিক বাহিনী এগিয়ে এলো পাঁচিল ভাঙার কাজে। পাঁচিলের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে বাসটা আর হারারি বাহিনীর কিছু যোদ্ধা, অকস্মাৎ মাথা তুলে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়লো তারা।

আতংকে অস্থির হয়ে দলে দলে পিছিয়ে আসতে শুরু করলো ইতালিয়রা, বেশিরভাগ পড়ে গেলো পাঁচিলের কাছাকাছি গর্তের ভেতর, পাঁচিলের ওপর থেকে ছুটে এলো ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। ট্যাংকের সামনে কয়েক শো লোক ছুটোছুটি করছে, গানাররা সাহস করে গুলি ছুঁড়তে পারলো না।

পরপর তিনবার, গোটা সকাল ধরে, পাঁচিলের কাছ থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হ'লো ইতালিয়দেররা। কামানের গোলা চুঁড়েও পাঁচ ফুট চওড়া গ্র্যানিট পাথরের তৈরি পাঁচিলের তেমন কোনো ক্ষতি করা গেলো না।

অঘোষিত যুদ্ধবিরতি শুরু হবার পর আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে জেক আর গ্যারেথ, বিশাল গ্র্যানিট পাথরে হেলান দিয়ে। দু'জনেই ওরা মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলো জেক।

‘আমি নীল দেখছি।’ পাহাড় চূড়ার মাথায় এখনো রয়েছে মেঘ, তবে শুকনো মরু বাতাসে ভেসে যাচ্ছে দ্রুত, মাঝে মধ্যে দু'একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছে, ফাঁকের ভেতর নীল আকাশ, পরমুহূর্তে ফাঁকটা পূরণ করছে ঘন মেঘের ভেলা।

হঠাৎ উজ্জ্বল এক ঝলক রোদ গোটা উপত্যকা আলোকিত করে তুললো, ছায়া সরে যাওয়ায় সবুজ রঙ নিয়ে হেসে উঠলো যেনো পাহাড়গুলোর ঢাল।

‘জীবন ভারি সুন্দর!’ বিড়বিড় করলো গ্যারেথ।

ঘড়ি দেখলো জেক। ‘এগারোটা সাত। আর একটু পরই রেডিও মেসেজ পাঠাবে ওরা, আকাশ খালি হয়ে গেছে। পাইলটরা ককপিটে বসে আছে, এখানে পৌঁছতে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে ওদের।’

সিধে হয়ে বসলো গ্যারেথ, অক্ষত হাতটা দিয়ে চুল সরালো কপাল থেকে। ‘এক ভদ্রলোকের কথা জানি, ওরা যখন আসবে, তিনি তখন এখানে থাকবেন না।’

‘দু'জন ধরো,’ একমত হ'লো জেক।

‘আমাদের কাজ শেষ, ওল্ড চ্যাপ। যতোটুকু করার করেছি আমরা। দু’চার মিনিট এদিক-ওদিক হলে চকলেট মিখায়েল খিটিমিট করবে ব’লে মনে হয় না। বম্বারগুলো যখন আসবে, দুপুর হ’তে বাকি থাকবে বড় জোর ওই দু’চার মিনিটই।’

‘বেচারা যোদ্ধাদের কী হবে?’ পাথুরে পাঁচিলের নিচে ওদের সাথে যারা ব’সে রয়েছে তাদের দিকে হাত তুলো জেক। সংখ্যায় তারা কয়েক শো হবে, রাস গোলাম বাহিনীর অবশিষ্টাংশ।

‘বম্বার আসার শব্দ পেলেই ছুটবে ওরা, অনুমতি দিয়ে রাখো।’

‘ব্যাখ্যা করে বোঝাবে কে?’ জিজ্ঞেস করলো জেক।

‘যাই, সারাকে ডেকে আনি,’ ক্রল করে এগোলো গ্যারেথ, পাঁচিলের গা ঘেঁষে, কারণ পাহাড়ের মাথায় ইতালিয়দের স্নাইপাররা ব’সে আছে।

পাঁচশো গজ পিছনে ভাঁজবহুল মাটির ওপর চারপাশে কর্কশ ঘাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রিসিলা, ওটাকে আড়াল করে রেখেছে কয়েকটা সীডার গাছ, রাস্তার পাশে।

একবার চোখ বুলিয়েই গ্যারেথ বুঝতে পারলো উদ্ধার করার সময় যে নড়বড়ে ভাবটা ছিলো তা ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে ভিকি, তবে চেহারা এখনো স্নান আর ক্লান্ত, পড়নের ছেঁড়া কাপড়ে শুকনো রক্ত আর মাটির দাগ। কেবিনের মেঝেতে পড়ে রয়েছে দেখে মুখ তুলে তাকালো।

‘কেমন আছে ও?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, খোলা পিছনের দরজা দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো সে। দুটো বুলেট খেয়েছে গ্রেগোরিয়াস, গিরিখাদ থেকে তাকে তুলে এনেছে বিশ্বস্ত দু’জন হারারি।

‘সেরে উঠবে ও, আমার ধারণা,’ বললো ভিকি।

চোখ খুলে ফিসফিস করলো গ্রেগোরিয়াস।

‘মেজর গ্যারেথ—হ্যাঁ, সেরে উঠবো আমি।’

‘উঠতেই হবে, তা না হলে পাওনা শাস্তিটা ভোগ করবে কে? তোমাকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু হামলা করার দায়িত্ব দিই নি।’

‘মেজর সোয়েলস্!’ ঝট করে মুখ তুললো সারা, মায়ের মমতা নিয়ে গ্রেগোরিয়াসকে রক্ষা করতে চাইলো। ‘বীরত্ব আর সাহসের চরম নিষ্ঠা দেখিয়েছে...।’

‘ঈশ্বর! সাহসী আর সৎ মানুষদের কবল থেকে রক্ষা করো আমাকে!’ হাঁপিয়ে উঠলো গ্যারেথ, ‘দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলার জন্যে ওরাই দায়ী।’ সারা আবার তার ওপর ঝাল ঝাড়ার সুযোগ পেলো না, ব’লে চললো গ্যারেথ, ‘আমার সাথে চলো দেখি, কিছু অনুবাদ কর্ম সারতে হবে।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রেগোরিয়াসকে ছেড়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো সারা। বেরিয়ে এলো ভিকিও, ইস্পাতের খোলার পাশে গ্যারেথের কাছাকাছি দাঁড়ালো সে। জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি ভালো তো?’

‘নেভার বেটার,’ ভিকিকে আশ্বস্ত করলো সে, কিন্তু ভিকি দেখলো গ্যারেথের চেহারায় অস্বাভাবিক একটা রঙ ফুটে উঠেছে, চোখে যেনো কিসের একটা নেশা নেশা ভাব।

ঝট করে হাত বাড়ালো ভিকি, গ্যারেথ বাধা দেয়ার আগেই তার আহত হাতটা ধ'রে ফেললো। বেলুনের মতো ফুলে আছে ওটা। চামড়ার রঙ হয়েছে সবুজাভ লালচে, সামনের দিকে ঝুকতেই পুঁজের তীব্র গন্ধ পেলো ভিকি। উদ্বিগ্নের সাথে হাত তুলে গ্যারেথের কপাল স্পর্শ করলো সে।

‘সর্বনাশ! গ্যারেথ, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে!’

‘প্রেম আর আবেগ, ওল্ড গার্ল। তোমার চাঁপা কলার মতো আঙুলের স্পর্শ পেয়েই...।’

‘হাতটা দেখতে দাও আমাকে,’ জেদ ধরলো ভিকি।

‘না দেখাই ভালো।’ ভিকির চোখে চোখ রেখে, ঠোঁট টিপে হাসলো গ্যারেথ। ‘কুকুরগুলো ঘুমাচ্ছে ঘুমাক না, কি? সভ্য জগতে না ফেরা পর্যন্ত কারো কিছু করার নেই।’

‘গ্যারেথ...।’

‘ওখানে পৌঁছে, মাই ডিয়ার লেডি, তোমাকে বড় এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেবো আমি, তারপর খবর পাঠাবে পাদ্রিকে।’

‘গ্যারেথ, সিরিয়াস হও।’

‘এতো সিরিয়াস কখনো ছিলাম না।’ অক্ষত হাতটার আঙুল দিয়ে ভিকির চিবুক স্পর্শ করলো গ্যারেথ। ‘ওটা বিয়ের একটা প্রস্তাব ছিলো,’ বললো সে। ভিকি অনুভব করলো তার আঙুলের ডগা আগুনের মতো গরম।

‘গ্যারেথ! ওহ গ্যারেথ!’

‘ধরে নিলাম তুমি বলছো—থ্যাংকস, কিন্তু না।’

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো ভিকি, কথা বলতে পারলো না।

‘জেক?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, আবার মাথা ঝাঁকালো ভিকি।

‘কী জানো, আরো ভালো কাউকে পেতে পারতে তুমি। যেমন, আমাকে।’ তারপরই নিঃশব্দে হাসলো সে, কিন্তু তাতানো শরীর থেকে ব্যথা আর বিষাদ অদৃশ্য আঁচের মতো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। ‘আবার, আরো অনেক খারাপ কেউ কপালে জুটে যেতে পারতো। যেমন, আমি।’ পরমুহূর্তে ঝট করে সারার দিকে ফিরলো সে, খপ্প করে তার কানুইয়ের ওপরটা খামছে ধরলো। ‘চলে এসো, মাই ডিয়ার।’ হাঁটতে শুরু করে কাঁধের ওপর দিয়ে ভিকির দিকে তাকালো। ‘বম্বার আসছে শুনতে পেলোই ফিরে আসবো আমরা। ছোট্টার জন্যে তৈরি থেকো।’

‘কোথায়?’ ওদের পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

‘এখনো জানি না।’ হেসে উঠলো গ্যারেথ। ‘তবে চিন্তা করো না, নিরিবিলা একটা জায়গা ঠিকই আমরা খুঁজে নেবো।’

প্রথম শুনতে পেলো জেক, এতো দূরে যে বিমানো দুপুরে এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জন ব'লে মনে হলো। প্রায় সাথে সাথে মিলিয়ে গেলো আওয়াজটা, ভেসে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো পাহাড় প্রাচীর।

‘আসছে ওরা,’ বিড়বিড় করলো জেক, যেনো সায় দিয়েই একটা শেল বিস্ফোরিত হ’লো পাঁচিলের অপরদিকে, গিরিখাদের এক মাইল পিছনে আবার জ্যাস্ত হয়ে উঠেছে ইতালিয়দের কামান। হলুদ ধোঁয়ার মোটা একটা স্তম্ভ পাঁচিলের মাথা ছাড়িয়ে রোদ জ্বলা বাতাসে উঠে গেলো।

‘মুভ!’ গর্জে উঠলো গ্যারেথ, কমান্ড হুইসেলটা ঠোঁটে তুলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করলো কয়েকবার।

পাঁচিল ঘেঁষে ছুট দেয়ার আগে জেক আর গ্যারেথ নিশ্চিত হয়ে নিলো রাসটা আর হারারিরা সবাই সীডার জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। জঙ্গল আর পাঁচিলের মাঝখানে উপত্যকায় কেউ নেই। ট্রেঞ্চগুলোও খালি। এবার নিজেরাও ওরা উপত্যকায় বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে বোমারুগুলো একেবারে পিঠের কাছে চলে এসেছে।

একটু থেমে গ্যারেথের অক্ষত হাতটা ধরলো জেক। ‘দৌড়াতে অসুবিধে হচ্ছে?’

মাথা নাড়লো গ্যারেথ, জেকের সাথে তাল মিলিয়ে আরো জোরে পা চালালো, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো একবার পিছন দিকে। দেখাদেখি জেকের।

গিরিখাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো প্রথম বোমারু, প্রসারিত কালো ডানা দুটো গোটা আকাশটাকে যেনো ঢেকে ফেলতে চাইছে। পেট থেকে দুটো বোমা খসলো। একটা পিছনে পড়লো, কিন্তু দ্বিতীয়টা আঘাত করলো পাঁচিলে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো ওরা, কেউ যেনো শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় মারলো ওদেরকে।

আবার যখন মাথা তুললো জেক, দেখলো ধোঁয়া আর আগুনের মাঝখানে পাঁচিলটা ভেঙে গেছে। ‘পালাই হে চলো,’ গ্যারেথকে টেনে তুললো ও। ‘খেল খতম হয়ে গেছে।’

‘আমরা যাচ্ছি কোথায়?’ ওদের নিচে, কেবিন থেকে চিৎকার করে জানতে চাইলো ভিকি; ড্রাইভারের সিট থেকে জেক বা টারিট থেকে গ্যারেথ, দু’জনের কেউই জবাব দিলো না।

‘গাড়ি নিয়ে আমরা যদি সোজা ডেসি রোডে উঠে যাই, অসুবিধে কী?’ জানতে চাইলো সারা, সামনে পা মেলে দিয়ে কেবিনের মেঝেতে ব’সে আছে সে, কোলের ওপর গ্রেগোরিয়াসের মাথা। কাপুরুষ গালাদের সাথে না পারার কিছু নেই, ঠিকই একটা রাস্তা করে নিতে পারবো...।’

‘গ্যাসের যা অবস্থা তাতে আরো পাঁচ মাইল অনায়াসে যেতে পারবো আমরা।’

‘গাড়ি নিয়ে আমরা সাকাল-এর গোড়ায় পৌঁছুতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়,’ প্রায় গোটা দক্ষিণ আকাশ ঢেকে রেখেছে পাহাড়টা, সেদিকে একটা হাত তুলে বললো গ্যারেথ। ‘ওখানে গাড়ি ফেলে হেঁটে পাহাড় উপকাতে হবে।’

হ্যাচ গ’লে টারিটে, তার পাশে উঠে এলো ভিকি, দু’জনেই মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলো আমরা সাকালের দিকে।

‘কিন্তু থ্রেগোরিয়াসের কী হবে? জিজ্ঞেস করলো ভিকি।

‘ওকে আমরা বয়ে নিয়ে যাবো।’

‘পাহাড় উপকানো কোনো দিন সম্ভব নয়। চারদিকে, গালারা গিজগিজ করছে।’

‘আর কোনো বিকল্প জানা আছে?’ জিজ্ঞেস করলো গ্যারেথ, মরিয়া হয়ে নিজের চারদিকে তাকালো ভিকি।

গোটা উপত্যকায় একা শুধু প্রিসিলাই সচল বস্তু। পাহাড়ের পাথুরে ঢালগুলো ধ’রে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাসটা আর হারারিরা। প্রিসিলার পিছনে উপত্যকার ঠোঁট পেরিয়ে যেকোনো মুহূর্তে উঠে আসবে ইতালিয়দের ট্যাংক বহর।

হতাশ হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুললো ভিকি, চূড়াগুলো ছুঁয়ে অল্প কিছু মেঘ এখনো ইতস্তত করছে। হঠাৎ করে তার সমস্ত মনোবল ফিরে এলো, বদলে গেলো গোটা মেজাজ। চিবুক উঁচু করলো সে, মুখে ফিরে এলো সমস্ত রঙ। দুই চূড়ার মাঝখানের ফাঁকটায় হাত তুললো সে, হাতটা কাঁপছে। ‘হ্যাঁ,’ উল্লাসে চিৎকার করলো ভিকি। ‘বিকল্প একটা জানা আছে আমার। তাকাও! উফ, এখনো তাকাচ্ছে না!’

খাড়াভাবে নামতে শুরু করায় ছোট্ট নীল প্লেনটা রোদে ঝিক্ ঝিক্ করে উঠলো, দুই চূড়ার মাঝখানে পৌঁছে সিঁধে করলো ডানা, রঙিন প্রজাপতির মতো ঝলমল করছে গা।

‘ইতালিয়দের প্লেন?’ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো গ্যারেথ।

‘না! না!’ দ্রুত মাথা নাড়লো ভিকি। ‘ওটা প্রিন্স মিখায়েলের প্লেন। চিনি, আমি চিনি। প্রিন্সকে নেয়ার জন্যে আগেও একবার এখানে এসেছিল।’ প্রায় উন্মাদিনীর মতোই হাসছে সে, দামী পাথরের মতো চকচক করছে চোখ। ‘প্রিন্স বলেছিল, ওটা পাঠাবে সে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সময় এই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছিল সে...।’

‘ল্যান্ড করবে কোথায়?’ জানতে চাইলো গ্যারেথ।

হ্যাচ গ’লে ড্রাইভারের পাশে নেমে গেলো ভিকি কেমনবারওয়েল, পথ নির্দেশ দিয়ে পোলো গ্রাউন্ডের দিকে নিয়ে চললো গাড়িটাকে। শহরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ওরা দেখলো ঘর-বাড়ি থেকে এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

চোখেমুখে ব্যাকুল অগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা সবাই, শুধু থ্রেগোরিয়াস বাদে, খোলা মাঠের কিনারায় প্রিসিলার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা, সেটার সাথে ঘুরছে ওদের মাথা।

‘ব্যাটা করছেটা কী!’ রাগের সাথে বললো জেক। ‘ইতালিয়রা এলে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে?’

‘লোকটা নার্ভাস,’ আন্দাজ করলো গ্যারেথ। ‘এখানে কী ঘটছে জানে না। দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছে সে—শহরটা পুড়ছে, আর ট্যাংক। ট্যাংকের সাথে বোধহয় ট্রাংগুলোও ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে গিরিখাদ থেকে।’

ওদের দিকে পিছন ফিরে আর্মারড কারের দিকে ছুটলো ভিকি, টারিটে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়ালো, ঘন ঘন হাত নাড়লো পাইলটের উদ্দেশ্যে।

পরবর্তী চক্রে আরো অনেক নিচে নামলো পুস মথ, ককপিটের পাশের জানালায় পাইলটের মুখ দেখতে পেলো ওরা, ওদের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। তারপর বিধ্বস্ত শহরের ওপর দিয়ে ছুটে এলো প্লেনটা, প্রতি মুহূর্তে নিচে নামলো, প্রিসিলার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মাঝখানে ব্যবধান থাকলো মাত্র দশ গজের মতো—টারিটে দাঁড়ানো ভিকিকে ভালো করে দেখে নিলো পাইলট।

ভিকি চিনতে পারলো পাইলটকে, প্রিন্স মিখায়েলকে নিয়ে যাবার জন্যে এই লোকটাই এসেছিল। পাইলটও চিনতে পেরেছে ভিকিকে, ককপিটের ভেতর সহাস্যে হাত নাড়লো সে।

পরের বার মাঠে নেমে এলো হালকা পুস মথ। ছুটে এসে থামলো ওদের সামনে। জানালার কাঁচ সরিয়ে মাথা বের করলো পাইলট, কনজে নিতে পারি, ভারি হলে দু'জনের বেশি নয়। চারদিকে পাহাড়, ওজন বেশিহলে চূড়ায় ধাক্কা খাবো।'

নিমেষের জন্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো জেক আর গ্যারেথ, পর মুহূর্তে হ্যাঁচকা টানে কেবিনের দরজা খুলে ফেললো জেক, প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো মেয়ে দুটোকে। কেবিনটা ছোট দু'জন ওঠার পর আর প্রায় কোনো জায়গাই থাকলো না।

'খামো,' পাইলটের কানে বোমা ফাটালো গ্যারেথ। 'হালকা আরো একজন আছে।'

দু'জন ধরাধরি করে প্রিসিলার কেবিন থেকে বের করে আনলো গ্রেগোরিয়াসকে। এরইমধ্যে বাতাসের দিকে পিছন ফেরার জন্যে প্লেন ঘুরিয়ে নিতে শুরু করেছে পাইলট, গ্রেগোরিয়াসকে নিয়ে প্লেনের পিছু পিছু ছুটতে হ'লো ওদেরকে।

'জেক...!' রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলো ভিকি, চিৎকার করতে চাইলেও তার গলা ভেঙে গেলো, চোখ উন্মাদিনীর দৃষ্টি।

'চিন্তা করো না,' পাল্টা চিৎকার করলো জেক, ওর আর গ্যারেথের হাত থেকে মেয়েরা নিজেদের হাতে তুলে নিলো গ্রেগোরিয়াসকে, প্লেনের সাথে সাথে এখনো ছুটছে ওরা। 'চিন্তা করো না,' আবার বললো রাসা, 'আমরা ঠিক বেরিয়ে যাবো, মনে রেখো—আমি ভালোবাসি তোমাকে।'

'আমিও ভালোবাসি, তোমাকে,' কী যেনো বলতে চেয়েও পারলো না ভিকি, নিচের ঠোট কামড়ে ধরেও নিজেকে সামলাতে পারলো না, দু'চোখ ভাসিয়ে দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো, ঝাপসা হয়ে গেলো দৃষ্টি। 'ওহ্, জেক....!'

প্লেনের সাথে এখন শুধু একা জেক ছুটছে, লম্বা করা হাত দিয়ে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেও। টেক-অফ করার জন্যে বেড়ে গেলো প্লেনের গতি, কিন্তু গ্রেগোরিয়াসের একটা পা বেরিয়ে থাকায় দরজাটা বন্ধ করতে পারছে না জেক। পা-টা ভেতরে ঠেলে দেয়ার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকলো ও, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে গেলো একটা রাইফেল বুলেট। ফিউজি লাজের ক্যানভাস আবরণ ভেদ করলো সেটা।

ঝট করে মুখ তুলতেই জেক দেখলো পরবর্তী বুলেটটা ককপিটের পাশের জানালার কাঁচ ভেঙে সরাসরি পাইলটের জুলফির ভেতর ঢুকে গেলো। সাথে সাথে সিট থেকে কাত হয়ে পড়লো পাইলট, ঝুলে থাকলো শুধু শোল্ডার স্ট্র্যাপের সাথে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁকা পথ ধরলো প্লেন, জেক দেখলো পাইলটের লাশের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে থ্রটলটা বন্ধ করে দিলো ভিকি। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রিসিলার দিকে ছুটলো জেক।

ওরা ছুটছে, ওদের পায়ের কাছে ধুলো ওড়াচ্ছে রাইফেলের বুলেট।

‘কোথায় ওরা?’ গ্যারেথকে জিজ্ঞেস করলো জেক।

‘বাঁ দিকে।’

ঘাড় ফেরাতেই দুশো গজ দূরে, মাঠের কিনারায় ঘাসের ভেতর ইতালিয়দের রাইফেলম্যানদের দেখতে পেলো জেক। ওদের পিছনে বড় একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো পিছনে, আরো অনেক পিছনে দেখা গেলো ট্যাংকগুলোকে, হেলে দুলে এগিয়ে আসছে।

প্রিসিলার এঞ্জিন চালুই রয়েছে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ইতালিয়দের দিকে ছুটলো জেক, টারিট থেকে ভিকার্স মেশিনগানের গুলি ছুঁড়লো গ্যারেথ। লাফিয়ে উঠলো ইতালিয়রা, সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো ছুটে পালালো।

গ্যারেথ এবার গুলি করলো ট্রাক লক্ষ্য করে। ফুয়েল ট্যাংক ঝাঁঝরা হয়ে গেলো, গোটা ট্যাংক ঢাকা পড়লো লাল আগুনে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে প্রিসিলাকে প্লেনের কাছাকাছি দাঁড় করালো জেক, শ্লাইপাররা গুলি করলে এখন আর্মারড কারের গায়ে লাগবে।

ইতিমধ্যে ভিকি আর সারা ধরাধরি করে পাইলটের লাশ ককপিট থেকে নামিয়ে ফেলেছে। লোকটা লম্বা-চওড়া, কাঁধ দুটো ভারি। তার দিকে পিছন ফিরে ককপিটে উঠলো ভিকি, কন্ট্রোলার পিছনে বসে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধালো নিজেকে।

‘গড!’ বললো জেক, চেহারায় পরম স্বস্তি ফুটে উঠলো। ‘একবার বলেছিলো বটে প্লেন চালাতে জানে।’

রাইফেলের একটা বুলেট ইম্পাক্টের খোলে লেগে পিছনে গেলো, ছুটে গেলো ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

পাইলটের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো গ্যারেথ। ‘ওর মৃত্যু ভারি তাৎপর্যপূর্ণ।’

‘আর মাত্র একজনের জায়গা হবে,’ ককপিট থেকে চিৎকার করলো ভিকি। ‘তোমাদের দু’জনকেই তুলে নিলে, পাহাড় উপকানো সম্ভব হবে না।’ দু’জনেই ওরা দেখতে পেলো, কথাগুলো বলতে গিয়ে আত্মপীড়নে জর্জড়িত হ’লো ভিকি।

প্রিসিলার খোলে আরেকটা বুলেট লাগলো।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার চিৎকার করলো ভিকি, ‘আর মাত্র একজনকে নেয়া যাবে প্লেনে।’

‘কে যাবে?’ চোখে বিদ্রূপাত্মক, শয়তানি হাসি নিয়ে জেকের দিকে তাকালো গ্যারেথ।

‘এসো টস করি।’ ভোজবাজির মতো আবার একবার তার হাতে বেরিয়ে এলো মারিয়া থেরেসা ডরার। জেকের মুখের ওপর নিঃশব্দে হাসলো সে।

‘হেডস্,’ বললো জেক।

রোদের ভেতর ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে খেতে শূন্যে উঠে গেলো শিলিংটা, অক্ষত হাতের তালুতে সেটাকে নামতে দিলো গ্যারেথ, ঝুঁকে তাকালো। ‘জানতাম কোনো এক সময় ঘটবে ব্যাপারটা—অবশেষে জিতলে তুমি।’ গ্যারেথের নিঃশব্দ হাসি মুখের কোণগুলো উঁচু করে তুললো। ‘ওয়েল ডান ওল্ড চ্যাপ। বিদায়।’

কিন্তু কবজিটা চেপে ধরলো জেক, শিলিংটার দিকে তাকালো ও। ‘টেইলস!’ ধমকে উঠলো ও। ‘প্রথম থেকেই জানতাম তুমি একটা চীট, ইউ বাস্টার্ড!’ ঘাড় ফিরিয়ে ভিকির দিকে তাকালো ও। ‘তোমাদের টেক-অফ কাভার দেবো আমি, ভিকি। প্লেন আর ইতালিয়দের মাঝখানে রাখবো প্রিসিলাকে, যতোক্ষণ পারা যায়!’ বলেই পিছন ফিরলো জেক।

ওর পিছনে ঝুঁকলো গ্যারেথ, প্রায় আধ সের ওজনের একটা পাথর হাতে নিয়ে সিঁধে হলো। ‘দুঃখিত, ওল্ড সন। লাগলে বলো, কি?’ বিড়বিড় করলো সে। ‘কিন্তু এরইমধ্যে তোমার কাছে দুটো ঋণ হয়ে গেছে আমার।’ হাতের পাথরটা দিয়ে জেকের মাথার পিছনে সাবধানে মারলো সে, পাথরটা ফেলে দিয়ে অজ্ঞান শরীরটাকে অক্ষত হাতের ভাঁজে আটকালো।

জেকের শির দাঁড়ার নিচে একটা হাঁটু ঠেকিয়ে, হাঁটুটা উঁচু করলো গ্যারেথ, এক ধাক্কাতেই প্লেনের কেবিনে তুলে দিলো ওকে। তারপর একটা পা তুলে জেকের পাঁজরে ঠেকালো, পায়ের চাপে দরজা থেকে ভেতর দিকে ঠেলে দিলো শরীরটাকে। বন্ধ করে দিলো দরজা।

পর্দার মতো কাজ করছে প্রিসিলা, সেটার খোলে একের পর এক বুলেট লাগছে। পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগটা বের করে আনলো গ্যারেথ। পাশের জানালা দিয়ে ভিকির কোলে ফেললো সেটা। সামনে কন্ট্রোল নিয়ে নিঃপ্রাণ মূর্তির মতো বসে আছে ভিকি।

‘জেককে বলো, আমি যদি আগে না পৌঁছাই, চকলেট মিখায়েলের চেকটা ক্যাশ করে তোমাকে যেনো এক বোতল শ্যাম্পেন কিনে দেয় আমার তরফ থেকে—আর, তাতে যখন চুমুক দেবে, স্মরণ করো সত্যিই তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম।’ ভিকি জবাব দেয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো সে, ছুটলো প্রিসিলার দিকে, আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়লো খোলার মাথায়, সেখান থেকে হ্যাচ গ’লে নেমে গেলো ড্রাইভারের সিটে।

পাশাপাশি, হরিহর আত্মার মতো, আর্মারড কার আর ছোট্ট নীল প্লেনটা খোলা মাঠ ধরে ছুটলো, ইতালিয়দের বিরতিহীন গুলি মুঘলধারে বৃষ্টির মতো আঘাত করছে ইস্পাতের খোলে।

তারপর, ধীরে ধীরে, দ্রুতগতি প্রিসিলাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলো অসম্ভব ভারি পুস মথ। ইতিমধ্যে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছে ওরা। মাটি ছেড়ে প্লেনের চাকা শূন্যে উঠে পড়লো, অনুভব করে ঝট করে পিছন ফিরলো ভিকি, চোখে দিশেহারা দৃষ্টি।

ড্রাইভারের হ্যাচের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্যারেথ, ভিকির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কিছু বলছে সে, শব্দগুলো শুনতে না পেলেও তার ঠোঁট জোড়া নড়তে দেখলো ভিকি। নোংরা ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা মাথার ওপর তুললো গ্যারেথ, দু'তিন বার নেড়ে বিদায় জানালো। নিঃশব্দ হাসিটুকু এখনো লেপ্টে রয়েছে ঠোঁটের কোণে।

খোলা মাঠের কিনারায় প্রিসিলাকে দাঁড় করালো গ্যারেথ, উঠে দাঁড়ালো হ্যাচের ওপর, অক্ষত হাতটা কপালে তুলে রোদ ঠেকালো, মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলো ছোট্ট নীল প্লেনটার দিকে—ভারি পাহাড়ী বাতাস কেটে অত্যন্ত ধীরগতিতে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যবর্তী ফাঁকটার দিকে উঠে যাচ্ছে, গিরিখাদ ওখান থেকে উঠে গেছে হাইল্যান্ডের দিকে।

তার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে আকাশের কোণে দোদুল্যমান নীল বিন্দুটার দিকে, কাজেই বুঝতে পারলো না তিনটে সিঁড়ি, থ্রি ট্যাংক মেইন রোড ছেড়ে গ্রামে ঢুকে পড়েছে, চলে এসেছে পাঁচশো গজের মধ্যে।

এখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে গ্যারেথ, ট্যাংকগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো। টারিট থেকে লম্বা স্প্যান্ডাউ ঘুরে গেলো ওর দিকে।

কামানের গর্জন শুনতে পায় নি গ্যারেথ, কারণ শব্দ তার কানে ঢোকান অনেক আগেই আঘাত করলো গোলাটা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই শুধু অনুভব করলো সে, মনে হ'লো পৃথিবী কক্ষচ্যুত হলো, হ্যাচ থেকে পড়ে গেছে।

বিধ্বস্ত খোলের পাশে মাটিতে পড়ে থাকলো সে, অক্ষত হাতটা দিয়ে শরীরের নিচের অংশটার স্পর্শ পাবার চেষ্টা করলো, কারণ তার পেটে কী যেনো একটা ঘটে গেছে। হাতড়াতে হাতড়াতে নিচে নামলো হাতটা, কিন্তু যেখানে পেট থাকার কথা সেখানে কিছুই ছুঁতে পারলো না সে। রয়েছে শুধু বিশাল একটা গর্ত, গর্তের ভেতর হাতটা ধীরে ধীরে নড়াচড়া করলো, পচা কোনো ফলের শাঁসের মতো থকথকে আর নরম কী যেনো ঠেকলো আঙুলে।

হাতটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো গ্যারেথ, কিন্তু পারলো না। পেশির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে, দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিকে। মুখ খোলার চেষ্টা করলো, বুঝতে পারলো আগে থেকেই হাঁ হয়ে আছে সেটা। চোখ খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে ও বুঝলো, বিস্ফারিত হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। অন্ধকার তার মাথার ভেতর, আর হিম ঠাণ্ডা সারা শরীরে।

অন্ধকার আর হিম ঠাণ্ডার মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো গ্যারেথ, ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছে। 'ব্যাটা মারা গেছে!'

মৃদু বিস্ময়ের সাথে গ্যারেথ ভাবলো, 'হ্যাঁ, গেছি। এবার সত্যি গেছি।' আবার হাসার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু তার ঠোঁট শুধু কাঁপলো। গ্যারেথের ম্লান নীল, প্রাণহীন চোখদুটো অপলকে তাকিয়ে থাকলো সুনীল আকাশ পানে।

ব্যাটা মারা গেছে, মাই কাউন্ট,' আবার বললো জিনো।
'তুমি ঠিক জানো? ট্যাংকের টারিট থেকে ধমকের সাথে জিজ্ঞেস করলো কাউন্ট।

'ঠিক জানি, মাই কাউন্ট।' গ্যারেথের পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করলো জিনো।
'যার শরীর প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেছে সে আবার বেঁচে থাকে কী করে?' কর্কশ ঘাস আর কাদার ভেতর মোচড় খেয়ে রয়েছে গ্যারেথের ঘাড় আর মাথা।

ট্যাংক থেকে নেমে এলো কাউন্ট, টেনেটুনে ঠিকঠাক করলো ইউনিফর্মটা। সে-ও পরীক্ষা করলো গ্যারেথকে। 'তুমি ঠিকই বলেছো, জিনো। লোকটা মারাই গেছে।'

'বাঁচা গেলো!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো জিনো।

'জিনো।' হঠাৎ গর্জে উঠলো কাউন্ট। 'তোমার ক্যামেরা কোথায়?'

'আনছি, মাই কাউন্ট!' এক ছুটে চলে গেলো জিনো, প্রায় সাথে সাথে ফিরে এলো ক্যামেরা নিয়ে।

'ইংরেজ দস্যুর পাশে দাঁড়িয়ে গোটা কতক ছবি তোলা দরকার,' ব'লে গ্যারেথের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কাউন্ট, পোজ দিলো।

ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রেখে তৈরি হ'লো জিনো। 'চিবুক আরেকটু ওপরে তুলুন, মাই কাউন্ট।'

গিরিখাদের শেষ চূড়াটা পেরিয়ে এলো ভিকি, প্লেন আর চূড়ার মাঝখানে এক সময় ব্যবধান দাঁড়ালো মাত্র পঞ্চাশ ফুট। চূড়া যদি আর খানিক উঁচু হতো, পুস মথ সরাসরি ধাক্কা খেতো সেটার সাথে, কারণ আকাশের আরো ওপরে ওঠার শক্তি ওটার নেই।

তার সামনে আইল্যান্ড বিস্তৃত হয়ে আছে দক্ষিণ দিকে সেই আদিস আবাবা পর্যন্ত। তার নিচে সরু ডেসি রোড। ভিকি দেখলো, রাস্তাটা সম্পূর্ণ খালি পড়ে আছে। আদিবাসী বাহিনী চলে গেছে লেক টানার দিকে, সম্রাট হাইলে সেলাসির বাহিনীর সঙ্গে একত্র হয়ে এবারে সংঘবদ্ধ আক্রমণ শানাবে ইথিওপিয়ার স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধারা।

স্বস্তি বোধ করলেও, ব্যাপারটা তেমন আনন্দ বয়ে আনলো না। শরীর সামান্য ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকালো ভিকি। দীর্ঘ সারডি গিরিপথ নিখর পড়ে আছে। দু'পাশের পাহাড় প্রাচীরের মাথা থেকে নিচে নামছে বিপুল জলরাশি, তার মনে হ'লো এমনকি পাহাড়গুলোও যেনো কাঁদছে।

সিটের ওপর সিঁথে হয়ে বসলো ভিকি কেমবারওয়েল, মুখে হাত তুললো, দুই গাল ভিজে গেছে অনুভব করে একটুও বিস্মিত হ'লো না সে।

কাঁদছে ভিকি।

(শেষ)

প্রকাশিত হয়েছে—

রিভার গড

প্রাচীন মিশরের অনবদ্য কাহিনী

মূল: উইলবার স্মিথ

অনুবাদ: মখদুম আহমেদ

প্রাচীন মিশর। ফারাও যুগ। লোভ আর বিচ্ছিন্ন পাপাচারে টালমাটাল হয়ে গেছে সোনালি এই সাম্রাজ্য। ষড়যন্ত্র, হত্যা আর নিষ্ঠুরতা শূঁশে নিচ্ছে তার জীবনসূধা। দুর্বল ফারাও সম্রাট, মামোস কিছুই করতে পারছেন না। গর্বোদ্ধত সিংহপুরুষ, সেনাপতি ট্যানাসের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন দেবতারা, মিশরের দুই রাজ্য একীভূত করার যুদ্ধে সে-ই নেতৃত্ব দেবে মিশরীয় বাহিনীর। কিন্তু তার ভালোবাসা, উজির কন্যা অপক্লপা লসট্রিসকে কি পাবে সে? লসট্রিস, যার সৌন্দর্যে আবিষ্ট পুরো জাতি; যাকে ভালোবাসে আর একজন অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ।

চার হাজার বছর আগের মিশরীয় ক্রীতদাস, লিপিকার টাইটা'র বর্ণনায় ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া, বিস্মৃত দিনের এক মনোজ্ঞ আলোচ্য। নাটকীয়তা, রহস্য, প্রেম এবং ক্রোধের আঙুনে ঠাসা রিভার গড, হারিয়ে যাওয়া ফারাও যুগের অসাধারণ কাহিনী।

“মনোজ্ঞ এবং বর্ণনাবহুল... আবেগ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র এবং প্রতিশোধের ঠাস-বুনট।”

—অরল্যান্ডো সেন্টিনেল

“নিখুঁত বর্ণনামূলক... দারুণ উপাদেয় গল্প-বলা... এ যেনো রাজ ভোজ।”

—ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস